নীলআগুন

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৩৩

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৭/এ বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
কানাই পাল

ডঃ শ্রী[redacted]রি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু

বৈজ্ঞানিক পন্থায় গাত্র-সংবাহন

এই লেখকের

…কেই চোখে

বন্ধনী
আকাশ ও মৃত্তিকা
…শৃঙ্খল
…মনের গহনে
…হংস বলাকা
…মধুচক্র
…কৃষ্ণা
…মহোৎসব
…ঘরের ঠিকানা
…দেহ-যমুনা
…ক্ষণবসন্ত
…শ্মশান-ঘাট
…বসন্ত-রজনী
…ক্ষুধা
…তান্ত্রীর অভিশাপ
…শানু
…লাগুন
…তুন ফসল
…য়ুরাক্ষী
…কপোতী

সোমলতা
তিমির বলয় (দুই পর্ব)
কালোঘোড়া
মহাকাল
পান্থনিবাস
সোম-সবিতা
রমণীর মন
শুক্লসন্ধ্যা
মধুমিতা
অনুষ্টুপ ছন্দ
বধূ নির্বাচন
নাগরী
সন্ধ্যারাগ
পূর্বপাড়ার মেয়ে
জীবনে প্রথম প্রেম
উত্তর-তোরণ
শ্রেষ্ঠ গল্প
…কর কেতন
হালদার সাহেব (নাটক
নচিকেতা

ছোটদের

ডাকাতের সর্দার
হরেক রকম

নেতাজি মাসাজ ক্লিনিক: বৈজ্ঞানিক পন্থায় গাত্র-সংবাহন করা হয়।

ইংরাজিতে-লেখা এই সাইন-বোর্ডটা ট্রাম-রাস্তা থেকেই চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড বড় বড় হরফ। মাথার উপর লম্বা হরফে নেতাজির পবিত্র নাম। তার নিচে চ্যাপটা হরফে মাসাজ ক্লিনিক।

সিঁড়িটা কিন্তু বড় রাস্তার উপরে নয়, পাশের গলি দিয়ে। মোজাইক-করা প্রশস্ত সিঁড়ি। ক্লিনিকটা তেতলায়। সিঁড়ির মাথাতেই টুলে বসে থাকে একটা মোটা গোঁফ-ওয়ালা ভোজপুরী দরওয়ান। অভ্যাগত এলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে একটা মিলিটারী সেলাম দেয়। সামনের ঘরের পর্দা খুলে অভ্যাগতকে ম্যানেজারের ঘরে নিয়ে যায়।

সেই ঘরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবলের ওদিকে ম্যানেজার বসেন। তিনিই ম্যানেজার, তিনিই মালিক। অত্যন্ত সুদর্শন চেহারার বৎসর পঁয়ত্রিশের একটি ভদ্রলোক। পরিধানে মূল্যবান ইউরোপীয় পোশাক, প্রায় নিখুঁত।

তার ওপাশে একটা বড় হল। অনুচ্চ দেয়াল দিয়ে সেটিকে তিন-চারটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে। সেগুলি সংবাহন-কক্ষ। এক-একটি কক্ষ এক একজন সংবাহিকার অধীনে। সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংবাহন করা হয়।

নেতাজি ক্লিনিকে তিনজন সংবাহিকা আছে। দেখতে চলনসই। বয়স অল্প। বেশ-বাস সাদাসিধে, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। এরা মাস-মাহিনায় কাজ করে। তার উপর টিফিন পায়। বেতন বেশি নয়, কিন্তু উপরি পাওয়া যায় মন্দ নয়।

যাঁরা আসেন তাঁরা অধিকাংশই মধ্যবয়স্ক। দু'একজন প্রৌঢ়ও আসেন। সকলেই সচ্ছল অবস্থাপন্ন। শেষ বিদায় দেবার আগে পৃথিবী এঁদের আনন্দ আহরণের ক্ষমতা একে একে কেড়ে নিচ্ছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই চৌর্যের পথরোধ করাই উদ্দেশ্য।

কিন্তু সেইটেই সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

যেমন নাগসাহেব।

নাগসাহেব এখন আর যৌবনের সেই দুর্দান্ত সাহেব নয়। প্রৌঢ়ত্বের শেষ-প্রান্তে পৌঁছাবার সময় থেকে ইউরোপীয় পোশাক একেবারেই পরিত্যাগ করেছেন। এখন তাঁর পরনে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি, গিলা-করা পাঞ্জাবি এবং তার উপর পাক-দেওয়া একখানা চাদর। তথাপি সাহেব উপাধি এখনও রয়ে গেছে। পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই এখনও তাঁকে নাগসাহেব বলেই ডাকে।

দীর্ঘদেহ নাতিস্থূল, নাতিশীর্ণ। মুখখানি পরিপক্ক আম্রের মতো রসাল। কথায় কথায় হাসি এবং হাসলেই কুন্দধবল বাঁধানো দন্তপংক্তির বিকাশ।

নাগসাহেব ধনী লোক নন। আগে কোন একটা বীমাকোম্পানির এজেন্ট ছিলেন। তখন যথেষ্ট খাটতে পারতেন। রোজগারও করতেন তেমনি। এখন আর খাটতে পারেন না তেমন। কিন্তু এজেন্সিটা ছাড়েননি।

না, ধনী নন, কিন্তু মেজাজ দরাজ। রোজ আসেন না, তবে প্রায় প্রতি শনিবারেই আসেন, এবং এসে সেই কয়েক ঘণ্টায় যা খরচ করেন তা অনেক ধনী লোকেও পারে না। সেই কারণে এখানে তাঁর খাতির অপরিসীম।

একখানা ঝরঝরে গাড়ি আছে। সেটা চলে যত, শব্দ করে তার অনেক বেশি। এত শব্দ যে নিচে গাড়িখানা এসে দাঁড়ালে তেতলার উপর থেকে এরা টের পায়।

পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জনা, রঞ্জনা এবং ম্যানেজারের মুখে প্রথমে

ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি ফুটে ওঠে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনজনে উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়ে। খঞ্জনা মুখ নামায়।

অঞ্জনা, রঞ্জনা এবং খঞ্জনা। এ তাদের প্রকৃত নাম নয়। ম্যানেজার এই নাম দিয়েছে। এখানে যাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয় তারা এই নামেই তাদের চেনে, জানে, ডাকে। অন্য নাম তারা জানে না।

এখানে যেমন তাদের একপ্রস্থ পোশাক থাকে, সাদাসিধে এবং পরিচ্ছন্ন, তেমনি এই একপ্রস্থ নামও থাকে। কাজের শেষে পোশাকের সঙ্গে নামগুলোও আলমারিতে তুলে রেখে যায়। পোশাকের মতো এই নামও অন্যত্র ব্যবহার্য নয়।

খঞ্জনা এদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠা। তার রং অঞ্জনার মতো তো নয়ই, রঞ্জনার চেয়েও একটু নিরেস; কিন্তু তার ঈষৎ-বিভিন্ন চোখ দুটো অদ্ভুত। একটু হাসলেই খঞ্জনপাখির পুচ্ছের মতো নাচে।

তাই দেখেই সুরসিক ম্যানেজার ওর নাম দিয়েছে খঞ্জনা।

খঞ্জনার এখনও বালিকাসুলভ লজ্জা যায়নি। এক একটি মেয়ে থাকে যাদের কখনও যায় না। ও বোধ হয় সেই দলের। নাগসাহেবের গাড়ির শব্দে ওদের মুখে যখন কৌতুকের তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে ওঠে ও লজ্জা পায়। সেই প্রথম দিন যেমন পেয়েছিল, আজও তেমনি। লজ্জায় ওর কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠে। ও মুখ নামায়। প্রথম দিনের মতো এখনও।

সিঁড়িতে প্রৌঢ়ের মন্থর শিথিল পদশব্দ এগিয়ে আসে। পর্দার ফাঁক দিয়ে এগিয়ে আসে নাগসাহেব দুগ্ধধবল জার্মান-ক্রপ মাথা এবং পরিপক্ক ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি।

গুড ঈভনিং লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টল্‌ম্যান!

গুড ঈভনিং স্যার, ভেরি গুড ঈভনিং!

কিন্তু খঞ্জনা তখনও মুখ তোলে না, গলাতেও তার স্বর ফোটে না। অন্য সকলের সঙ্গে সঙ্গে সে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে দাঁড়ায় শুধু।

কে জানে, হয়তো এই ব্রীড়াই প্রৌঢ়কে বধ করেছে।

কিন্তু সময় এখানে মূল্যবান। প্রতিটি ঘণ্টার জন্যে মূল্য দিতে হয়। সুতরাং গল্প করার অবকাশ কম।

দু'চারটে মামুলি কথার পর নাগসাহেব সংবাহন কক্ষে ঢোকেন। তখন তাঁর পোশাক থেকে সস্তা এসেন্সের এবং মুখ থেকে দিশী মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

কিছু বলতে হয় না। খঞ্জনা তাঁর পিছু পিছু সেই ঘরে ঢোকে।

সেখানে দ্বারে পর্দা নেই। পুলিশের সতর্ক আইন! কিন্তু ঘরের মধ্যে দুটো আলো আছে : একটা নীল, একটা লাল।

নীল আলোটা সময়দ্যোতক। এখানে ঘণ্টা হিসাবে মূল্য দিতে হয়। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলেই নীল আলোটা জ্বলে ওঠে। নাগসাহেবের এবং অন্য যে-কোনো অভ্যাগতেরও, আরও সময় দরকার হলে সংবাহিকা ম্যানেজারকে সেকথা জানিয়ে যায়।

আর লাল আলোটা বিপদ-সংকেত। পুলিশের খরদৃষ্টি আছেই। যে কোনো সময় তাদের আবির্ভাব ঘটতে পারে। সেজন্যেই লাল আলোর ব্যবস্থা।

ম্যানেজার অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি। ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। নিচে লোক আছে। পুলিশের টুপি দেখা মাত্র সে বেল টিপে দেবে। সে বেল বাজবে ম্যানেজারের ঘরে। ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ লাল আলোর বোতামটা টিপে দেবে। একতলা থেকে তেতলায় উঠতে সময় নেয়। অভ্যাগত এবং সংবাহিকাদের সতর্ক হবার পক্ষে সেই সময়টাই যথেষ্ট।

এমন অনেকবার ঘটেছে। তিন-চারবার তো বটেই।

পুলিশ অতর্কিতে হানা দিয়েছে। কিন্তু এরা তার আগেই সতর্ক হয়ে গেছে। তন্ন তন্ন করে সমস্ত খানাতল্লাসী করেও কিছু পায়নি। ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের পর ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেছে।

কিন্তু কথায় বলে, 'চোরের সাতদিন, সাধুর একদিন।' সাতদিন ফাঁকি দিয়ে চোর একদিন ধরা পড়ে যায়।

হলও তাই।

কি করে হল সে এক বৃত্তান্ত। এর সমস্ত কৃতিত্বই গোয়েন্দা-বিভাগের খগেন মজুমদারের। খগেন মজুমদার এসেছিলেন ফুলবাবু সেজে, এসেন্সের গন্ধে চারিদিক আমোদিত করে। ম্যানেজার সতর্ক হবার সময় পায়নি। আর নাগসাহেবেরও সেদিন মদের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং অঞ্জনা-রঞ্জনা-খঞ্জনা, নেশায় অপ্রকৃতিস্থ নাগসাহেব এবং ম্যানেজার, বলতে গেলে, সপরিবার ধরা পড়ে গেল।

খগেন মজুমদারের করুণা আকর্ষণের জন্যে সুচতুর ম্যানেজারের জানা যতরকম প্রক্রিয়া আছে তার কোনোটাই প্রয়োগ করতে ত্রুটি করলে না। কিন্তু কিছুই কাজে এল না।

হতাশ হয়ে ম্যানেজার টেলিফোনটা তুলে কাকে যেন ফোন করতে গেল। খগেন মজুমদাব তার হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে নামিয়ে রেখে দিলেন।

জানালা থেকে নিচের দিকে উঁকি দিয়ে দেখলেন।

ফিরে এসে বললেন, চলুন। আপনাদের ভ্যান এসে গেছে।

ম্যানেজার এবারে মরিয়া হয়ে বললেন, আপনি জানেন না, আপনার ওপরে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, তাঁদের সঙ্গে যাদের অসম্ভব দহরম মহরম এমন অনেক ব্যক্তির পায়ের ধুলো এখানে পড়ে মাঝে মাঝে।

মজুমদার হেসে বললেন, জানি আমি নিজেও অনেকবার এসেছি।

ম্যানেজার বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অঞ্জনা এতক্ষণ একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল, রঞ্জনা আর খঞ্জনার পাশে। খঞ্জনা তো একবারে কাঠেরমতো শক্ত হয়ে গেছে।

অঞ্জনা বললে, হ্যাঁ। মনে পড়ছে। ক'দিন আগেই এসেছিলেন।

মজুমদার হেসে বললে, মনে পড়ছে? কিন্তু এদের মনে পড়ছে না। মনে রাখবার মতো চেহারা তো নয়।

এতক্ষণে ম্যানেজার বুঝলে, কি করে মজুমদার তাদের চোখে ধুলো দিয়েছেন। আগে কয়েকবার এসে এখানকার সব খবরই জেনে গেছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তাই!

বললে, আমাদের অনুরোধ আপনি শুনলেন না। কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, ছেড়ে আপনাকে দিতেই হবে।

মজুমদার বললেন, সেরকম আশঙ্কা আমার মনে যে একেবারেই নেই তা নয়।

—তখন আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।

—সে ধীরে-সুস্থে করা যাবে তখন। এখন গা তুলুন দেখি।

সকলকে উঠতে হল। নাগসাহেবকে শুদ্ধ। তাঁর নেশা তখন ছুটে গেছে। ভদ্রলোক একেবারে নির্বাক হয়ে গেছেন।

নিয়ে যাওয়া হল সটান থানায়।

গিয়েই ওদের সঙ্গে সঙ্গে হাজতে বন্ধ করে দেওয়া হল। মেয়েদের তিন জনকে মেয়েদের হাজতে আর পুরুষদের দুজনকে পুরুষদের হাজতে।

তারপরে মজুমদার বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল, খবরটা প্রভাবশালী মহলে পৌঁছে গেলে তাঁর নামে টেলিফোন আসতেও পারে।

থানা-অফিসারদের বলে গেলেন, তিনি কখন ফিরবেন কিছু ঠিক নেই। এর মধ্যে যদি কেউ তাঁকে টেলিফোন করেন যেন বলে দেওয়া হয়, তিনি নেই। অন্য কাজে বেরিয়ে গেছেন। কখন ফিরবেন তার স্থিরতা নেই।

আসামীদের বেশ কিছুক্ষণ হাজতে রাখার পরে জেরা করাটা

মজুমদারের বিশেষ পদ্ধতি। কিছুক্ষণ হাজতে বাস করলে সকলেরই মাথা গোলমাল হয়ে যায়, এই তাঁর অভিজ্ঞতা। তখন জেরা করলে অনেক কথা বেরিয়ে আসে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় আসে না।

মজুমদার যখন ফিরলেন তখন রাত্রি ন'টা।

হাজতের মধ্যে মেঝেয় আঁচল পেতে অঞ্জনা ঘুমিয়ে পড়েছে। রঞ্জনা দেয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে। ঘুম হয়তো আসেনি, কিন্তু চোখ টানছে। এই অপরিচিত ভয়ংকর জায়গায় চোখ ঘুমে ভারী হয়ে এলেও জোর করে জেগে থাকবার চেষ্টা করছে।

শুধু খঞ্জনা জেগে। তার রং-করা গালের উপর দিয়ে অশ্রুর ধারা বইছে। গালের রং ফিকে হয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে চোখের কাজলও।

মজুমদারকে হাজতের মধ্যে ঢুকতে দেখে সে চমকে উঠেই দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—তোমার নাম কি?—মোটা গলায় মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন।

জবাব দেবে কি, খঞ্জনা কেঁদেই সারা।

—বল্। নাম বল্।—মজুমদার আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

রঞ্জনার চোখে ঘুমের যে আমেজ আসছিল, মজুমদারের মোটা ভারী কণ্ঠস্বরে তা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। যেন একটা অদ্ভুত প্রাণী দেখছে এমনিভাবে বড় বড় চোখ মেলে সে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

রঞ্জনাকে চোখ মেলতে দেখে মজুমদার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি?

সে জবাব দেবার আগেই অঞ্জনা ধড়মড় করে উঠে বসল। দুহাতে চোখ মুছে বললে, ওর নাম রঞ্জনা, ওর খঞ্জনা আর আমার নাম অঞ্জনা।

ওর সপ্রতিভ ভঙ্গী দেখে মজুমদার বেশ খানিকটা অবাক হয়ে

গেলেন। মোটা গলায় যথাসাধ্য মোলায়েম করে এবং মুখে হাসি টেনে বললেন, বাঃ! বেশ মিল করে নাম রাখা হয়েছে তো? তোমরা তিনজন একই বাড়ীর মেয়ে বুঝি?

অঞ্জনা বললে, না। এক বছর আগে আমরা কেউ কাউকে চিনতামও না।

—তাই নাকি! অথচ নামের আশ্চর্য মিল তো!

—হ্যাঁ, মিল করেই রাখা হয়েছে। এসব আমাদের কারোরই আসল নাম নয়।

—তবে?

—ক্লিনিকের নাম। ক্লিনিকে এসে পরি, আবার বেরবার সময় ছেড়ে রেখে যাই।

—তাই নাকি! তোমাদের আসল নাম কি তাহলে?

—ঘাড় নেড়ে চোখে একটা কটাক্ষ হেনে অঞ্জনা বল্‌লে, তা বলব না। সে নাম জেলের মধ্যে টেনে এনে লাভ নেই। যে নামটা ক্লিনিকের সেই নামটাই জেলে যাবে।

মজুমদার বুঝলেন, মেয়েটি শুধু শক্ত নয়, যথেষ্ট বুদ্ধিমতীও। বললেন, যাক গে। ওই নাম হলেই আমাদের কাজ চলে যাবে। কিন্তু বাপের নামটাতো জানা দরকার।

—তাও জানতে পাবেন না।

—কোথায় থাক সেই ঠিকানাটা বলবে তো?

অঞ্জনা খিল খিল করে হেসে উঠল: তাহলে তো কিছুই জানতে বাকি থাকবে না।

মজুমদার আর জেদ করলেন না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, এপথে নেমেছ কতদিন?

—তা বছরখানেক হবে।

—কী করে এলে?

—অনেক পথ ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম।

অঞ্জনা মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন, ও! আরও অনেক পথ ঘোরা হয়ে গেছে!

—তা হয়েছে বৈকি! একটানে কি এতদূর আসা যায়?

—সাথীর জোর থাকলে তাও আসে।

—তাহলে আমাদের সাথীর জোর ছিল না।

—তাই হবে।

মজুমদার আর একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও ভদ্রলোকটি কে?

—একজন তো ম্যানেজার।

না। ওঁকে চিনি। অন্যজন?

—উনি নাগ সাহেব।

—সাহেবের মতো তো নয়। দিব্যি ধুতি পরা।

—এখন তাই বটে। আগে সাহেব ছিলেন। নাকি দুর্দান্ত সাহেব। আর একবার সাহেব হলে আর বাঙলী হওয়া যায় না

—ধুতি পরলেও না?

—না।

—এটা ভালো বলেছ। ওঁর সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?

—পরিচয় তো নেই। যেমন আপনিও তো ক'দিন এসে মাসাজ করিয়ে গেছেন, তাই বলে কী আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

—উনিও কি তাই?

—হয়তো আর ক'দিন বেশী এসেছেন। কিন্তু পরিচয় নেই। আমাদের সারাইখানায় দেখা হয়, কিন্তু পরিচয় হয় না।

মজুমদার মনে মনে সেটা স্বীকার করলেন। বোধ হয় অপরিচয়ের রহস্যটাই আকর্ষণ। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে রহস্য ফিকে হয়ে আসে। আকর্ষণও দুর্বল হয়।

জিজ্ঞাসা করলেন, কি করেন উনি জান?

—কি করে জানব? আপনিও তো কয়েকবার এসেছেন। জানতে পেরেছি কি আপনি পুলিশ। তাহলে আর এ দুর্গতি হবে কেন?

অঞ্জনা হাসতে লাগল।

হাসতে হাসতেই বললে, এইটেই মজা দারোগাবাবু। এখানে সবারই সঙ্গে সবারই ছদ্মবেশে দেখা।

মজুমদারের ভারি অবাক লাগছিল অঞ্জনার কথা শুনে। আশ্চর্য জায়গা তো ওই ক্লিনিক, নেতাজির নামে পবিত্রীকৃত। সবাই ছদ্মবেশে আসে, ছদ্মবেশে দেখা করে চলে যায়! কেউ কাউকে চেনে না, জানে না, জানবার ইচ্ছাও করে না, চেষ্টাও করে না! সে ইচ্ছা যেদিন হবে, ব্যবসাতেও লাল বাতি জ্বলবে।

বাঃ!

মজুমদারের ভারি আশ্চর্য লাগছিল।

শান্ত কণ্ঠে বল্‌লেন, অঞ্জনা তোমাকে ভারি ভালো লাগছে।

অঞ্জনার দুষ্টুমিভরা চোখ নেচে উঠল : সত্যি?

কিন্তু মজুমদার ওর দিকে চাইলেন না। ওর চোখের ইঙ্গিত যেন দেখতেই পেলেন না।

বল্‌লেন, হ্যাঁ। ভারি ভালো লাগছে।

সেই স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে অঞ্জনার চপলতা তৎক্ষণাৎ নিভে গেল

মজুমদার বলে চললেন, তোমাদের কথা আমাকে বলবে? জানতে খুব ইচ্ছা করছে।

অঞ্জনা নিঃশব্দে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে, বলতে পারি। কিন্তু একটি সর্তে।

—বল কি সর্ত?

—খঞ্জনাকে ছেড়ে দিতে হবে।

প্রস্তাবটা এমন অপ্রত্যাশিত যে, শুধু মজুমদার নয়, খঞ্জনা নিজে, এমন কি রঞ্জনা পর্যন্ত চমকে উঠল।

মজুমদার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে নয়, ওই মেয়েটিকে নয়, শুধু খঞ্জনাকে কেন?

আবার দুষ্টুমিতে অঞ্জনার চোখ নেচে উঠল: ছাড়া আর কে না পেতে চায় বলুন। কিন্তু আমাদের ছেড়ে দেওয়া যদি নিতান্তই অসম্ভব হয়, অন্তত খঞ্জনাকে ছেড়ে দিন।

সমস্তই মজুমদারের কাছে হেঁয়ালি বলে বোধ হচ্ছিল।

জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি ব্যাপার অঞ্জনা? বন্ধুপ্রীতি?

—না।

—তবে?

—প্রয়োজন।

—কি প্রয়োজন শুনি

একটু চিন্তা করে অঞ্জনা দেখলে বলাই ভালো। মজুমদারকে লোক ভালো বলেই বোধ হচ্ছিল। কথাটা শুনলে যদি মমতা হয়।

বললে, কদিন পরে ওর বিয়ে।

—বিয়ে!

বিনা মেঘে আকাশ থেকে বাজ পড়লে মানুষ যত না চমকে ওঠে মজুমদার যেন তার চেয়ে বেশি চমকে উঠলেন।

শুধু মজুমদার নয়, খঞ্জনা পর্যন্ত চমকে উঠল। হঠাৎ ধরা পড়ায় অত্যন্ত ভীরু মেয়েটির স্নায়ু-শিরা যেন অবশ এবং চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। নিজের বিয়ের কথা তার নিজেরই মনে ছিল না।

মজুমদার বললেন, ঠাট্টা করছ?

অঞ্জনা গম্ভীরভাবে বললে, না। সত্যি।

মজুমদার খঞ্জনার দিকে চেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি?

নিঃশব্দে সম্মতি জানিয়ে খঞ্জনা মাথা নিচু করলে।

মজুমদারও নত মুখে কি যেন ভাবতে লাগলেন। পুলিশ লাইনে অনেক দিন তাঁর চাকরি করা হল। সবাই জানে, ভদ্রলোক বাপের কুপুত্র। কারও খাতির রাখেন না। আসামী গ্রেপ্তারে শুধু

দুঃসাহসী নয়, দুর্ধর্ষ। কোথাও কেউ তাঁকে কখনও দুর্বল হতে দেখেনি।

বয়স হয়েছে। ওরা তিনটি মেয়েই তাঁর মেয়ের বয়সী। তিনি নিজেই অনুভব করছিলেন, তাঁর মনে দুর্বলতা আসছে। কিন্তু জেনেও নিজেকে সংযত করলেন না। সে ইচ্ছাই হল না।

ধীরে ধীরে বললেন, অঞ্জনা ব্যাপারটা ঠিক আমার হাতে নেই। আমার হাত থেকে এপর্যন্ত কোনো আসামী ছাড়া পায়নি।

—আমরাও পাব না তাহলে?

মজুমদার তেমনি ভাবেই বললেন, ঠিক বলতে পারি না। সন্দেহ হচ্ছে, পাবে বোধ হয়। তোমাদের ম্যানেজারের হাত খুব লম্বা। আমি এইটুকু ভরসা দিতে পারি, সে রকম ক্ষেত্রে আমি বাধা দোব না। আর—

আর একটু থেমে মজুমদার বললেন, তা সে যাই হোক, কাল তোমাদের আদালতে হাজির করা হবে। তোমাদের জামিনে আমি বাধা দোব না। এর বেশি এখন আর কিছু বলতে পারব না।

অঞ্জনা ওঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। কি বুঝলে সেই জানে। বললে, তাহলেই হবে।

—হবে?—খুশি হয়ে মজুমদার বললেন,—তাহলে বল তোমার কথা।

—আমার কথা? অন্তত পুলিশের কাছে তা নিতান্ত সাধারণ কথা। আপনার কাছে নতুন কিছুই নয়।

—তা হোক। তুমি বল।

ঢাকা জেলার এক অখ্যাত গ্রামে দরিদ্র পরিবারেই জন্মেছিলাম। কিছু জমি-জায়গা পুকুর-বাগান ছিল। সুতরাং দরিদ্র হলেও খাওয়া-পরার কষ্ট ছিল না। খাবার জিনিস ছিল অসম্ভব সস্তা। কাজে-কাজেই দরিদ্রেরও তখন দু'বেলা দু'মুঠো খাবার দুঃখ ছিল না।

দুঃখ টের পেলাম যখন যুদ্ধ বাধল। চোখের সামনে জিনিস দেখছি,—নদী-পুকুরে মাছ আছে, গাছে ফল আছে, ক্ষেতে ফসলও হচ্ছে,—কিন্তু যেন চক্ষের পলকে কোথায় উড়ে যাচ্ছে। গরীবের কুঁড়ে ঘর পর্যন্ত পৌঁছুচ্চে না। খাওয়া কোনো দিন জোটে, কোনো দিন জোটে না।

বাবা বলতেন, যুদ্ধ।

ভাবতাম এই যুদ্ধ! এদিকে হাজার লোক, ওদিকে হাজার লোক। এরা তলোয়ার ভাঁজছে, ওরাও তলোয়ার ভাঁজছে। তেমন কিছুই তো নয়। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড শব্দ করে মাথার ওপর দিয়ে এরোপ্লেন চলে যেত। পূর্ব থেকে পশ্চিমে কখনও বা পশ্চিম থেকে পূর্বে।

বাবা বলতেন, এই যুদ্ধ। দেখছিস না, জিনিসপত্র সব মাগগি হয়ে উঠেছে!

অল্প বয়স। জিনিসের দর ওঠার ব্যাপারটা বুঝতাম না। শুধু দেখতাম, খাওয়ার বড় কষ্ট। যুদ্ধের সঙ্গে যা পরিচয় সেই বয়সে খাওয়ার দুঃখের ভিতর দিয়েই হয়েছিল। শুনতাম, জাপান-জার্মানীর কথা, ইংরেজ মার্কিনের কথা। কিন্তু সেই বয়সে সেই অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে থেকে কে যে তারা সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। গাঁয়ের বাইরে শহরে কোথাও যাওয়ার সুযোগ কখনও ঘটেনি। সাদা চামড়া চোখেও দেখিনি।

যুদ্ধ না যুদ্ধ!

একদিন শুনলাম, কলকাতায় জাপানীরা নাকি বোমা ফেলছে। কে জাপানী, কত দূরেই বা কলকাতা, কিছুই ঠিক বুঝতে পারতাম না। কিন্তু দেখতে দেখতে আমাদের ছোট গাঁ লোকে গিস গিস করতে লাগল।

তাদের অনেককে চিনতাম। তাঁরা কেউ কলকাতায়, কেউ বা অন্য কোথাও চাকরি করতেন। পুজোর সময় বাড়ি আসতেন।

আ[illegible] অনেককে [illegible] সেই প্রথম দেখলাম। তাঁদের কতক আমাদের [illegible] গাঁয়ে বড় একটা আসতেন না। তাঁরা নাকি খুব বড় লোক। কলকাতায় মস্ত বাড়ি, মস্ত গাড়ি। বোমার তাড়ায় প্রাণের ভয়ে বহুকাল পরে আবার গ্রামে এসেছেন। তাঁদের কারও কারও সঙ্গে তাঁদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনও কিছু কিছু এসেছেন।

আমরা অবাক হয়ে তাঁদের ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড়, চাল-চলন দেখতাম। তাঁদের কথাও যেন কি রকমের! আমাদের মতো নয়। শুনতাম, কলকাতার লোকের কথা নাকি ওই রকমেরই।

তাঁরা আসায় জিনিস-পত্রের দাম আরও চড়ে গেল।

নতনেত্রে অনেকক্ষণ ধরে অঞ্জনা নিজের মনে কি যেন ভাবতে লাগল। পিছনে কখনও চায়নি। তার ফুরসুতও পায়নি। সামনের দিকেই চেয়েছে শুধু। আজকের দিকে এবং অগ্রগামীর দিকে। এখন পিছনের দিকে চাইতে গিয়ে দেখলে, স্মৃতি সর্বত্র সমান বলিষ্ঠ নয়। কত রং ফিকে হয়ে গেছে। কত রং একেবারেই মুছে গেছে।

কিন্তু মজুমদারের মত তারও যেন নেশা চেপে গেছে। তার যে একটা জীবন আছে এবং তার জীবনেও কথা আছে, এ নিয়ে কেউ কোন দিন কৌতূহল দেখায় নি। আজ শোনবার লোক যখন পাওয়া গেছে, তখন বলতেই হবে তার কথা। শৃঙ্খলা এবং পারম্পর্য হয়তো সর্বত্র থাকবেনা। কিন্তু তাতে কি?

মাটির দিকে চেয়ে অঞ্জনা বলতে লাগল:

অঞ্জনার কথা

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছু পরেই আমার বড় দুই দাদা যুদ্ধে নাম লিখিয়ে চলে গেল। পেটের জ্বালাতেই। মাঝে মাঝেই দেখতাম, মা কাঁদছেন তাদের জন্যে। কিন্তু বাবাকে বড় একটা কাঁদতে দেখিনি।

বরং কিছুদিন পরে যখন তাদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা আসতে লাগল তখন, অন্তত টাকা আসার দিন, বাবাকে যেন খুশি-খুশিই মনে হত। কিন্তু মায়ের কান্না তখনও বন্ধ হয়নি।

কিন্তু বাবাব মাইনে তার সঙ্গে দুই দাদার মাইনে যোগ করে যা হত, তাতেও যেন সংসার চলতে চাইত না। জিনিসের দর নাকি আরও বেড়ে গেছে।

তখন আমাদের গাই ছিল। আমরা সবাই একটু করে দুধ পেতাম। কিন্তু সংসার যখন অচল হতে লাগল তখন গাঁয়ে যাঁরা নতুন এসেছিলেন তাঁদের কাছে ধ.গানের ফল, গরুর দুধ বিক্রি করা হতে লাগল। প্রথমে আমাদের, বড় ছেলেমেয়েদের দুধ, তারপরে বাবার দুধ, শেষ পর্যন্ত আমাদের কোলের ভাইটিরও দুধ বন্ধ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে খবর এল আমাদের বড় দাদা মারা গেছে যুদ্ধে।

সেই দিনের কথা কখনও ভুলব না। মায়ের তো কথাই নেই, বাবাও যেন তারপর থেকে ভেঙে পড়তে লাগলেন। কাঁদতেন না, কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। সব সময় একা একা থাকতেন।

ইতিমধ্যে বাইরে থেকে গাঁয়ে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা একে একে চলে যেতে লাগলেন।

কোথায় যায়?

কলকাতায়।

যুদ্ধ কি থেমে গেছে?

থামেনি। কিন্তু শহরের লোক প্রাণের ভয়েও তো বেশিদিন পাড়াগাঁয়ে কষ্ট ভোগ করতে পারে না। তার উপর সকলেরই কাজ-কর্ম আছে, নয় তো পড়াশোনা। কিছুই তো বেশিদিন বন্ধ থাকতে পারে না।

তাঁরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার জিনিসের দাম কমতে লাগল বটে কিন্তু আমাদের, এবং আমাদের মতো আরও অনেকের, তাঁদের কাছে নানা জিনিস বিক্রি করে যা দু'পয়সা আসছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল।

কিনবে কে?

তার পরে আরও কয়েক বছর গেল। আমার বয়স হচ্ছে। মাঝে মাঝে মা আমার বিয়ের জন্যে বাবাকে তাগাদা দিচ্ছে, শুনতে পাই। কিন্তু সেই দুর্মূল্যের দিনে মানুষ খেতে পাচ্ছে না, মেয়ের বিয়ে দেবে কে!

বাবা পাশ কাটিয়ে যান: দাঁড়াও। যুদ্ধটা থামুক।

আরও কিছুদিন পরে যুদ্ধটা থামল।

এইবারে জিনিসপত্র সস্তা হবে?

মনে তো হয়।

কিন্তু তার বেশি আর কেউ ভরসা দিতে পারে না।

বাবা আমার বিয়ের জন্যে এবারে সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন বলে মনে হল। ষোলো পেরিয়ে যায়, আর না দিলে ভালো দেখায় না, এই রকমের ভাবটা। দেখতে দেখতে আমার সমবয়সী কয়েক জনেরই বিয়ে হয়ে গেল। আর ভালো দেখায় না সত্যি।

পাত্রের সন্ধানে বাবা এখানে-সেখানে ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হয় না, খুব আশা পাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে শোনা গেল আমরা স্বাধীন হচ্ছি।

তারপরেই একদিন শোনা গেল, কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বেধে গেছে। লুঠ-তরাজ, খুন-জখম, সে নাকি এক ভয়াবহ ব্যাপার।

তারপরেই বাধল নোয়াখালিতে। তার নাকি তুলনা নেই। খবরের কাগজে সেই সব পড়ি, আর ভয়ে কাঁপি।

ঠিক আমাদের গ্রামে মুসলমান ছিল না। কিন্তু চারিপাশের গ্রাম মুসলমানে ভর্তি। তারা যদি একজোট হয়ে আমাদের গাঁয়ের ওপর পড়ে, কারও সাধ্যি নেই রোখে।

তাছাড়া আমাদের বয়সের মেয়েদের তো আরও কত ভয়। মায়েদের তো আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেরা জোট পাকায়। গাঁকে রক্ষা করবার জন্যে নানা রকম ব্যবস্থা করে। কিন্তু তাদের মুখ দেখে ভরসা জাগে না কারও মনে।

প্রতিদিন খবরের কাগজে দাঙ্গার কিছু-না-কিছু খবর থাকেই।

এমন সময় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এটা হবে মুসলমানদের রাজ্য পাকিস্তান। আমাদের সব চলে যেতে হবে হিন্দুস্থানে। তার মানে কলকাতায়।

চারিদিকে কী যে আনন্দের সাড়া জাগল সে আর বলবার নয়। যেমন আনন্দ মুসলমানদের, তেমনি আনন্দ হিন্দুদের। আমাদের আনন্দ আর কিছুর জন্যে নয়। এই যে চারিদিকে মুসলমানের মধ্যে প্রাণ হাতে করে ভয়ে ভয়ে কাটান, আর আমাদের বয়সের মেয়েদের তো আরও কত ভয়, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আনন্দ। সেই আনন্দে আমরা পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে লাগলাম।

হায়রে! তখন যদি জানতাম, দেশ ভাগ হওয়ার মানে এই!

মঞ্জুনা থামল, বোধ হয় দেশ-বিভাগের সত্যকার অর্থটা ভালো করে উপলব্ধি করবার জন্যে।

হঠাৎ অঞ্জনা মজুমদারের দিকে চাইলে। তার চোখে এবং গলার স্বরে চটুলতার চিহ্নমাত্রও আর নেই।

জিজ্ঞাসা করলে, এই দুঃখের কথা শুনতে কি আপনার ভালো লাগছে?

—লাগছে। কি রকম জান? খুব দুঃখের গল্প পড়তে যেমন ভালো লাগে তেমনি। তুমি বল।

মজুমদারের কণ্ঠস্বর ভারী, ভিজে-ভিজে।

রঞ্জনা এবং খঞ্জনা নির্বাক। তেমনিভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে।

কারও চোখেই যেন পলক পড়ছে না। সমস্ত ঘরের হাওয়া স্তব্ধ।

গ্রাম থেকে অনেকগুলি পরিবার এক সঙ্গেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু সেই প্রবল জোয়ারের মুখে কে যে কোথায় ছিটকে গেল, এখনও তাদের সকলের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এসে পৌঁছুলাম একটা গুদাম ঘরে। ওপরে টিনের চাল, দু'দিক খোলা। পরে শুনলাম, গুদাম ঘর নয়, শেয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্ম। সেইখানেই বাক্স-প্যাঁটরা দিয়ে একটুখানি জায়গা ঘিরে ফেললাম। সেই হল আমাদের নতুন গৃহ!

কী সহৃদয় অভ্যর্থনা!

স্বেচ্ছাসেবকরা জনে জনে খাবার বিলোচ্ছেঃ মুড়ি-চিঁড়ে, বিস্কিট-পাউরুটি, মুড়কি-বাতাসা। ডাক্তার এসে ইন্‌জেক্‌শন দিচ্ছে, ওষুধ দিচ্ছে!

সে এক সমারোহ ব্যাপার!

যাক, বাঁচলাম। দুঃখ-দুর্দশা থেকে, অন্তত দিন-রাত্রি কি-হবে, ভয় থেকে তো বাঁচলাম। মোটামুটি খাওয়া-পরারও কষ্ট রইল না।

কিন্তু বাবার মন খুব নিশ্চিন্ত হল না। তিনি প্রায়ই বলতেন, মানুষ তার উদ্বৃত্ত প্রিয়জনকে আনন্দের সঙ্গে দান করতে পারে। কিন্তু মুখের অন্ন সহোদর ভায়ের সঙ্গেও ভাগ করে খেতে পারে না।

বলতেন, এই আদর-আপ্যায়ন বেশি দিন থাকবে না। মুখের অন্ন ভাগ করে খাওয়ার অবস্থা আসবার আগেই আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

হবে তো, কিন্তু কি করে?

সেখানে দেশে দু'বিঘে জমি-জায়গা ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, গোয়ালে গরুও ছিল,—দুঃখ-ধান্ধা করে চলে যেত। এখানে সে সুযোগ কোথায়? তা ছাড়া, বড় গাছ এক জায়গা থেকে তুলে এনে আর এক জায়গায় কি পোঁতা যায়? নতুন মাটিতে সে কি শিকড় গাড়তে পারে?

বাবার সেই অবস্থা হল।

দিন দিন তিনি যেন কি রকম হয়ে যেতে লাগলেন। তামাক খাচ্ছেন তো খেয়েই যাচ্ছেন। কারও সঙ্গে কথা নেই। বাক্স-প্যাঁটরার সেই যে বেড়া, তার বাইরে যেতেই চাইতেন না।

চাল-ডাল, নুন-তেল, দু'চারটে আলু-পটল পাচ্ছিলাম সরকারী সাহায্য হিসেবে। একখান' করে নতুন কাপড়ও পেয়েছিলাম। কিন্তু তাইতেই তো সব প্রয়োজন মেটে না।

মজুমদার নিঃশব্দে শুনছিলেন। এখন প্রশ্ন করলেন, আর তোমার দাদা?

দাদা!

অঞ্জনা যেন প্রথমে প্রশ্নটা বুঝতেই পারলে না। দাদা আবার কে? কিন্তু তখনই প্রশ্নটা বুঝে লজ্জিত ভাবে হাসলে।

বললে, হাঁ, দাদা। বড়দার মারা যাওয়ার খবর তো আগেই বলেছি।

মজুমদার বললেন, বলেছ। কিন্তু যুদ্ধ থেমে গেলে তোমার মেজদা ফেরেন নি?

—না। সে যে কোথায়, কোনো খবরই পাইনি।

—মারা গেলে নিশ্চয় সরকারের কাছ থেকে খবর পেতে, যেমন বড়দার বেলায় পেয়েছিলে।

—নিশ্চয়। মারা যায়নি। প্রথম-প্রথম ভাবতাম, হয়তো নেতাজির দলে যোগ দিয়েছে।

—কিন্তু তারাও তো সব ফিরেছে।

—হ্যাঁ। তাহলে তাদের সঙ্গেই ফিরত।

একটু ভেবে মজুমদার বললেন, এমন হতে পারে বর্মায় মারা গেছে। কি হয়তো ফিরে এসেছে, কিন্তু তোমাদের খুঁজে পাচ্ছে না।

—সবই হতে পারে। মোট কথা, তার কোনো খবর আমরা পাইনি। আর পাঁচ ঝঞ্ঝাটে তার কথা ভুলেই গেছি বলতে গেলে।

থাকগে, তার কথা। তার সম্বন্ধে মজুমদারেরও কোনো আগ্রহ নেই। বললেন, তারপরে বল।

—হ্যাঁ, তারপরের কথা।

অঞ্জনা আবার বলতে আরম্ভ করল :

প্রয়োজন তো মেটে না। কিন্তু করাই বা যেতে পারে কি? নানা দুর্গতি এবং দুশ্চিন্তায় সবারই শরীর ভেঙে পড়তে লাগল। শুকিয়ে যেতে লাগল আমার কোলের ভাইটি! একেবারে অস্থি-চর্মসার হয়ে গেল। খাবার কষ্ট তারই সবচেয়ে বেশি। মায়ের স্তনের দুধ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। আমাদের চোখের সামনে ছেলেটা শুকিয়ে শুকিয়ে মারা গেল! কিছু করতে পারলাম না।

কান্নায় অঞ্জনার গলা বুজে এল।

নিজেকে সামলে নিয়ে অঞ্জনা বলতে লাগল :

ছেলেটা মারা গেল, কান্না দূরে থাক বাবার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পড়ল না। নিঃশব্দে তামাক খেতে লাগলেন।

সন্ধ্যেবেলায় মাকে বললেন, গাঁয়ে ফিরে যাবে ?

মা প্রথমে জবাব দিলেন না। মনে হল, তাঁরও ফিরে যাবার ইচ্ছের অভাব নেই।

কিন্তু আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শুধু বললেন, না।

বাবা আর কিছু বললেন না, আপন মনে তামাক খেয়ে যেতে লাগলেন।

ভয় ছিল মায়ের আমাকে নিয়ে। আমার জন্যেই মায়ের ইচ্ছে থাকলেও ফিরে যাবার উপায় ছিল না। অথচ, বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, ওই ক'মাসেই আমার এমন চেহারা হয়েছিল যে, আমাকে দেখলে কারও বলবার উপায় ছিল না, বয়স আমার ন-দশ বছরের বেশি।

সেই সময় তোরা এলি বোধ হয়, না ?

ওরা ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

আগে রঞ্জনারা, তারপরেই খঞ্জনারা। একই প্ল্যাটফর্মে বাক্স-প্যাঁটরার বেড়া দিয়ে ওরাও নিজের নিজের ঘর বাঁধলে।

আমার তখন ভয় হল মাকে নিয়ে। শুকিয়ে শুকিয়ে মায়েরও এমন চেহারা হল, যেন উনআশী বছরেব বুড়ি। সবদিন উঠে রান্না করাও মায়ের সামর্থ্য হত না।

জ্বর নয়। অথচ উঠতে পারত না।

তখন রান্নার ভারটা আমি নিলাম। জোর করে নিতে হল। সহজে কি মা নিতে দেয়! খোকা চলে যাওয়ার পর মায়ের আমার খুবই ভয় হয়েছিল।

কিন্তু, আশ্চর্য দেখুন, বাবার জন্যে মোটেই ভয় হয়নি। তিনি কোথাও যান না, কিছুই করেন না, নিঃশব্দে বসে তামাক খান। তাঁর জন্যে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। শুধু মা মাঝে মাঝে কেমন করে যেন তাঁর দিকে চাইত। তার মনে কি হত জানি না, আমাদের কখনও কিছু বলেনি।

মনে হয়, বাবার জন্যে মায়ের ভয় হত, এবং সে-ভয় যে অমূলক ছিল না, তাও প্রমাণ হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই।

তামাক খেতে খেতে হঠাৎ এক সময় থেমে গেলেন। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকল যেন। হাত থেকে হুঁকোটা পড়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পড়ে গেলেন।

আমি ছুটে গেলাম বাবার কাছে। চীৎকার করে উঠলাম। সবাই চারদিক থেকে ছুটে এল। শুধু মা নড়ল না। নাড়ী দেখে, বুকে হাত দিয়ে সবাই যখন রায় দিলে সব শেষ হয়ে গেছে, মা নিঃশব্দে তাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কাঁদলে না, কথা কইলে না, যেন সমস্তই তার জানা।

অঞ্জনা নিঃশব্দে অন্যদিকে চেয়ে যেন সেই ভয়ংকর দিনটাকে নতুন করে দেখতে লাগল। স্মৃতি তখনও উজ্জ্বল। বেশি দিনের কথা তো নয়।

বাবার মৃত্যুর পর মা যেন একেবারে বদলে গেল। পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগ যেন একেবারে ছিঁড়ে গেল।

স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের ঘরে আব্রুর কোনো বালাই ছিল না। যেন বাজারের মাঝখানে বাস। অসংখ্য যাত্রী আসছে-যাচ্ছে। রাত্রের অন্ধকারের আব্রুটুকুও নেই। রাত্রেও জ্বল-জ্বল আলো জ্বলছে।

এই বে-আব্রু জীবন,—অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, স্বাস্থ্য নেই, সৌন্দর্য নেই,—কোলের ছেলেটা মারা গেল, নিজের দেহের ভিতরে অসংখ্য পোকা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে,—মায়ের মেজাজটা কি রকম খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। ছুনিয়ার সমস্ত-কিছুর উপর বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, সন্দেহ।

সন্দেহটা যেন বাতিকে দাঁড়িয়েছিল।

কত নিরাশ্রয় উদ্বাস্তু পরিবার আমরা ওইখানে ঘর বেঁধেছিলাম। কত রকমের লোক কত উদ্দেশ্যে ওখানে ঘোরাফেরা করত।

আবার নিছক কৌতূহলেও কত লোক আসত। হয়তো ভালো লোকই।

কিন্তু কারও ওখানে এসে দাঁড়াবার উপায় ছিল না।

মায়ের কোটরে-ঢোকা চোখ দিয়ে আগুন বেরুত। নেকড়ে বাঘের মতো দাঁত বের করে মা খেঁকিয়ে উঠত ঃ

—কি দেখতিছ? মজা? ভদ্দর ঘরের মাইয়ালোক কেমন বে পর্দা আছে তাই দেখতিছ?

বাবাঃ!

যারা সত্যই ভদ্রসন্তান তারা লজ্জায় পালাত। যারা নয়, তারাও পালাত কিন্তু দাঁত বেব করে হাসতে হাসতে।

মাঝে মাঝে বিরক্ত হতাম। বলতাম, ও কি মা! অমন কর ক্যান।

মা দপ্ কবে জ্বলে উঠত ঃ তুই থাম।

রাগটা যেন লোকেদেব চেয়ে আমার উপরই বেশি। এই সমস্তর মূল কারণটাই তো আমি। মাঝে মাঝে মনে হত, সন্দেহটা আসলে যেন আমারই উপব। আমাব খারাপ বয়সটার উপব।

শেয়ালের কবল থেকে বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে কুকুর যেমন মরিয়া হয়ে ওঠে, মায়ের অবস্থা প্রায় সেই রকম দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু বাবার মৃত্যুর পব মা যেন কেমন বদলে গেল।

বৃষ্টিতে মানুষ ছাতা মাথায় দেয়। অল্প-স্বল্প ভিজলেও ছাতা ছাড়ে না। কিন্তু যখন একেবারে সপ্‌সপে ভিজে যায়, ছাতা বন্ধ করে দেয়। প্রকৃতির হাতে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

বাবার মৃত্যুর পরে মায়েরও বোধ হয় তাই হয়েছিল। ভবিষ্যতের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। বুঝে গিয়েছিল, লড়াই করে লাভ নেই। কিছুই রোখা যায় না। দেশের সাত পুরুষের ভিটে, পুকুর-বাগান-ক্ষেত কিছুই রোখা গেল না। বড় ছেলে, ছোট ছেলে, স্বামী, কাকে রোখা গেল? কতটুকু মানুষের শক্তি!

মা যেন চোখ-কান গুটিয়ে নিয়ে বসল বাক্স-প্যাঁটরায় ঘেরা তার সংকীর্ণ ঘরে, যা তার পৃথিবী।

দূর থেকে কোনো দুষ্টু ছোঁড়া শিস টানলে মা আর শুনতে পেত না। আমাদের ঘরের পাশে কেউ এসে ঘেঁষে দাঁড়ালে মা আর দেখতে পেত না। ছোট ছেলে-মেয়ে দুটো প্ল্যাটফর্মে ভিক্ষে করে, কি চুরি করে দু'পয়সা নিয়ে এলে মা হাত পেতে নিত। জানতে চাইত না, পয়সা কোত্থেকে পেলে।

আমার চোখে পড়ে গেলে আমি হয়তো বিরক্ত হতাম। জিগ্যেস করতাম, ও কি মা! ওরা নিত্যি পয়সা পায় কোথায়?

মা বলত, যেখান থেকেই পাক, তর কি?

মায়ের রক্তহীন চোখের আগুন নিভে গেছে। শুধু ঠাণ্ডা নীল বিষ চকচক করে। আগে মনে হত, এই জঞ্জাল-ভরা পৃথিবী যেন চোখের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে চায়।

বাবার মৃত্যুর পর মনে হল, মায়ের চোখে আগুন আর নেই। আর কিছুই মা পোড়াবে না। সমস্ত আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে! ঠাণ্ডা বিষ। সেই বিষ ছড়িয়ে দিতে চায় পৃথিবীময়। নীল হয়ে যাবে পৃথিবী। কুৎসিত, কদর্য, জীবন্মৃত।

সত্যি বলছি, মায়ের দিকে চাইতে পারতাম না। কেমন ভয় করত।

—কী অইছে তর মাথার চুল! মা গো! একটু ত্যাল দিবার পারস না?—মা হাসল।

সে হাসি দেখে আমি শিউরে উঠলাম। কী সর্বনেশে হাসি!

মায়ের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু দূর আর কোথায় পাব? একটু হয়তো রঞ্জনাদের ঘরে এসে বসতাম। নয় তো বা খঞ্জনাদের।

কখনও যদি একলা থাকতাম, কেমন ভয় পেতাম। প্ল্যাটফর্মে

সকল সময় অসম্ভব ভিড়। কিন্তু এক একটা আশ্চর্য মুহূর্ত আসত, যখন ওই নিরেট ভিড়ের মধ্যেও একলা হয়ে যেতাম।

তখন শূন্যের আয়নায় যেন নিজের চেহারা দেখতে পেতাম: মাথায় মৃত্যুর মতো কালো একরাশ সর্পিল চুল, মাথার মুকুটে জড়ানো ধূমকেতুর পুচ্ছ, কালীয়দহের নীল জল টলটল করছে দুই চোখে।

বিষকন্যা।

বইতে পড়েছিলাম বিষকন্যার কথা। সেদিন সেই নিরেট ভিড়ের মধ্যে শূন্যের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, আমি বিষকন্যা। অনুভব করলাম আমার দেহের শিরায় শিরায় যেন অসহ্য ক্রোধে গর্জন করছে হলাহল। স্বয়ং শঙ্কর ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই তার বেগ সহ্য করে।

বিদ্যুতের মতো শিউরে উঠল দেহ। মনে হল, বজ্রের মতো ডাক দিই।

চেয়ে দেখি, আমাকে একলা দেখে ঘেঁষে এসেছে একটি ছোকরা। তাকে দেখে হাঙরের মতো ধারালো দাঁত বের করে হাসলাম।

আশ্চর্য! সে ভয় পেলে না।

ঘণ্টাখানেক পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার দুই বাহুর মধ্যে। নির্ভয়ে। যেমন নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গান-গাওয়া উড়ন্ত পাখি অজগরের উন্মুক্ত চোয়ালের মধ্যে।

অঞ্জনা একটা আশ্চর্য ভঙ্গীতে হাসতে লাগল।

মজুমদারের মনে পড়ল, এই হাসি নেতাজি মাসাজ ক্লিনিকে অঞ্জনার মুখে সে দেখেছে। যে হাসি প্রতিরোধ করা যায় না। বৈদ্যুতিক 'শক'-এর মতো যা কাঁপুনী ধরিয়ে দেয়। যা সমুদ্র-তরঙ্গের মতো উচ্ছ্বসিত বেগে এসে পড়ে, পুরুষকে তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বিষকন্যাই বটে।

অঞ্জনার হাসিতে বিষ, চোখের চাউনিতে বিষ, রক্তের মতো লাল বিষে টুল টুল করছে ওর পরিপুষ্ট ওষ্ঠাধর।

অনেককাল আগের কথা। একটি বিধবা মেয়ে তাদের গ্রামের কালো-দীঘির জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল। মজুমদার গিয়েছিলেন তার তদন্তে। গিয়ে যা জেনেছিলেন তা মামলায় কাজে লাগেনি বটে, কিন্তু এখনও তা স্মৃতিতে জ্বল জ্বল করছে।

বিধবা মেয়েটির বোন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল বিবরণটা:

কালো দীঘির কালো জল তার দিদিকে ডাকত ছোট ছোট ঢেউএর হাতছানিতে। দুর্বার সে ডাক। তার দিদির চোখ সেই জলের দিকে চেয়ে যেন কি রকম হত। দিদিই তাকে একথা বলেছিল। একবার নয়, অনেকবার। বলেছিল, ওই কালো জলে ডুবে একদিন সে মরবে।

ওর চোখ-মুখের ভাবে, ওর কথা বলার ভঙ্গীতে বাড়ির সবাই ভয় পেত। ওকে একলা কেউ কালো দীঘিতে ছেড়ে দিত না।

কিন্তু কালো জল যাকে ডাকে, কে তাকে আটকে রাখতে পারে? বিধবা মেয়েটিকেও কেউ আটকে রাখতে পারেনি। অমোঘ সে ডাক।

সেদিন বিকেলে মেঘ উঠল কালো হয়ে। তার ছায়া নামল কালো জলে আরও কালো হয়ে। ঝড়ের হাওয়ায় ঢেউগুলি নাচতে লাগল শিশু-সাপের মতো। সেই তালে-তালে জলের কোলে কারা যেন হাততালি দিতে লাগল ছলাৎ ছল।

সকলের দৃষ্টির অগোচরে বেরিয়ে এল বিধবা মেয়েটি। লোভ সামলান তার পক্ষে কঠিন। মৃত্যুর সেই সুনিবিড় সমারোহের মধ্যে দিলে ঝাঁপ।

এতদিন পরেও ছবির মতো জ্বল জ্বল করছে সেই কাহিনী।

অঞ্জনা বললে, খেলা আর কি! আলোর সঙ্গে পোকার যে খেলা সেই খেলা। সাপের সঙ্গে নেউলের খেলা দেখেছেন?

মজুমদার বললেন, দেখেছি।

—আমাদের পদ্মঠাকমা বলেন,

একটা নতুন নাম। মজুমদারেব মধ্যেকার পুলিশ অফিসারটি সর্তক হয়ে উঠল : তিনি কে?

—আমাদের কলোনিতেই থাকেন। খুব অভিজ্ঞ লোক। তিনি বলেন, নেউলের চেয়ে বড় বন্ধু সাপের আর নেই।

—সে আবার কি!

—হ্যাঁ। নেউলের চুমোয় সাপের মৃত্যু থাকে। তার চেয়ে মিষ্টি সাপের কাছে আর কিছুই নয়।

—তাই নাকি!

মজুমদারের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল।

—হ্যাঁ। শুধু আসামী ধরলেন আর জেলে পাঠালেন। মৃত্যু যে কত মিষ্টি সে হিসাব তো রাখেন না।

—তা রাখি না।

অঞ্জনা একটা ভ্রূভঙ্গী করলে : ক'বারই এলেন-গেলেন। তখন তো জানি না।

মজুমদার হাসলেন : জানলে কি করতে?

—কিছুই করতাম না।

অঞ্জনা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে টিপে টিপে হাসতে লাগল।

মজুমদার বললেন, সকলের দাঁতে সকলের বিষ থাকে না অঞ্জনা।

—তা জানি দারোগাবাবু, নইলে সেদিন আপনি ফিরে যেতে পারতেন না।

—হুঁ।—এ প্রসঙ্গ মজুমদার এইখানেই শেষ করলেন,—তার পা[illegible]ই ছেলেটির কথা বল।

—কোন ছেলেটির ?

—যেটি গান-গাওয়া পাখির মতো।

—তার কথা ওইখানেই শেষ। কিন্তু আমার চোখে নেশা ধরিয়ে দিলে সেই। জাগিয়ে দিলে বিষকন্যাকে।

অনেকদিন পরে প্রসঙ্গক্রমে সেই ছেলেটির কথা আবার তার মনে পড়ল। অন্যমনস্কভাবে বোধহয় তার কথাই ভাবতে লাগল। তারপরে মজুমদারের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখে, ভদ্রলোক নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন।

অঞ্জনা হেসে বললে, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অনেকদিন পরে ওকে মনে পড়ল। পথের সন্ধান ওই তো দিলে। বলতে গেলে আমাকে আবিষ্কার করলে। ওকে ভোলা কঠিন।

সেদিন ফিরতে খানিক রাত হয়েছিল। ভয়ে মরি, মা কি বলবে। কিন্তু মা যখন কিছুই বললে না, এমন কি জানতে পর্যন্ত চাইলে না, কোথায় গিয়েছিলাম, এত দেরি হল কেন,—তখন আরও ভয় হল। মনে হল, এমন চুপ করে থাকার চেয়ে বকলে বোধ হয় ভালো হত। রাত্রে দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতে।

—ভয়ে ?—মজুমদার জিজ্ঞাসা করলে।

—শুধু ভয়েই নয়, ভরসাও কিছু ছিল।

অঞ্জনা ঠোঁট টিপে হাসলে। বললে, সবচেয়ে ভরসা জাগল যেদিন মায়ের জন্যে থান ধুতি, ভাই-বোন দুটোর জন্যে ফ্রক আর ইজের, নিজের জন্যে রঙীন শাড়ি-ব্লাউজ, এক ঠোঙা খাবার নিয়ে ফিরলাম। মায়ের হাতে তুলে দিতে মা একটু হাসলে। ছুরির মতো বাঁকা একটুখানি হাসি প্ল্যাটফর্মের আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠল।

মায়ের মুখের হাসি উদ্বাস্তু-জীবনে সেই প্রথম এবং শেষ। আর কোনোদিন কিন্তু কেউ তাকে হাসতে দেখেনি। সে হাসির যে কি অর্থ আজ পর্যন্ত আমি ভেবে পাইনি।

দেখতে দেখতে আমার চেহারায়, সাজ-পোশাকে, কথাবার্তায় একটা জৌলুস এল। পড়শীরা আমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। বয়স্করা মুখ টিপে হাসে।

পিছন ফিরে মা থাকত নিঃশব্দে বসে। পড়শীরা মুখ টিপে হাসত। লজ্জা করত ভীষণ।

রঞ্জনা একদিন জিজ্ঞাসা করলে, নিত্যি নতুন-নতুন শাড়ী কোথায় পাস লো?

হাসলাম। লজ্জা-পাওয়া হাসি।

বললাম, কেন? কলকাতা শহরে শাড়ির কি অভাব আছে?

রঞ্জনাও হাসলে। সে হাসি যেন বেঁধে।

বললে, কি জানি। আমরা তো পাই না।

—চাস? নিবি?

—না।

আরও দু'দিন একই প্রশ্ন সে করলে। আমিও একই উত্তর দিলাম। ও রাজি হল না। বুঝলাম, ওর মন টলছে। কিন্তু ভয় পাচ্ছে। বাপ-মায়ের ভয়—যে-সমাজ নেই, ভেঙে গেছে, ফেলে এসেছি, তার ভয়,—সংস্কারের ভয়।

কিন্তু মন টলছে। কারণ আর পারছে না। প্রায় নিত্যদিনের অনশন, অর্ধাশন। ছোটরা খেয়ে যা থাকে ওরা খায়। ওদের পরে যা থাকে, বাপ খায়। তারপরে আর বাকি বেশি থাকে না।

খুব ছোট যারা, আর পাঁচজনের দেখাদেখি তারা স্টেশনে ভিক্ষা আরম্ভ করেছে। বড়রা বড়-রাস্তা পর্যন্ত এগিয়েছে। সরকারী সাহায্য ধীরে ধীরে কমে আসছে। তারও অনেক ঝামেলা। যাদের বাড়িতে বড় বড় মেয়ে আছে, তারা পাচ্ছে। যাদের নেই, তাদের প্রায়ই মুখ শুকিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে।

একদিন দেখি রঞ্জনার পরনে নতুন শাড়ি।

বললাম, এই তো, শাড়ির দোকান খুঁজে পেয়েছিস?

পেলাম অনেক কষ্টে।

বললে বটে, কিন্তু মুখখানা কাঁদ-কাঁদ।

জিগ্যেস করলাম, পেলি তো মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন?

এবারে রঞ্জনা কেঁদেই ফেললে।

স্টেশনের এক নিরিবিলি কোণে বসে খুব খানিকটা কাঁদলে। বাধা দিলাম না। আজ প্রথম দিন, খুব খানিকটা কাঁদুক, যাতে আর কোনোদিন কান্না না আসে। একদিনে, এই প্রথম দিনেই, সব কান্না শেষ হয়ে যাক।

অনেকক্ষণ পরে তার কান্না থামল।

একটু সুস্থ হতে জিগ্যেস করলাম, কে দিলে রে?

মুখ নামিয়ে বললে, রিলিফের বাবু।

—বলিস কি রে!

—হাঁ। দু'দিন গিয়ে ফিরে এসেছি! চাল দেয়নি। আজ সকালে যেতে বললে, বিকেলে এস। বিকেলে গেলাম। খুব ভিড়। একটা হট্টগোল চলছে। যেন রাজবাড়িতে কাঙালী-বিদেয় চলছে। বাবুটি ইসারায় আমাকে অপেক্ষা করতে বললে। বসেই আছি, বসেই আছি। একে একে সবাই যে-যার 'ডোল' নিয়ে চলে যেতে লাগল। আমি এককোণে চুপ করে বসেই আছি।

হঠাৎ আমার দিকে মুখ তুলে ডান হাত দিয়ে ওদিকের প্ল্যাটফর্মটা দেখিয়ে বললে, ওদিকে একটা কালো মতন মেয়ে ঘুরে বেড়ায়, কি যেন তার নাম?

—নাম জানি না।—জিগ্যেস করলাম,—সেও ছিল বুঝি?

—হ্যাঁ। সে জিগ্যেস করলে, চুপ করে বসে আছ, চাল নেবে না? পাশেই আর একটি মেয়ে চাল নিয়ে চলে যাচ্ছিল। তাকে চিনি না। বয়েসে আমাদের চেয়ে খানিকটা বড় হবে। ওই মেয়েটার কথার জবাবে সে ফিক করে হেসে বললে, আমরা সবাই চলে গেলে ও ভালো চাল নেবে। দেখছ না, নিশ্চিন্তি

বসে আছে! ও মেয়েটাও আর কিছু বললে না। ফিক করে হেসে চলে গেল।

—তারপর?

—তারপরে সবাই চলে গেল, বাবুটি ইসারায় আমাকে ডাকলে। জিগ্যেস করলে, তোমার পরনের কাপড় অমন ময়লা কেন, ছেঁড়া কেন? কাপড় পাওনি তুমি? আমি জবাব দেবার আগেই এই কাপড়খানা আমাকে দিলে। আমি নোব কি নোব না ভাবছি, বাবু হেসে বললে, ভাবছ কি? ভিতরের ঘরটা দেখিয়ে বললে, ওই ঘরে গিয়ে পরে দেখ, ঠিক হবে কি না। বললাম, ঠিকই হবে বাবু। বাবুটি হেসে বললে, সরকারী কাপড়, বিশ্বাস কিছু নেই। হয়তো দেখবে ছোট, নয়তো ফুটো, নয়তো কাটা। পরে দেখ। সবাই তাই করে।

একটু চুপ করে রঞ্জনা বললে, আমিও তাই করলাম।

বলেই আবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।

বললাম, আ মোলো! তা কাঁদিস কেন?

তুই কাঁদিস নি?

—না। আমি কাঁদিনি। আমার মা কথা বলে না। কাঁদব কেন? সমাজ এই আমাদের দিলে। এর বেশি আর মেয়েদের দেবার কিছু তার নেই। তার ভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেছে।

বললাম, আমি কাঁদিনি। তুই কাঁদিস না। আমরা কেউ কাঁদব না।

রঞ্জনা বললে, তবে?

বললাম, এই কান্না সমাজ আমাদের দিলে। এই কান্না সমাজ আমাদের কাছ থেকে ফিরে পাবে।

বললাম, এ তো জল নয়, গলিত আগুন। এই আগুন আমাদের কাছে হাত পেতে সমাজকে নিতে হবে।

রঞ্জনা অবাক হয়ে আমার জ্বলন্ত চোখের দিকে চেয়ে রইল

খঞ্জনার দিকে চেয়ে হেসে অঞ্জনা বলতে লাগল :

খঞ্জনা তখন রং-চটা প্রজাপতির মতো উড়ছে। পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়, তেলের অভাবে মাথার চুলে খড়ি উঠছে, গাল ভাঙা, চোখ বসা,—কিন্তু মনের মধ্যে রঙের অজস্র সমারোহ।

গাঁয়ে থাকতেই একটি ছেলের সঙ্গে ওর ভাব হয়েছিল। বিয়ের কথাও প্রায় পাকা-পাকি! এমন সময় ঝড়ের মুখে নোঙর তোলার ডাক পড়ল। সেই ডামাডোলে কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল ঠিক নেই।

গোয়ালন্দে পৌঁছে সেই ছোকরার বাপ-মায়ের পাত্তা পাওয়া গেল না। মধ্যপথে তারা কোথায় ছিটকে পড়েছিল। কিন্তু সেই ঝড়-তুফানের মধ্যেও ছোকরাটি সব ছেড়ে দিয়ে খঞ্জনার আঁচল ধরে ঠিক শেয়ালদহ স্টেশনে এসে উপস্থিত!

খঞ্জনা দুহাতে মুখ ঢেকে ফিক ফিক করে হাসছে।

—কী যেন সেই ছোকরাটির নাম?—অঞ্জনা জিজ্ঞেস করলে।

খঞ্জনা জবাব দিলে না। জবাব দিলে রঞ্জনা : বরুণ।

—হ্যাঁ বরুণ। বরুণ বাপ-মায়ের খোঁজে সমস্ত দিন পাগলের মতো চষে বেড়ায়। স্নানাহার কোনোদিন হয়, কোনোদিন হয় না। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় ঠিক শেয়ালদা স্টেশনে

খঞ্জনা এবার, মুখ ঢেকেই অবশ্য, জোরে জোরে হেসে ফেললে। এত মিষ্টি হাসি যে, মজুমদার পর্যন্ত অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলেন।

অবশেষে তাদের পাত্তা পাওয়া গেল। কোথায় যেন তাদের আটকে রেখেছিল। দিন দশেক পরে ছাড়া পেয়ে পৌঁছুল। ওই প্ল্যাটফর্মেরই আর এক প্রান্তে আমাদের মতো পোঁটলা-পুঁটলির বেড়া দিয়ে তারাও বাঁধল ঘর।

বরুণ বাঁচল। কিন্তু তার খাটুনি কমল না। একটা লোকের ঘাড়ে চাপল দুটো সংসারের বোঝা: নিজের, সেই সঙ্গে খঞ্জনাদেরও।

বলতে গেলে আগের মতোই সমস্ত দিনই সে ঘোরে।

খঞ্জনা সমস্ত দিন একলাই থাকে।

মাঝে মাঝে আমরা তাকে ডাকি : আসবি আমাদের সঙ্গে ?

—কোথায় ?

—যেখানে আমরা যাব।

—সে কোথায় ?

—ধর সিনেমায়।

—না।

—বেশ, চল এমনি রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরি গে।

—না।

খঞ্জনা আমাদের সঙ্গে কোথাও যাবে না। আমাদের সঙ্গে মিশবে। রাত্রে আমরা ফিরে এলে,—একসঙ্গে অবশ্য নয়, আগু-পিছু,—ও এসে আমাদের কাছে বসবে। আমাদের গল্প গো-গ্রাসে গিলবে। কিন্তু এই স্টেশনের বাইরে আমাদের সঙ্গে কোথাও যাবে না।

ভয় নয়। বলতে পারেন, সংস্কারে বাধছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা বরুণের প্রেমে ও তখন হাবুডুবু খাচ্ছে। বিয়ের সবই প্রায় ঠিক ঠিক। বরুণের একটা হিল্লে হলেই হয়।

কিন্তু আমরা থাকতে আর হিল্লে হল না। না বরুণের, না ওদের পরিবারের।

পাঁচজন বন্ধুর সাহায্যে আগরপাড়ার দিকে একটা জায়গা জবর-দখল হয়ে গেল। তার ওপর ছাঁচিবেড়ার ঘর উঠল। তার গায়ে মাটি দেওয়া হল। মেঝেয় সিমেন্ট।

আমাদের বাড়ী হয়ে গেল। আমাদেরও রঞ্জনাদেরও।

দুজনে যখন গেলাম খঞ্জনার কাছে বিদায় নিতে, খঞ্জনার মা তখন চারখানা ইঁটের ওপর ভাতের হাঁড়ি চড়িয়েছে। দুটো ছেলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মায়ের উপর।

মা পড়ে যেত উনোনে। খুব সামলে গেল। তারপরে উনোন থেকে একটা আধপোড়া কাঠ নিয়ে যা মারটা দিলে ছেলে ছুটোকে, হাসিমুখে খঞ্জনার কাছে বিদায় নোব কি, কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ছেলে ছুটো জ্বলন্ত কাঠের ছেঁকায় কাটা ছাগলের মতো মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর কাতরাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের লম্বা উদ্বাস্তু-জীবনে এ আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। এমন নিত্যি ঘটছে। এর চেয়েও কত কঠিন ঘটনা। আমাদের কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। তবু ছিলাম।

তার মানে, মাথা গোঁজবার আশ্রয়টা তৈরী হবার আগে আমরা মনে মনে 'ভদ্রলোক' হয়ে গিয়েছিলাম!

খঞ্জনা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি পর্যন্ত এল। আমরা ট্যাক্সি করে যাচ্ছি দেখে তার চোখ চক চক করে উঠল। আমরা ট্যাক্সি করে যাওয়ার অবস্থায় এসেছি দেখে ও বোধ হয় অবাক হয়ে গিয়েছিল। ওর মনটা বোধ হয় একটু ছুলে উঠেছিল। না রে?

অঞ্জনা খঞ্জনার দিকে কৌতুকভরে চাইলে।

লজ্জিতভাবে অঞ্জনা বললে, এর পরের কথা যেমন বিচিত্র, তেমনি নোংরা। সে আর নাই শুনলেন দারোগাবাবু।

অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক উপন্যাস পড়তে পড়তে শেষ না হওয়ায় যেমন থামা যায় না, মজুমদারের তাই হয়েছিল। থামতে চাইছিলেন না।

বললেন, না, বল। শুনব।

—শুনবেন?

একটা ললিত ভঙ্গীতে হেসে অঞ্জনা যেন নিজেকে তৈরী করে নিলে সেই বিচিত্র কাহিনী বলবার জন্যে। চোখ বন্ধ করে স্মৃতির গহন অন্ধকারে যেন ডুব দিলে।

ধীরে ধীরে বললে, সময়টা পাঁজির হিসেবে খুব লম্বা নয়। বড় জোর সাত আট বৎসর। শেয়ালদা স্টেশনের আশ্রয় ছেড়ে

কলোনীতে যাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত। দু'এক বছর কম বেশিও হতে পারে। কিন্তু পাঁজির হিসেবে ঘড়ির মাপকাঠিতে এর সত্যিকার দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে না। পাকা রাস্তার দু' মাইল আর খানা-খন্দ-পাহাড়-জঙ্গলের চড়াই-উৎরাই দু' মাইল গজ-কাঠির মাপে সমান হলেও আসলে তো সমান নয়। এই আট বছরে আমি আশী বছরের পথ পার হয়েছি।

আশী বছর তো কম নয়!

অনেক নাম ভুল হয়ে গেছে। অনেকের নামটা হয়তো মনে আছে, সময়টা ভুল হবে। ঘটনাগুলো বলতে কখনও আগেরটা পরে হবে, পরেরটা আগে। সময়ের গায়ে কতকগুলো জটিল জটা ঝুলছে। এই গারদ-ঘরের মধ্যে বসে এখনি-এখনি তার জট ছাড়াতে তো পারবই না। কোনদিন পারব কিনা সন্দেহ। সময় যদি কখনও আসে সেগুলো ছেঁটে ফেলে তফাত করারই চেষ্টা করব।

সেই জটিল ঘটনা-জালের একটা কথা বলি ঃ

তখন চলেছে একটা উদ্দাম জীবন। বাধাবন্ধহীন। সন্ধ্যেয় বেরিয়ে যাই, ফিরি রাত্রি একটা-দুটোয়। রাস্তার কুত্তাগুলো ছাড়া আর কেউ তখন জেগে নেই।

কোনো রাত্রে আর ফেরাই হয় না কখনও কখনও একাদিক্রমে তিন-চার রাত্রি অনুপস্থিত থাকি। যখন ফিরি, অনেক রাত্রেই অবিশ্যি, তখন আর আমাতে আমি নেই।

কিন্তু বাড়ির লোকেরা এমনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কিছুরই জন্যে কেউ চঞ্চল হত না। ব্যস্ত কিংবা চিন্তিতও হত না। বরং সেইটেই যেন স্বাভাবিক। বরং কোনো কারণে উপরি-উপরি দু'তিন সন্ধ্যে বাড়ি থাকলেই যেন মা চিন্তিত হত। কিছু বলত না। শুধু আড়ে আড়ে উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করত ব্যাপারটা কি? জিগ্যেস করতে সাহস করত না।

এখনও সেই অবস্থাই চলছে। এই যে আমি থানায় পড়ে,

হয়তো কালও বাড়ি ফিরতে পারব না। ভাবছেন, বাড়ির কেউ চিন্তিত?

কেউ না।

আমাদের পরিবারে এইটেই আমার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। কোনো কারণে এর ব্যতিক্রম হলেই সবাই চিন্তিত হয়।

সবাই মানে, মা।

কিন্তু সব সময় এ তো ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে ক্লান্তি আসে, বিরক্ত হই। বলতে কি, মনের সেই অবস্থা এলেই কয়েকটা দিন বাড়ি থেকে বার হই না।

এই রকমের একটা মুহূর্তে একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল: দুটো ছোট ছেলেকে পড়াবার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রী দরকার। সন্ধ্যায় দু' ঘণ্টা পড়াতে হবে। বেতন ত্রিশ টাকা।

ত্রিশ টাকায় আমার সংসার চলবার দিন আর নেই। ত্রিশ টাকা ক'টা টাকা? তবু মনে হল, এই ভালো। গরীব গেরস্তর মতো থাকব। সেই ভালো। আবার সেই শান্ত গৃহস্থ জীবনে ফিরে যাবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

স্কুলে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছিলাম। পড়াশুনা করতে আমার ভালোই লাগত। বাবা আজীবন স্কুলে পণ্ডিতি করে এসেছেন। মাস্টারী আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে। বাপের রাস্তায় মেয়ে চলবে, সেইতো ভালো।

বিজ্ঞাপনের ঠিকানা অনুসারে গেলাম সেখানে। খুঁজে খুঁজে বাড়িটা বার করলাম।

গিয়ে দেখি, শুধু আমি নই, আমার আগে আরও অন্তত পঞ্চাশটা নানা বয়সের মেয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, অত সকালেই।

প্রকাণ্ড বড় বাড়ি। চাকর-দারোয়ান, মূল্যবান মোটরগাড়ি এবং সব মিলিয়ে বাড়ির শ্রী দেখলেই বোঝা যায় ধনী লোক।

একখানা সুসজ্জিত হলঘর ভর্তি হয়ে গেল। প্রথমে বসবার

জায়গা, শেষে দাঁড়াবার স্থানও আর রইল না। পরে যারা এল তারা বারান্দায় ভিড় করতে লাগল।

ভিড় ক্রমে বেড়ে চলল। কিন্তু বাবুর দেখা নেই। দারোয়ান বললে, নটার আগে বাবু নীচে নামেন না।

একথা শোনার পর ভিড় একটু কমে গেল। যে মেয়েরা কাজ করে এবং সম্ভবত এই কাজই করে, তাদের অন্যত্র পড়াবার তাড়া আছে। এই অনিশ্চিত কাজের জন্যে তারা নিশ্চিত কাজের ক্ষতি করতে পারলে না। একে একে কিছু মেয়ে চলে গেল। তবুও যা রইল তার সংখ্যা কম হবে না।

ন'টা বাজতে একটা চাকর এসে জানিয়ে গেল, বাবু নেমেছেন। এইবার চুপ করে বসতে হবে।

ডাক পড়তে লাগল একে একে। আগে যারা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল কিংবা বারান্দায় পায়চারী করছিল তাদের ডাক হল। দুই ঘরের মধ্যে একটা পর্দা। বাবুকে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু কথা শোনা যাচ্ছিল।

কার কতদূর পড়াশুনো, কি রকম অভিজ্ঞতা, এই প্রশ্ন। উত্তর শুনতে শুনতে আমার তো মুখ শুকিয়ে গেল।

কি হবে আর মিথ্যে অপেক্ষা করে। সকলেই অন্ততঃ ম্যাট্রিক পাস। কেউ আই. এ., কেউ বা বি. এ.। এর মধ্যে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়া মেয়ের সম্ভাবনা কোথায়?

চলে আসবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় আমার ডাক পড়ল।

ভিতরে ঢুকে দেখি অতি সুদর্শন এক বৃদ্ধ। বয়স পঁয়ষট্টির কম নয়। কিন্তু চেয়ে থাকবার মতো রূপ। বার্ধক্যও যে এত সুন্দর হতে পারে, এঁকে দেখবার আগে সে ধারণাটাও ছিল না।

কাঁচা সোনার মতো রঙ। মুখখানি পাকা আমের মতো চিকন এবং রসালো। মাথায় দুধের মতো সাদা বড় বড় কোঁকড়া চুল।

রিমলেস চশমার আড়ালে চোখ যেন সব সময় হাসছে। শান্ত, সৌম্য, মূর্তি।

জিগ্যেস করলেন, দুটি কথা : কতদূর পড়েছি, ছোট ছেলে পড়াবার ধৈর্য আমার আছে কিনা।

উত্তর শোনামাত্র আমাকেই মনোনীত করলেন। পরের দিন রবিবার। সোমবার থেকে আমাকে পড়াতে আসতে হবে, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা।

একেই বলে অদৃষ্ট !

অদৃষ্টের সুখ্যাতি করতে করতে বাড়ি ফিরলাম। অত ম্যাট্রিক, আই. এ., বি. এর মধ্যে আমাকে যে পছন্দ করা হল, সে অদৃষ্ট ছাড়া আর কি !

আমার অদৃষ্ট যে খুব চৌকশ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অত উচ্চ শিক্ষিতার মধ্যে আমাকে মনোনয়ন করার রহস্যটা মাসখানেক পরেই টের পাওয়া গেল। আমাকে তাঁর ভালো লেগেছিল।

আমার উপর ভার পড়েছিল রায়বাহাদুরের ছোট ছোট পৌত্রকে পড়াবার। বড়লোকের আদুরে নাতি। এত অল্প বয়সে তাদের স্কুলের পাঁচটা দুরন্ত ছেলের মধ্যে পড়তে পাঠাতে রায়বাহাদুরের ঘোরতর আপত্তি। তাই বাড়িতে পড়বার ব্যবস্থা। তাঁর আরও বিশ্বাস মেয়েরা ছোট ছেলেদের যেমন সুন্দর করে ভালবেসে পড়াতে পারে, তেমন ছেলেরা পারে না। সুতরাং শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন হল এবং সেই সূত্রে আমার আগমন।

চমৎকার লোক। কর্তা-গিন্নী দুজনেই।

ছেলেদের পড়াবার সময় রায়বাহাদুর মাঝে মাঝেই এসে বসতেন। ছেলেরা আমাকে 'দিদিমণি' বলত,—স্বেচ্ছায় কি রায়-বাহাদুর শিখিয়ে দিয়েছিলেন জানি না,—সেই সম্পর্কে রায়বাহাদুরও দুদিনে আমার সঙ্গে নাতনী সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললেন।

গিন্নীও বড় চমৎকার মানুষ। সাধারণত বড়লোকের অলস গৃহিণীরা যেমন স্থূল হন, সে রকম নন। ছিপছিপে, বরং রোগাই বলা যেতে পারে। কথা-বার্তায় মোটেই অহংকারী নন। খুব মিষ্টি কথা।

কিন্তু মাঝে মাঝেই আমার সন্দেহ হত, মনে ঠিক সুখ নেই। চোখের কোণে যেন দুঃখ জমা। অনেক চাপা দুঃখ। যে দুঃখের অংশ নেবার কেউ নেই। কি রকম আশ্চর্য মনে হত।

বড় ঘরের বৌ। ছেলে-মেয়ে নাতী-নাতিনীতে ভরা সংসার। তার আবার দুঃখ কিসের? ও-বয়সের গিন্নী-বান্নিদের সম্পর্কে স্বামীর প্রসঙ্গ বড় মনে আসে না। ও-বয়সের স্ত্রীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক থাকে না বল্‌লেই চলে। তবু অমন ভদ্র, সুদর্শন, সুরসিক স্বামী।

ভাবতাম, ছেলেমেয়ে হয়তো মারা গিয়ে থাকবে। সেই শোক চাপা আছে। মায়ের অন্তরের পুত্র-শোক চিতায় ওঠার আগে যায় না।

কৌশলে জিগ্যেস ক'তাম ছেলেদের। তারা বলতে পারত না। তাদের জ্ঞানে কেউ মারা যায়নি। ভাবতাম, ওরা জানে না। ওদের জন্মের আগে মারা গিয়ে থাকবে হয়তো কোনো কাকা-জ্যাঠা কি পিসিমা।

অবিশ্যি এ নিয়ে আমার যে কোনো আগ্রহ ছিল তা নয়। এককালে গৃহিণী যে পরমা সুন্দরী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সেই রূপের এখনও যা অবশিষ্ট আছে তার সঙ্গে চোখের ওই বিষণ্ণতা যেন খাপছাড়া ঠেকত, এবং সেই খাপছাড়া ভাবটা মনের মধ্যে বিঁধত।

যাই হোক, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ খুব বেশি হত না। বাড়িতে কোনো নতুন খাবার-টাবার হলে কখনও চাকরের হাত দিয়ে নিচেই পাঠিয়ে দিতেন। আবার কখনও উপরে আমাকে

ডেকে পাঠিয়ে সামনে বসে খাওয়াতেন। ওটা তাঁর বরাবরকার একটা শখ। মানুষকে নিজের সামনে বসিয়ে নতুন জিনিস খাওয়ানো।

তার চেয়ে রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখাও বেশি হত, গল্পও বেশি হত।

ভদ্রলোক, যাকে বলে, মজলিসী চমৎকার গল্প করতে পারতেন। পুরোনো আমলের গল্প।

আগে এ বাড়িতে মজলিস বসত। হয় তো গানের মজলিস। নয় তো সাহিত্য কিংবা রাজনীতির বৈঠক। অনেক বড় বড় গাইয়ে, স্ত্রীলোক এবং পুরুষ, উপরের বালাখানায় গানবাজনা করেছেন। অনেক বড় সাহিত্যিক এবং রাজনীতিক নেতা এ-বাড়ি এসেছেন। অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকের নিজের হাতে সই-করা উপহার-দেওয়া বই আলমারিতে সযত্নে রাখা হয়েছে। অনেক রাজনীতিক নেতার বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠিও রয়েছে।

সে সমস্ত কথা ভারী চমৎকার করে বলতেন।

বলেছি তো, সেই বয়েসেই আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল প্রচুর, যা ও-বয়সের মেয়েদের হবার কথা নয়। সৌম্য চেহারা, সুন্দর কথাবার্তা। যাকে বলে নির্মল চাঁদিনী রাত। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে এক টুকরো মেঘের প্রতীক্ষা করতাম যেন। পরিষ্কার, চাঁদের আলোয় ধোয়া-মাজা আকাশ। কোনো কিনারায় মেঘের ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়ে না। তবু প্রতীক্ষা করতাম।

ও-বাড়ি থেকে ফেরবার সময় মনে হত, ওটা আমার মনের দোষ। অসৎ-সংসর্গে মিশে মিশে আমার মন নিচু হয়ে গেছে। সব কিছুকে সন্দেহ করা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ধপধপে সাদাতেও কালোর দাগ দেখা।

নিজেকে নিজেই তিরস্কার করতাম। কিন্তু তবুও মন শান্ত হত না। রায়বাহাদুর কত মজার মজার গল্প করে যেতেন। আমার মন কিন্তু

চেয়ে থাকত সেই কালো মেঘের টুকরোটার আসা-পথের দিকে। ভাবতাম, সে আসবে, আসবে, আসবেই।

একদিন হাসি-গল্পে নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল। ট্রেনেই যাওয়া-আসা করতাম। সেদিন হঠাৎ হাত-ঘড়িটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম।

রায়বাহাদুর জিগ্যেস করলেন, কি হল ?

ব্যস্ত ভাবে বললাম, দেরি হয়ে গেছে অনেকখানি। দশটা-দশের গাড়ি পাব কি না সন্দেহ।

—না পেলে ?

—সেই এগারো-বত্রিশ। বাড়ি পৌঁছুতে,

—ভাববে সবাই ?

—ভাববেই তো।

—আমার জন্যেই তোমার দেরি। সে হবে না। চল, মোটরে তোমাকে শেয়ালদা পৌঁছে দি।

—দেবেন ?—কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে বললাম,—কিন্তু আপনি কেন কষ্ট করবেন !

—করব না ? আমার জন্যেই তো দেরি। ওঠ, আর দেরি কোরো না।

না। দেরি করলাম না। কালো মেঘের টুকরোটা এসে গেছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না। তবু নিঃসংশয়ে অনুভব করছি, এসে গেছে, এখনি চোখের সীমানার মধ্যে এসে যাবে।

মোটরে উঠলাম যখন, তার আগেই মনে-মনে আমার মন তৈরি হয়ে গেছে।

সে রাত্রে বরাবর মোটরে করে রায়বাহাদুর আমাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। সে রাত্রে এবং তারপর আরও অনেক রাত্রে।

কিন্তু একদিন এ সুবিধা বন্ধ হয়ে গেল। দেখেছি, জীবনে

কোনো সুবিধাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একটা দুষ্ট গ্রহ কোথায় যেন ওত পেতে থাকেই। মানুষের সুবিধা তার সয় না। সুখ যখন বেশ জমেছে তখন হঠাৎ তার লেজটা দিয়ে সব ঘুলিয়ে ওলট-পালট করে দেয়!

আমাদেরও তাই হল।

একদিন পড়াতে গেলাম। পড়বার ঘরে বসে আছি, ছেলেরা কেউ আসে না। কি ব্যাপার? অসুখ-বিসুখ নাকি? কিন্তু দুটো ছেলের একই সঙ্গে অসুখ!

একটা চাকর এসে জানালে, ওরা কেউ আসবে না দিদিমণি, আপনি যান।

—কেন? কি হল?

—তা জানি না।

জানি না বললে বটে, কিন্তু যে রকম গম্ভীরভাবে গেল, তাতে একেবারেই কিছু জানে না বলে মনে হল না।

কিন্তু কি আর করা যায়!

এদিক-ওদিক চাইলাম, যদি কাউকে দেখতে পাওয়া যায়। কোনো ঝি-চাকর, কি বাড়ির কোনো লোক, কিংবা স্বয়ং রায়-বাহাদুরকেই ছেলেরা যে কারণেই হোক, না এল নাই এল। কিন্তু তিনি তো আসতে পারেন।

কিন্তু তাঁরও দেখা পাওয়া গেল না।

তাহলে?

দূরে এদিকে-ওদিকে দু'একজন দাসী চাকরকে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত বাড়ির ভাবটা এমন গম্ভীর, থমথমে যে, জোরে তাদের ডাকতে সাহস হচ্ছে না।

একজনের চোখে চোখ পড়তে ইসারায় ডাকলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সে সরে পড়ল। যেন আমাকে দেখতেই পায়নি।

খুব ঘোরালো ব্যাপার নিঃসন্দেহে !

কিন্তু কি রকম ঘোরালো ? কি হওয়া সম্ভব ?

চাকরটার কথার পরে চলেই আসতাম। কিন্তু কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসল। সমস্ত ব্যাপারটা না হোক, অন্তত খানিকটা আভাস না সংগ্রহ করে চলে আসতে মন সরছিল না।

ভাবছি কি করব। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিও। এমন সময় দোতলা থেকে ইন্দু-ঝি আমাকে কি যেন ইসারা করলে।

বুকে খানিকটা ভরসা এল।

মেয়েদের দুঃখ মেয়েরা ছাড়া আর কে বুঝবে ? ইন্দু-ঝি বুঝেছে ব্যাপারটা জানবার জন্যে আমার বুকের ভিতরটা খিমচোচ্ছে, এবং বোধ হয় বলবার জন্যে তারও।

আর একবার চাইতেই ইসারা করলে বাইরে যাবার জন্যে। তার অর্থ অবিশ্যি এও হতে পারত যে, আগের চাকরটার মতো সেও আমাকে চলে যেতেই বললে। কিন্তু আমি মনে মনে যোগ করলাম, একেবারে চ ন যেতে নয়। বাইরে কোথাও গিয়ে দাঁড়াতে, সে আসছে।

ঠিক তাই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরে সে এল। মুখখানা কিন্তু গম্ভীর।

বললে, দিদিমণি, এবাড়ি আর তুমি এসনি।

বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল : কেন ?

—না। খুব খারাপ কাণ্ড ঘটে গেছে।—তার চোখ ছল ছল করে উঠল।

—কি হয়েছে ?

—গিন্নিমা কাল রাত্রে মারা গেছেন।—ইন্দু-ঝি চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছতে লাগল।

গিন্নীকে আমিও খুব ভালোবাসতাম। শুনে আমারও বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। চোখ ছাপিয়ে জল এল।

প্রায় চীৎকার করে উঠলাম ঃ সে কি কথা? কাল সন্ধ্যেবেলাতেও তো ভালো ছিলেন। হঠাৎ কি হল?

—হঠাৎ নয়। তিরিশ বছর এবাড়িতে আছি, ভালো তাঁকে কোনো দিনই দেখিনি। কিন্তু চাপা ছিলেন ভয়ানক। মর্যোদাজ্ঞানও ছিল তেমনি। কাউকে কিছু বলতেন না। কিন্তু আর পারলেন না। কত্তাবাবুর আফিঙের কৌটো থেকে একতাল আফিং নিয়ে …মাগো।

ইন্দু-ঝি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমিও শিউরে উঠলাম ঃ আত্মহত্যে!

—হ্যাঁ। তোমারই জন্যে। তুমি বাছা এ-বাড়ি আর এসনি।

ইন্দু-ঝি আর দাঁড়াল না। সাহস করলে না বোধ হয়। মাঝে মাঝেই সে চকমক করে এদিক-ওদিক দেখছিল। পাছে কেউ তাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে ফেলে।

সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। কিন্তু আর দাঁড়াবার দরকারও ছিল না। ব্যাপারটা বোঝবার পক্ষে সে যা বলে গেছে তাই যথেষ্ট। আর কীই বা বলতে পারত? মৃত্যুর বিবরণ, কত্তাবাবুর মানসিক অবস্থা, কি হয়তো .(গৃহস্থ বাড়ির ঝিয়েরা তো সব জান্তা) স্বামী-স্ত্রীর কলহের বিবরণ। তাতে আর এমন কি সুবিধা হত!

ইন্দু চলে যাবার পরও বোধ হয় অনেকক্ষণ সেইখানে ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম। কতক্ষণ জানি না। তারপর সেখান থেকে এলাম শেয়ালদা স্টেশনে।

অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

সেখানে সেই পুরোনো উদ্বাস্তুর ভিড় নয়। অপরিচিত নতুন উদ্বাস্তুর দল।

এরাও তেমনি বাক্স পুঁটলি দিয়ে নিজের ঘর ঘিরে নিয়েছে। সারাদিন চারিদিকে ঘুরে ঘুরে যে যা সংগ্রহ করতে পেরেছে, তাই দিয়ে রান্না চড়িয়েছে। উলঙ্গ শিশুরা তেমনি করে যাত্রীদের কাছে ভিক্ষে করছে। মায়েরা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। কিই বা রান্না, শেষ হতে দেরি হবে না। তখন ছেলেমেয়েদের বসিয়ে দেবে।

সবই সেই আমাদের মতো। অবিকল সেই এক ছাঁচে ঢালা জীবনযাত্রা। শুধু আমরা নই, এরা অন্য। অন্য জায়গা থেকে অন্য সময় এসেছে। এদের একজনেরও মুখ চেনা মনে হল না।

নাকি এরা আমরাই? একই খাতে একই নদী। শুধু আমরা আগের ঢেউ, এরা পরের। এক রং, এক স্বাদ, একই গতি!

যেখানে আমাদের ঘরটা ছিল সেখানে দাঁড়ালাম।

এই পথে নিত্য আমার যাওয়া-আসা। অথচ একদিনও জায়গাটা দেখতে ইচ্ছা হয়নি। দৃষ্টি ওদিকে যেতে চাইলে জোর করে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়েছি। ওই জায়গাটার ওপর কেমন যেন ঘেন্না হয়ে গিয়েছিল। উলঙ্গ কুৎসিত জীবনের ওপর ঘেন্না।

আশ্চর্য। সেই জায়গাটাই টানলে অনেক দিন পরে।

অবিকল সেই আমাদের ঘর। একটি মা রান্না চড়িয়েছে যেন আমারই মা। ওপাশে চেয়ে দেখি একটি বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে একমনে তামাক টানছে। অন্য কোনো মেয়ের বাবা। কিন্তু ঠিক যেন আমারই বাবা। আমি জানি, আমারই বাবার মতো ও সহজে চোখ মেলবে না। চোখ মেলবার উপায় নেই। ওর দুই চোখ স্বপ্নে বোঝাই। অতীতের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় ভরা স্বপ্ন। বর্তমানের অন্ধকারে চোখ মেলতে ভয় পায়।

দাঁড়িয়ে আছি।

ওইখানটায় রঞ্জনাদের ঘর ছিল। রঞ্জনার চিররুগ্ন মা ওইখানে একটা বাক্সয় ঠেস দিয়ে দিনরাত্রি ধুঁকত। আর তার পাগলা ভাইটা পিছনে বসে ক'টা কাঠি দিয়ে কাল্পনিক জাল বুনত।

এই ঝড়-বাদলে কোথায় কোন নদীতে মাছ ধরবে সেই জানে। কিন্তু জাল বোনার আর বিরাম নেই। মাথা তুলত না, কে আসছে-যাচ্ছে দেখত না, ক্ষিদে-তেষ্টার বোধও ছিল না, অনর্গল শুধু জাল বুনে চলত!

তারা নেই। তার জায়গায় অন্য পরিবার এসেছে। পৃথিবীতে শূন্য কিছু থাকবার যো নেই। আর কিছু এসে সেই ফাঁক ভরাট করে দিচ্ছে। রঞ্জনাদের ফাঁক অন্যে এসে ভরাট করে দিয়েছে, এবং অন্য রঞ্জনার ভাই, কে জানে এও হয়তো এক মনে অনর্গল জাল বুনে চলেছে। অন্য একটা জাল। আমি দেখতে পাচ্ছি না।

ওই ওদিকে লোহার বেড়া।

মনে হল যেন রং বদলেছে। নতুন রং করা হয়েছে হয়তো। আগে ছিল বোধ হয় পাটকিলে রং। এখন একটা কাল্‌চে-হলচে। ওখানটায় একটু অন্ধকার, ওরই মধ্যে একটু অন্ধকার।

সেই আধো-অন্ধকারে খঞ্জনা আর বরুণ মাঝে মাঝে গল্প করত। খঞ্জনা ঠেস দিয়ে দাঁড়াত ওই বেড়াটায়। সামনে বরুণ। কি কথা বলত জানি না। কোনো দিন জানতে চাইও নি। বোধ হয় কোনো গল্পই করত না। ওই বয়সের ছেলে-মেয়ে অমনি আধো অন্ধকারে বিনা কথার যে গল্প সর্বকালে করে থাকে, তাই।

ও জায়গাটা খালি। কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে নেই। এরা, এই নতুন খঞ্জনারা কি বিনাকথার গল্প করতে ভুলে গেল?

দাঁড়িয়ে আছি। একা। অন্য মনে।

একটি উলঙ্গ শিশু এসে দাঁড়াল। হাত পেতে।

আমি প্রথমে ভাবতেই পারিনি ও আমার কাছে হাত পাতছে। আমার কাছে কেউ হাত পাততে পারে, এ আমি কল্পনাই করিনি। যখন বুঝলাম, আমার কাছেই, সত্যি আমার কাছে, হাসি এল।

কিন্তু কিছুই না বলে ব্যাগ খুলে একটি টাকা বের করে দিলাম তার হাতে।

সে মুঠো বন্ধ করে না। হাসে।

ভাবছে আমি তাকে ঠাট্টা করছি। পালাবার চেষ্টা করলেই আমি তার হাত চেপে ধরব। আস্ত একখানা এক টাকার নোট কেউ তাকে দিতে পারে সে তার চিন্তার বাইরে।

সে হাসে।

ওকে যেতে বলা মিছে। ও যাবে না। ও বিশ্বাস করতে পারবে না আমি ওকে টাকাটা নিয়ে চলে যেতে বলছি। তার চেয়ে আমারই চলে যাওয়া ভালো। বরং গাড়িতে গিয়েই বসা যাবে।

গেটের কাছে এসে পিছন ফিরে চাইতে দেখি, ছেলেটা তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে। তার হাতের মুঠি তেমনি খোলা। নিষ্পলক দৃষ্টি আমার দিকে। তার গুটিকয় বন্ধু তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নানা প্রশ্ন করছে, ও তার জবাব দিচ্ছে না। কানেই যাচ্ছে না তাদের প্রশ্ন।

কি জবাব দেবে?

ও কি জানে আমি ওর আগের জন্মের দিদি? জানে আমারও উলঙ্গ ভাই ওইখানে দাঁড়িয়ে ঠিক অমনি করে ভিখ্ মাগত?

কত কথাই তো মানুষ তখন-তখনই জানতে পারে না।

আমিই কি জানতাম, ওই প্ল্যাটফর্মকে ঘিরে যত কথা আমি ভাবলাম সেই সমস্তর আড়ালে অন্য একটা কথা আমার মনকে নাড়া দিচ্ছিল? রায়বাহাদুর গৃহিণীর আত্মহত্যার কথা?

ট্রেনের কামরায় একা গিয়ে বসতেই মনে হল, সুড়ঙ্গের অন্ধকার পার হয়ে হঠাৎ সেই কথাটার সামনে এসে পড়লাম।

যেন অতর্কিতে।

রায়-বাহাদুর গৃহিণী আত্মহত্যা করেছেন…

"এ বাড়ি তুমি আর এসনি দিদিমণি"…

একটা চাকায় বাঁধা দুটো রঙীন আলোর মতো তারা আমার মনের আকাশে ঘুরতে লাগল।

কি আনন্দ যে হল, সে আর বলবার নয়।

"যে-কান্না সমাজ আমাদের দিলে, সেই কান্না সমাজ আমাদের কাছ থেকে ফিরে পাবে"। সবই আয়নায় মুখ দেখা! না কি বলেন, দারোগাবাবু?

মজুমদার চুপ করে বসে রইলেন। জবাব দিলেন না।

অঞ্জনা বললে, সেই দিন থেকে ছেলে-পড়ানো শেষ হল। কিন্তু ফিরে এলাম না আর সেই পুরোনো ব্যবসায়। ঘেন্নায় নয়, ঘেন্না আমার কিছুতেই নেই। বোধ হয় পুরোনো বলেই আর ভালো লাগল না।

কিন্তু নতুন কীই বা করা যায়? পথ তো আমাদের জন্যে খুব বেশি খোলা নেই। যা আছে, আমার বিদ্যে ততদূর নয়।

সেই সময় মা পড়ল অসুখে।

তখনও শেয়ালদা স্টেশনে থাকলে ঝামেলা হত না। বিনা চিকিৎসায় ক'দিনেই কাজ শেষ হয়ে যেত। মায়ের নিজের ইচ্ছেও তাই .ছিল। কিন্তু শেয়ালদা স্টেশনে যখন নেই, তখন মায়ের ইচ্ছে যাই হোক, আমাকে ডাক্তার ডাকতে হল।

আমাদের কলোনী থেকে অল্প দূরে একটি ডাক্তার ছিলেন। তিনিও উদ্বাস্তু। আমাদের মতোই তিনিও পাবনা না কোথা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তবে আমাদের মতো অসহায় উদ্বাস্তু নন। ডাক্তারীটা পাশ করা ছিল। তাছাড়া এখান থেকে পলাতক কোনো মুসলমানের সঙ্গে বাড়ি-বিনিময় করে একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তিনি এলেন। রোগী দেখে মুখ গম্ভীর করলেন।

ভয় পাইনি। যেতে পারলে মাও বাঁচে, আমরাও যে বাঁচি না তা নয়। তার ভিতরে যে দিনরাত্রি কি আগুন জ্বলছে তা তো জানি।

তবু মা।

জিগ্যেস করলাম, কি-রকম দেখলেন ডাক্তারবাবু ?

—খুব খারাপ নয়। কিন্তু।

—কিন্তু কি বলুন।

—এ তো ব্যয়সাধ্য রোগ। খরচ করতে পারবেন ?

—না করে উপায় কি ?

ডাক্তারবাবু বিস্মিত হলেন। বললেন, কি করে করবেন ?

—সে শুনে কি করবেন ? আপনি চিকিৎসা করুন। খরচে জন্যে ভাববেন না।

ডাক্তারবাবু আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল না। মুখে বললেন, ঠিক আছে। খরচ করতে পারলে এ রোগী আমি বাঁচাব, কথা দিলাম।

তাঁর কথা তিনি রাখলেন। রোগী বেঁচে উঠল।

মা যেদিন পথ্য করলে সেদিন বললাম, মাকে আপনি বাঁচিয়ে তুললেন তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করব না।

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, ওসব আবার কি বলতে আরম্ভ করলে ! তোমার মা কি আমারও মা নন ?

হেসে বললাম, নিশ্চয়ই। ফি না নিয়ে চিকিৎসা করেন এমন দয়ালু ডাক্তারের কথা যে শুনিনি তা নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে ওষুধ-পথ্যশুদ্ধ যোগান এমন ডাক্তার কটা দেখা যায় !

ডাক্তার জবাব দিলেন, তুমি ডাকলে এমন ডাক্তার অনেক দেখা যাবে।

—কেন, আমি কি ?

—সে আর আমার কাছ থেকে নাই শুনলে। আর কোনো ডাক্তার যদি তোমার পথে এসে পড়েন, তাঁকে জিগ্যেস কোরো।

সে সুযোগ যে হয়নি তা নয়। বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁদেরই উৎপাতে আমি নার্সগিরি শিখতে শিখতে মাঝপথে ছেড়ে

দিলাম। এই ডাক্তারবাবুই আমার জন্যে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ছেড়ে দিয়ে এলাম কোথায়? "নেতাজি মাসাজ ক্লিনিকে"।

এখন মনে হচ্ছে, ছেড়ে দিয়ে বোকামি করেছি। সে পথে থাকলে আর যাই হোক, আমাকে পুলিশ হাজতে আসতে হত না।

অঞ্জনা হাসতে লাগলো।

রঞ্জনার কথা

রঞ্জনা বলতে লাগল :

আমাদের বাড়ি ফরিদপুরের এক গ্রামে।

দু'খানি দাওয়া-উঁচু এককুঠুরী ঘর। সামনে খানিকটা উঠান, চারিদিক বেড়া দিয়ে ঘেরা। এইতে আমরা থাকতাম। কিছু জোত-জমা ছিল। তাইতে সংসার কোনোরকমে চলে যেত।

বাবা লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি। কিন্তু পড়াশোনার আগ্রহ ছিল প্রচুর। প্রতিদিনের খবরের কাগজখানি পড়া চাইই। গ্রামে ভটচায-বাড়িতে একখানা করে বাংলা খবরের কাগজ আসত। সন্ধেবেলায় তাই শুনতে যেত। যুদ্ধের খবরেই তখন কাগজ ভর্তি। যা শুনত, বাবা তা কখনও ভুলত না।

কার সৈন্য কোন্ দেশে কোথায় রয়েছে, কোন্ যুদ্ধে কারা হারছে, এমন কি যুদ্ধের কৌশল পর্যন্ত বাবা আয়ত্ত করে ফেলেছিল।

ছুটির দিন যখন আমাদের পড়াশোনা থাকত না, তখন সেই সব গল্প আমাদের কাছে করত। খুব চমৎকার গল্প করতে পারত বাবা। আমরা একমনে সেই সব গল্প শুনতাম।

বাবা লেখাপড়া শেখেনি, কিন্তু পড়াশোনার আগ্রহ ছিল খুব। আমরা দাওয়ায় বসে হারিকেনের আলোয় পড়তাম, বাবা উঠানে বসে জাল বুনত আর শুনত।

ওই আর একটা নেশা ছিল বাবার : জাল বোনা। নিজেই তকলিতে সুতো কাটত, নিজেই গাব দিয়ে সেই সুতো মাজত, আর নিজেই কাঠি দিয়ে জাল বুনত। কত রকমের মাছ-ধরা জাল যে আমাদের বাড়িতে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। হাতে যখনই অন্য কোনো কাজ না থাকত তখনই, কি বাড়িতে বসে, কি রাস্তায়

বেড়াতে বেড়াতে, কি ভটচায-বাড়তে খবরের কাগজ শুনতে শুনতে, সব সময়ই বাবার জাল বোনা চলতই।

জাল বোনা, মাছ ধরা আর তরকারি লাগান, এই ছিল বাবার নেশা। যার জন্যে দরিদ্র অবস্থাতেও আমাদের খাওয়ার দুঃখ ছিল না।

যুদ্ধ শেষ হল। তারপরে ভারত ভাগ হল। স্বাধীনতা পেল। কিন্তু এই স্বাধীনতার দাম দিতে হল আমাদের। ধন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, মর্যাদা দিয়ে, সব রকমে।

হঠাৎ দেখা গেল, মুসলমান ছেলেরা পতাকা হাতে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে। তারা সব ভলান্টিয়ার হয়েছে। কিসের কে জানে।

বাবা বললে, আর এখানে থাকা চলবে না।

মা বললে, কেন ?

—ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেল। এটা মুসলমানদের ভাগে পড়ল।

—তাই বুঝি ? তাহলে আমরা যাব কোথায় ?

—হিন্দুস্থানে। তার মানে কলকাতায়।

—সেখানে থাকব কোথায় ?

—তা কি জানি ? আরও সবাই তো যাচ্ছে। তারাও যেখানে থাকবে, আমরাও সেইখানে থাকব।

বাবার আসতে যে খুব মন ছিল তা নয়। কিন্তু সবাই আসছে। পাড়ায় একা একটি ঘর হিন্দু তো আর থাকা যায় না। ভয় করে তো।

ইউসুফের সঙ্গে বাবার খুব দোস্তি ছিল। মুসলমান পাড়ার মোড়ল, বলতে গেলে, ইউসুফ চাচাই ছিল। বাবা একদিন তাকে ডাকল :

—ইউসুফ ভাই, কি করি বল তো ?

ইউসুফ চাচাকেও বেশ চিন্তিত মনে হল। এবং বেশ দুর্বলও। পাড়ায় তার জোর এরই মধ্যে যেন কমে গেছে।

কিছুক্ষণ সে জবাবই দিতে পারলে না।

তারপর বললে, সবাই তো যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে। তুমি থাকতে চাইছ কেন?

বাবা বললে, হাঁ ভাই, যেতে কারও মন চাইছে? সাতপুরুষের ভিটে। জমি-জায়গা, পুকুর-বাগান, দেবসেবা, এ সব ফেলে অচেনা, অজানা এক জায়গায় যেতে কেউ চায়?

—তবে যাচ্ছে কেন?

—ভয়ে।

ইউসুফ হাসলেঃ ভয় তো মনে শেতল ভাই। মনে ভয় থাকলে কেল্লার মধ্যেও ভয় করবে। মনে ভয় না থাকলে বিলে শুয়েও ভয় করবে না। না কি কও?

—তাই তো আমিও কই ইউসুফ ভাই। তার লেগেই তো তোমাকে ডাকা। তুমি সাহস দিলে আমি আর হিন্দুস্থানে যাই না। এইখানেই থাকি।

ইউসুফ চাচার মুখে যেন একটা বেদনার ছায়া পড়ল। পাকা ভুরু কুঁচকে গেল।

বলল, সাহস দেবার জোর অ.র আমার নাই ভাই। ছ্যামরা-গুলো আমাকে আর মানছে না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আড়ালে আমাকেও শাসাচ্ছে।

বাবা চিন্তিত হল।

ইউসুফ চাচা বললে, আমার ভরসা কর না। নিজের ভরসায় থাকতে পার, থাক।

.সে কি করে হয়?

যাওয়ার অসুবিধা সব চেয়ে বেশি ভটচায মশায়ের। এ গাঁয়ের

তাঁরাই জমিদার। প্রকাণ্ড বাড়ি। অঢেল টাকা। গাঁয়ের পুকুর-বাগানের বারো-আনা একা তাঁরই। সেই সব ফেলে যাওয়া তো সোজা কথা নয়।

বললেন, কিন্তু এ সব কথাও ভাবছি না। ভাবছি, ওই লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের ভার কাকে দিয়ে যাই? কত পুরুষের কুলদেবতা।

তিনি পরামর্শ দিলেন, সবাই ছুটছে বলেই যে আমাদেরও ছুটতে হবে তার কোনো মানে নেই। দেখি, অবস্থাটা কি দাঁড়ায়। যেতে যদি হয়ই, ধীরে-সুস্থে, ভেবে চিন্তে যেতে হবে। হুজুগ করে নয়।

ইউসুফ চাচার নয়, ভটচায মশায়ের ভরসাতেই আরও কিছুদিন রইলাম। ভরসার প্রধান কারণ, তাঁর তুটো বন্দুক আছে। বাড়িটাও মজবুত।

ছেলেরা রোজই স্টিমার স্টেশনে যায়। দেখে স্টিমার ভর্তি শুধু হিন্দু।

পতনশীল বস্তুর মতো পুরানো স্মৃতি রোমন্থনেরও একটা ঝোঁক আছে। নিজের ঝোঁকে তার বেগ বেড়ে চলে।

রঞ্জনারও তাই হল।

সে শুরু করেছিল ধীরে ধীরে, থেমে থেমে। কিন্তু যত বলে, তত বেগ বাড়ে। এখন তার কণ্ঠের উৎস খুলে গেছে। নিজের ঝোঁকে সে অনর্গল বলে চলেছে:

একটা মাস এমনি করে চলল। ভয়ে, উৎকণ্ঠায়। মেয়েরা সারারাত্রি ঘরের মধ্যে জেগে। ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দেয়। দিনে তেমন ভয় করে না।

এমনি অবস্থায় পুলিস একদিন ভটচায-বাড়িতে এসে উপস্থিত।

—আপনার তুটো বন্দুক আছে না?

—আছে।

—লাইসেন্স আছে ?

—আছে বইকি।

—কাল সকাল দশটায় বন্দুক দুটো নিয়ে একবার থানায় যেতে হবে!

ভটচায মশায়ের বড় ছেলে বন্দুক নিয়ে থানায় গেলেন, ফিরলেন শুধুহাতে।

সবাই ভীষণ দমে গেল।

সত্যি বলতে বড় ভরসা ওই বন্দুক দুটোই। সবাই বুঝলে, ও আর পাওয়া যাবে না।

তাহলে ?

ইউসুফ চাচা চুপি চুপি বাবাকে এসে বললে, আর 'তাহলে' নয়। বিন্দির বাগানে মুসলমান ছেলেরা জমছে। তিন-চার দিনের মধ্যে ভটচায-বাড়ি লুঠ হবে। ভটচাযের বড় নাতনীটির ওপরে ওদের নজর। তার আগে সরে পড়ো।

বাবা ভটচায মশাইকে খবর দিতে একটা চাপা ব্যস্ততা পড়ে গেল।

বেশি কিছু জিনিস নয়। মোট যত হালকা হয় ততই ভালো। আজ রাত্রেই চলে যেতে হবে।

নৌকা ঠিক হয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকারে আমরা শ'দেড়েক লোক 'দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়লাম।

সে কি ভয়! বুক দুরু দুরু করছে। পথেই কি ঘটে কে জানে!

বিন্দির বাগানের পাশ দিয়ে নদী। একে অন্ধকার রাত্রি, তাতে বাগান। লোক দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু বিড়ির আগুনে বোঝা যাচ্ছিল ওখানে কিছু লোক জমায়েত হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুলাম গোয়ালন্দ স্টেশনে।

টিকিট কাটা, সে এক বিভ্রাট! ওই ভিড় ঠেলে কে টিকিট

কাটবে? লম্বা সার। সে সার যে কোনো দিন শেষ হবে মনে হল না। আমাদের ভাড়ার টাকা সকলের কাছ থেকে হিসেব করে নিয়ে ভটচাযের বড় ছেলে গেলেন টিকিট কাটতে।

ফিরলেন এক ঘণ্টা পরে। শরীর গলদঘর্ম। মুখ লাল। পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই।

স্টেশনে তিল ধরার জায়গা নেই। কত লোক? এরা সব এই দেশে ছিল? আর সব এই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে? একটা দেশে কত লোক থাকে তাহলে?

সারা স্টেশনে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে অনেক পোশাকপরা ভলান্টিয়ার। কি তাদের উদ্দেশ্য কে জানে! কিন্তু পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছে, ভয়ে সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠছে। সব জায়গায় সর্বাঙ্গ ঢেকে মেয়েরা জড়ো-সড়ো হয়ে বসে।

এই সময় থেকেই আমার ছোট ভাইটা কি রকম যেন করতে লাগল।

খালি বলে, কাইট্যা দিবে, মাইর্যা ফেলবে।

ক'দিন ধরে আমাদের কথাবার্তা শুনে শুনে তার মনে ওই রকম ধারণা হয়েছিল। সব কেটে ফেলবে, মেরে ফেলবে, কেউ বাঁচবে না।

মজুমদার জিগ্যেস করলেন, কত বয়স তার?

রঞ্জনা বললে, তখন ছ'-সাত বছর হবে। তার চোখের চাউনি পর্যন্ত বদলে গেল। কোথাও কিছু শব্দ হলেই চকমক করে চারিদিকে চাইত আর বলত, কাইট্যা দেবে, মাইর্যা ফেলবে। কখনও আপন-মনেই বলত, কখনও বা চীৎকার করে উঠত

মা তাকে সামলাতে ব্যস্ত।

কিন্তু আমি ভাবতাম, একখানা ট্রেনে এত লোক আঁটবে কি করে?

তাই হল।

ট্রেনটা যখন স্টেশনে এল, দেখা গেল তাতে লোক গিজগিজ করছে। সব পলাতক হিন্দু। গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখ। কারও বা চোখে জল।

ভটচায মশাই তাঁর ছেলেকে বললেন, গোপাল, এ ট্রেনে কি ওঠা যাবে? বরং পরের ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করা যাক।

গোপাল হেসে বললেন, সেটাই কি খালি পাবেন ভেবেচেন? এইতেই উঠতে হবে।

ওঁদের আমাদের দেড়শো জনকে আগে দশটা ভাগে ভাগ করা হল। এক একজন লোকের জিম্মায় এক একটি দল। বলে দেওয়া হল, যে যে-গাড়িতে পারবে উঠে পড়বে। পরে সব খবর নেওয়া হবে।

প্রাণের দায় এমনি যে, ওই যাত্রী-বোঝাই গাড়িতে গোয়ালন্দ স্টেশনে কয়েক শো যাত্রী ঢুকে গেল। অবশ্য অবস্থাটা প্রায় ভেড়া-ছাগলের মতো। তবু আঁটলো তো!

রঞ্জনা হাসতে লাগল

বললে, ট্রেন যখন ছেড়ে দিল, তখন অনেকখানি ভরসা হল যে, কলকাতা পৌঁছুব। অবশ্য কেমন কলকাতা, কত বড় কিছুই জানি না। আমাদের বাড়ির কেউ জীবনে কখনও কলকাতা যায়নি। সেখানে আমাদের কোনো আত্মীয়ও নেই। সেখানে গিয়েও যে কি আরাম পাব জানি না।

শুধু এইটুকু ভরসা যে, সেখানে কেউ আমাদের আক্রমণ করবে না, নারীহরণ করবে না, ভয় দেখাবেও না। এবং সেই কথা ভেবেই খুশী হয়ে উঠেছিলাম।

রঞ্জনা একটু থেমে বোধ করি সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে লাগল।

রঞ্জনা বললে:

পথের দুঃখের কথা বলে লাভ নেই। অনেক ধাক্কা খেতে খেতে,

অনেক দুঃখ পেতে পেতে অবশেষে শেয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছুলাম।

ভটচায মশায়ের গলা পাচ্ছিলাম। তাঁর ছেলেরও।

আমরা সব একজায়গা হতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। গুনে দেখা গেল, ঠিক আছে। কেউ হারায়নি।

প্রশ্ন উঠল: কে কোথায় যাবে? কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ওঠবার সুবিধা আছে কি না?

অনেকের ছিল। তারা চলে গেল। অনেকের নেই। তাদের নিয়েই দুশ্চিন্তা। আমরা সেই দলের। স্থির হল, আপাতত আমরা শেয়ালদা স্টেশনেই থাকব।

সেদিনকার মুড়ি-মুড়কি ভলান্টিয়াররা দিলে। পরদিন মাটির হাঁড়ি, চাল-ডাল-কয়লা পেলাম। উনোন পেতে রান্না করে খেলাম।

তারপরে সেই মামুলী ইতিহাস:

ইটের বেড়া দিয়ে আস্তানা তৈরি আর সেই বে-আব্রু জায়গায় দিনরাত্রি বাস। সে তো আপনি জানেনই।

কেবল মুশকিল হল একটি জায়গায়: আমার ছোট ভাই কালুকে নিয়ে।

ও ছুটে ছুটে কেবল বেরিয়ে যায়। সকলকে ডেকে ডেকে বলতে লাগল, কাইট্যা ফেলবে, মাইর‍্যা ফেলবে। রাত্রে ঘুমের ঘোরে চমকে উঠে বসে। আর চীৎকার করতে থাকে, মাইর‍্যা ফেলবে, কাইট্যা ফেলবে।

তাকে কিছুতে সামলান যায় না।

প্রতিবেশীরা কেউ বিরক্ত হয়। কেউ বা সহানুভূতির স্বরে বলে, ছ্যামরার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমাদেরও সেই রকম সন্দেহ হতে লাগল। চোখের দৃষ্টি যেন স্বাভাবিক নয়।

সন্দেহই করতে পারি। আর কি করতে পারি বলুন। আমরা দুই বোনে মিলে ওকে সামলাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করি। কিন্তু একে

স্টেশনের ওই ভিড়। সকল সময় খেয়াল রাখতে পারি না। মায়ের কাছে বকুনি খাই।

বাবার কাজ হয়েছে স্টলে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়া। তাতে পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে নানা লোমহর্ষণ খবর থাকে। সেগুলো পড়ে আর অন্যান্য উদ্বাস্তু পুরুষের সঙ্গে তাই নিয়ে আলোচনা করে। কালুর কথা ভাবে বলে মনে হত না।

প্রায়ই কালু হারিয়ে যায়। বহুকষ্টে খুঁজে বার করি। কখনও প্ল্যাটফর্মের ভিতরেও চলে যায়। ভয় হয় ট্রেনে কাটা না পড়ে।

মারধোরও করা হয়। কিন্তু পাগলকে মারধোর করে লাভ কি? সে কি কিছু বোঝে?

হঠাৎ একদিন দেখা গেল সে আর বাইরে পালাচ্ছে না। গণ্ডির মধ্যে বসে দুটো কাঠি নিয়ে একটা অদৃশ্য সুতোর জাল বুনছে! দিনরাত্রি চলছে জাল বোনা। কারও সঙ্গে কথাও বলে না, কোনো-দিকে চেয়ে দেখেও না।

গ্রামে থাকতে বাবার জাল বোনা দেখেছে। সেইটে বোধ হয় হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়। তারপর থেকে আরম্ভ হল বাবার মতো জাল বোনা। আপনমনে।

দারোগাবাবু, কালুকে সামলাবার দায় থেকে বেঁচে গেলাম কিন্তু একটি পাগল ছেলে ওই দুর্দিনের মধ্যে জাল বুনছে, সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

মজুমদার জিগ্যেস করলেন, ছেলেটি এখন কেমন আছে?

—সে তো নেই।

—কি হল?

—বছরখানেক হল মারা গেছে।

রঞ্জনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

মজুমদার জিগ্যেস করলেন, কি হয়েছিল?

—ঠিক বোঝা গেল না। ইদানীং খাওয়াদাওয়া একেবারে কমে

গিয়েছিল। ঘুমও কমে গিয়েছিল। সমস্ত দিন শুধু জাল বুনত আপনমনে। এমন কি রাত্রে শুয়ে শুয়েও তার আঙ্গুল চলত।

রঞ্জনা একটু থেমে বললে, একদিন সকালে উঠে দেখা গেল সে বেঁচে নেই।

—শেয়ালদা স্টেশনেই ?

—না। তখন আমরা সবে কলোনীতে উঠে এসেছি। সংসার পাতার গোছগাছ চলছে তখনও। এটা আনতে হবে, ওটা দরকার। বাবা ছুটে বেড়াচ্ছে সেই সব যোগাড় করতে। কিছু পাওয়া যাচ্ছে, কিছু যাচ্ছে না। রান্না করতে বসে মায়ের মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বাবার কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। যা দেওয়া হচ্ছে হাসিমুখে খাচ্ছে, আর সমস্ত দিন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গ্রাম থেকে চলে আসার পর বাবার কিন্তু একটা আশ্চর্য পরিবর্তন হয়। গ্রামে থাকতে চাষের সময় চাষ আর অবসর সময়ে জাল বোনা আর মাছ ধরা। ঘোরাঘুরিটা ছিল না বললেই হয়। আমতলার ছায়ায় বসেই দিন কাটত।

শেয়ালদা স্টেশনে আসার পর থেকেই তার ঘোরাঘুরির উৎসাহ বেড়ে গেল।

ভোরে উঠেই বেরিয়ে গেল। কোত্থেকে একখানা শাড়ি, কি হয়তো কিছু চাল-ডাল, কি কাগজের ঠোঙায় করে কিছু বিস্কুট নিয়ে ফিরে এল। তারপরে গামছা দিয়ে মুখের ঘামটা মুছতে যতটুকু সময়, আবার ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল! কোথায় যায়, কি করে, হদিস পাই না। কিন্তু যখনই বেরিয়ে যায়, কদাচিৎ খালিহাতে ফেরে।

শুধু বাবা নয়, প্ল্যাটফর্মের আরও অনেকেই।

সরকারী সাহায্য আছে। তার ওপর বাবার সংগ্রহ। দুয়ে মিলে মোটামুটি খাওয়া-পরার দুঃখ দূর হল

এই সময় অঞ্জনার সঙ্গে পরিচয় হল।

অঞ্জনার দিকে চেয়ে রঞ্জনা হাসলে।

ছিপছিপে মেয়ে, ছুটোছুটি করে, সম্ভ্রমের সঙ্গে ওর দিকে চেয়ে থাকতাম। সবাই ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ব্যস্ত। আমারও খুব লোভ হত, কিন্তু সাহস হত না। মুগ্ধদৃষ্টিতে শুধু চেয়ে থাকতাম।

রঞ্জনা আবার অঞ্জনার দিকে চেয়ে হাসলে।

একদিন নিজে থেকেই আমার কাছে এল।

—তোমার নাম কি ভাই ?

কৃতার্থ হয়ে গেলাম। নাম বললাম।

—তোমার দেশ কোথায় ?

বললাম।

কালুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ওটি তোমার ভাই ?

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

—পাগল বুঝি ?

আমি জবাব দেবার আগেই একটি বুড়ী পাশ থেকে সহানুভূতির সঙ্গে বললে, না পাগল নয়। মাথাটা একটু খারাপ হয়েছে।

অঞ্জনা হাসলে।

ভারী মিষ্টি হাসি। খুব ভালো লাগল।

অঞ্জনা জিগ্যেস করলে, পড়াশুনো করেছ ?

—ক্লাস এইট পর্যন্ত।

—বাঃ! বেশ তো!

চারিদিকের ভিড়ের দিকে চেয়ে অঞ্জনা বললে, এই যে প্ল্যাটফর্ম দেখছ, এটা কিন্তু প্ল্যাটফর্ম নয়।

—তবে ?

—আমাদের অত বড় যে পূর্ববঙ্গ, ছোট হয়ে এইটুকুনির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

ওর কথার মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বললে, হ্যাঁ। এই তো পূর্ববঙ্গ। এর মধ্যে সব জেলার লোক আছে। আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি। চাটগাঁ থেকে খুলনা পর্যন্ত।

অঞ্জনা হাসলে।

এতক্ষণে কথাটা বুঝতে পারলাম।

বললাম, কিন্তু সেই পূর্ববঙ্গ নয়। সেখানে কত সুখ, আর এখানে কত দুঃখ!

অঞ্জনা বললে, বলতে পার সেটা সুখী পূর্ববঙ্গ আর এটা দুঃখী পূর্ববঙ্গ। কিন্তু দুটোই পূর্ববঙ্গ।

—তাই।

পাশের বুড়ীটি কাঁথা সেলাই করতে করতে আমাদের কথা শুনছিল। বললে, আমাদের বরশালে কত চাউল। অতিথ-ফকিরকে বিলিয়ে দিতাম। এখানে নিজেরাই ভাত পাই না খেতে।

অঞ্জনা বললে, বুড়ীটা তারপরে একদিন মরে গেল।

মজুমদার জিগ্যেস করলেন, ওই প্ল্যাটফর্মেই?

অঞ্জনা বললে, হ্যাঁ। সে কি দৃশ্য দারোগাবাবু! তিন দিন জ্বরে ভুগল। না ডাক্তার, না পথ্যি। তারপরে একদিন চোখ উলটে শক্ত হয়ে গেল। আর নড়ল না।

রঞ্জনা বললে, জানেন দারোগাবাবু, যখন মরল তখন ওরা খেতে বসেছে। সবাই বললে, যাঃ! বুড়ী মরে গেল। ওরা কিন্তু তা মানতে চাইছে না। বলছে, না অহন দেরি আছে। বলছে আর ভাতগুলো গব গব করে গিলে যাচ্ছে।

অঞ্জনা বললে, ভাত শেষ করে সবাই কলে গেল থালাবাসন, হাত-মুখ ধুতে। ধুয়ে এসে বুড়ীর গায়ে হাত দিয়ে দেখলে গা বরফের মতো ঠাণ্ডা। তখন সবাই কাঁদতে বসল।

মজুমদার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভাতের দুঃখ!

রঞ্জনা বলতে লাগল:

শোনা গেল সরকার উদ্বাস্তুদের ঋণ দিচ্ছে বাড়ি তৈরি করবার জন্যে। বাবা তাই নিয়ে সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি করছে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে।

বাড়ি একখানা চাই। তার সঙ্গে একটুখানি জায়গা যেখানে সবজি লাগান যায়। নীচু জায়গা হলে পাঁচজনে মিলে একটা পুকুর খুঁড়ে মাটি ভরাট করতে হবে। তখন পুকুরটায় মাছও লাগান যেতে পারে।

এই বে-আব্রু স্টেশন প্ল্যাটফর্মে মানুষ থাকতে পারে না। এই ক'মাসেই তারা যেন কি রকম হয়ে গেছে। সমাজে মানুষ যেমন করে থাকে এখানে তার একেবারে উলটো। এইভাবে আরও কিছুকাল থাকতে হলে আমরা আর মানুষ থাকব না। এই কথা প্রবীণেরা সব সময়েই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে ঘর বাঁধতে হবে, সমাজ বাঁধতে হবে। সরকারী ঋণে সেই সুযোগ যদি পাওয়া যায়, তাহলে আবার তারা ঘর বাঁধবে, ফসল ফলাবে। তাঁতী তাঁত বুনবে, কামার লোহা পিটবে, কুমোর হাঁড়ি তৈরি করবে। পূর্ববঙ্গ গেছে যাক, পশ্চিমবঙ্গকেই তারা সবাই মিলে বড় করার কাজে লেগে যাবে।

বাবা বলত, এ তো বিদেশ নয়। একই বাংলা, পূর্ব আর পশ্চিম। একই আচার-ব্যবহার, কই ধর্ম। আজ ইস্টিশেনের প্ল্যাটফর্মে আছি বলেই না। ঘর বানালেই আবার মানুষ হয়ে যাব।

বাবা সেই স্বপ্ন দেখে। সবাই সেই স্বপ্ন দেখে।

প্ল্যাটফর্মের রেলিঙে ঠেস দিয়ে আমি আর অঞ্জনা গল্প করছি। একটা করে ট্রেন আসছে আর হাজার হাজার লোক নামছে আর হুড়হুড় করে স্রোতের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে। আবার হুড়হুড় করে লোক আসছে ট্রেন ধরবার জন্যে।

তারই মধ্যে আমরা আছি। এক জায়গায় স্থির হয়ে।

অঞ্জনা বললে, দেখ, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমরাও মুসাফির। কোথাও যাব, ট্রেনের অপেক্ষা করছি।

—কিন্তু কোথাও যাই না।

অঞ্জনা হাসলেঃ না। শুধু একটা যাব-যাব ভাব। ঘর বেঁধে স্থির হয়ে থেকে যাওয়ার চেয়ে এইটে আমার ভালো লাগে। সব সময় ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছি। ট্রেন এলেই চলে যাব।

—কিন্তু ট্রেন আর আসছে না।

—ট্রেন এলেই তো যাব-যাব ভাবটা শেষ হয়ে গেল। ট্রেন কোনদিন আসবে না, জানিস ?

আমি তো ভয়ে শিউরে উঠলামঃ বলিস কি! চির-জীবন এইখানে থাকতে হবে ?

—হ্যাঁ।

—এইখানে ? যেখানে কোনো আব্রু নেই ?

—আব্রু আবার কি ? আমাদের কেউ মানুষ বলে মনে করে না। আমরাও কাউকে মানুষ বলে মনে করব না। ফুরিয়ে গেল ল্যাঠা।

অঞ্জনার চোখ কি রকম চকচক করে উঠল। দেখে ভয় হল।

বললে, জন্তুদের আব্রু আছে ?

—না।

—আমরা জন্তু। ওরা আমাদের জন্তু করে রেখেছে। আমাদের আব্রুর দরকার নেই।

অঞ্জনার চোখে আবার সেই ভয়ংকর দৃষ্টি!

বললে, তোরা কি তখন এসেছিলি যখন ওইখানে একটি বৌএর ছেলে হল ?

—না। আমরা এসে কারও ছেলে হওয়া দেখিনি।

বললে, আহা! কচি বৌ, সতেরো আঠারোর বেশী বয়স হবে না। দুপুরে তার প্রসব-বেদনা উঠল। প্ল্যাটফর্মসুদ্ধ সবাই চঞ্চল

হয়ে উঠল : কি করা যায়, কি করা যায়! আমরা তখন দু'দিন হল এসেছি। এখানকার হালচাল কিছুই জানি না। একজন যাত্রী বললে, অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দাও। তারা কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

—তারপর?

—তাই করা হল। অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি এসে নিয়ে গেল বৌটিকে। তার স্বামী এবং আরও কে যেন সঙ্গে গেল। তখন দুটো।

—তারপর?

—চারটেয় গাড়ি ফিরে এল। হাসপাতালে কোথাও জায়গা নেই। কেউ নিতে রাজী হল না।

অঞ্জনা তার নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলে।

—তারপর?

—এই প্ল্যাটফর্মেই ছেলে হল।

—খোলা জায়গায়?

—ঘর আর কোথায় পাওয়া যাবে? দু'চারখানা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে একটা ঘের করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়।

আমি তো অবাক!

অঞ্জনা বললে, বৌটির কি লজ্জা! চারিদিকে গিজ-গিজ করছে লোকের ভিড়। কত কথা, কত আলোচনা, কত মন্তব্য! বৌটি লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেলেছে। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে, তারই মধ্যে সমাজ-জীবনের লজ্জাও রয়েছে! সে কি সহজে যায়! লজ্জা গেল রাত দুটোয়।

—কি করে?

—মা আর ছেলে কেউ বাঁচল না। বাঁচল না নয়, মরেই বরং বাঁচল।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

স্টেশনের সমস্ত আলো হঠাৎ একসঙ্গে জ্বলে উঠল।

অঞ্জনার দিকে চেয়ে :মনে হল, তার দেহটা রেলিঙে ঠেস দিয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু সে যেন ওখানে নেই। ওর দৃষ্টি আলোর দিকে বাঁধা। চোখে ওর আলোর আভা পড়েছে না ভিতরের জ্বালা বোঝা গেল না।

ডাকলাম, অঞ্জনা!

সাড়া পেলাম না।

গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলাম, অঞ্জনা!

প্ল্যাটফর্মের আলো থেকে ওর দৃষ্টি আমার মুখের উপর পড়ল। ঠোঁটে একটা আশ্চর্য হাসি।

ভয় করছিল। বললাম, চল্ ঘরে যাই।

—ঘর?

এবারে অঞ্জনা খিলখিল করে হেসে উঠল : ঘর! ঘর আবার কোথায়?

—ওই যেখানে আমরা আছি।

—ওটা ঘর নয়, মুসাফিরখানাও নয়।

—তবে?

—খাটাল বলতে পারিস। দুটো জাবনা খাই আর নোংরামির মধ্যে গড়াগড়ি দিই। ওখানে যত কম থাকা যায় ততই ভালো। আমার কি মনে হয় জানিস?

—কি?

—একটা ডিনামাইট দিয়ে স্টেশনটাকে উড়িয়ে দিই।

আমি হেসে উঠলাম : দিয়ে থাকব কোথায়?

—থাকব না। এই নরককুণ্ডের সঙ্গে আমরাও শেষ হয়ে যাব। বেঁচে যাব।

অঞ্জনা হেসে উঠল।

যেমন ভয়ংকর হাসি তেমনি ভয়ংকর দৃষ্টি!

এই সময় খঞ্জনার সঙ্গেও ভাব হল। আমরাই ওকে খুঁজে বার করলাম। ও বেচারা অত্যন্ত লাজুক। কারও সঙ্গেই বড় একটা মিলত না। আমরা ওকে না টানলে ও নিজে থেকে আমাদের সঙ্গে ভাব করত কি না সন্দেহ।

আমরা তিনটিতে একজোট।

নিজের নিজের কাজ সারা হলেই আমরা একত্র হতাম। কোনো একটা নিরিবিলি কোণ বেছে নিয়ে আমরা মনের খেয়ালে গল্প করতাম। দেখতে দেখতে ভাব এমন জমে উঠল যে, একজন অন্য দুজনকে কিছুক্ষণ না দেখলে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠতাম।

অঞ্জনা বললে, কি আশ্চর্য দেখ্। আমরা তিনজন তিন জেলার লোক। এক জাতও নই। কোনোদিন কারও সঙ্গে কারও দেখা হবার কথাও নয়। বলতে গেলে, ঘটনাচক্রে এই মুসাফিরখানায় মিলে গেছি। ক'মাসই বা হল। এরই মধ্যে এমন হয়েছে যে, কিছুক্ষণ দেখা না হলে অস্থির হয়ে উঠি!

সত্যি।

আমরা সবাই হাসতে লাগলাম।

আমি বললাম, স্টেশনের ওযেটিংরুমে আমরা তিনজনে নিজের নিজের গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছি। এক একজনের গাড়ি আসবে আর চলে যাবে। কে কোথায় তার ঠিকানা নেই। তারপরে কারও কথা কি কারও মনে থাকবে?

খঞ্জনা বললে, আমার একবার ওরকম হয়েছিল। ট্রেনে সমবয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খুব ভাব। দুজনার ঠিকানা নিয়েছিলাম। কিছুদিন চিঠিপত্রও চলেছিল। তারপরে সব বন্ধ।

খঞ্জনা হাসতে লাগল।

—কি তার নাম?—জিগ্যেস করলাম।

—রমা। কিশোরগঞ্জের মেয়ে। এখন কোথায় আছে কে জানে! হয়তো আমাদের মতোই অন্য কোথাও ভাসছে।

খঞ্জনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

অঞ্জনা বললে, খঞ্জনার কথা জানি না। বিয়ে করে ও তো স্বামীর ঘর করতে চলে যাবে। কিন্তু আমরা তুজনে চিরকাল যেন এক জায়গায় কাটাতে পারি।

খঞ্জনা বললে, আহা! আর তোদের বুঝি বিয়ে হবে না?

বললাম, আমাদের আর কে বিয়ে করছে বল্?

—কত লোক আছে।

অঞ্জনা হেসে বললে, লোক অনেক আছে সত্যি। আমাদেরও চাইবে। কিন্তু বিয়ে করতে নয়।

—তবে?—বলেই খঞ্জনার গাল লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বললে,—যাঃ!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অঞ্জনা বললে, তাই রে! কি যেন সিনেমায় দেখেছিলাম, হাঙ্গরে মুক্তো পাহারা দিচ্ছে। আমাদেরও চারপাশে হাঙ্গর ঘুরছে। পাহারা দেবার জন্যে নয়, খাবার জন্যে।

খঞ্জনা শিউরে উঠল: সত্যি?

—সত্যি না তো কি। টের পাসনি?

—কিছু কিছু পাচ্ছি যেন।

—হ্যাঁ। আমাদের যে মূল্য ওরা দেয়, সে এই দেহটার। ওদের হাত থেকে আমরা সহজে পরিত্রাণ পাব না। হয় ওরা আমাদের মারবে, নয় আমরা ওদের মারব, নয় উভয়েই মরব।

অঞ্জনার চোখ আবার তেমনি জ্বলে উঠল।

শুধু ওরা নয় কিছুদিন থেকে আমারও বুকের মধ্যে কি একটা বাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে ঠেলে ঠেলে উঠছিল। কি যেন একটা অনিশ্চিত ভয়, কি যেন একটা অস্থিরতা, একটা আক্রোশ। তা যেন বুকের ভিতরটা কুরে কুরে খাচ্ছিল।

সব সময় যেন একটা আগুন জ্বলছিল বুকের ভিতর। নীল আগুন। বিষে ভরা।

সাপের দাঁতে বিষ জমে। কার বিরুদ্ধে তা সাপ জানে না। এইটে জানে যে, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এই বিষ তাকে কোথাও ঢালতেই হবে। তা সে যেখানেই হোক।

আমার যেন তাই হল।

বিষ জমছে। নীল বিষের আগুন জ্বলছে। কাকে পোড়াবে জানি না। কিন্তু সমস্ত বাইরেটার ওপরই একটা সন্দেহ আসতে লাগল। আক্রোশ জমতে লাগল।

এই রকম সময় আমাদের গ্রামের একটি ছেলেকে বাবা একদিন ধরে নিয়ে এল।

ছেলেটিকে দেখেছি। ওরা কলকাতাতেই থাকে। তু'পুরুষ রয়েছে। পূজোর সময় একবার করে দেশে যেত। তখনই দেখেছি। কয়েকবারই। চাটুয্যে বাড়ির সুনীল।

সে অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে, আপনারা এখনও এখানে আছেন ?

—যামু কই ?

—কেন, সরকারী ঋণ পাননি ?

—না।

—আমরা তো পেয়ে গেছি।

—সে কি ! তোমরা তো উদ্বাস্তু নও। কি করে পেলে ?

ছেলেটি মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

বাবা তার তুটি হাত ধরে বললে, বাবা, আমাদের কিছু পাইয়ে দাও না। বড় তুঃখেই আছি।

বাবার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

তুঃখে যে আছি ছেলেটি নিজের চোখেই তো দেখছে। একখানা ইটের ঘের-দেওয়া এই অট্টালিকা। তার মধ্যে কালু একমনে বসে

জাল বুনছে। অস্থিচর্মসার মা শতচ্ছিন্ন একখানা কাপড় পরে, একটা থামের দিকে মুখ করে পিছন ফিরে বসে। অন্য পাশে কতকগুলো শূন্য হাঁড়িকুঁড়ি সাজান।

দুঃখের এর চেয়ে বেশি আর কি পরিচয় থাকতে পারে?

বললে, আমি তো ঠিক জানি না, বাবা জানেন।

বাবা বললে, তোমাদের বাড়ির ঠিকানাটা দাও। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তিনি আমাকে ভালো করেই চেনেন।

নানারকম ওজর-আপত্তি করে শেষ পর্যন্ত একটা ঠিকানা সে দিলে। পরে দেখা গেল ঠিকানাটা ভুল। ও-ঠিকানায় ওরা থাকে না।

নিজের গাঁয়ের ছেলে, সেও প্রবঞ্চনা করলে।

কেন, কে জানে। প্ল্যাটফর্মে থাকতে তাকে আর কোনোদিন দেখতে পাইনি।

॥ দুই ॥

কথাটা একদিন অঞ্জনা-খঞ্জনাকে বললাম। গ্রামের ছেলের এই প্রবঞ্চনার কথা।

অঞ্জনা বললে, গ্রাম কোথায় যে ওদের তুই গ্রামের ছেলে বলছিস? এখন ওরাও সে গাঁয়ের নয়, তোরাও সে গাঁয়ের নস। পুজোর ছুটিতে আর কখনও দেখাও হবে না।

কথাটা হয়তো সত্যি। কিন্তু তবু আমার মন মানতে চাইছিল না। আমার নিজের কথা বলতে পারি, গাঁ ছেড়ে আসার পরে যেন গাঁয়ের উপর আরও টান বেড়েছে।

বললাম, আমার কিন্তু ঠিক উলটো। গাঁয়ের কথা এখনও আমি ভুলতে পারি না। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, বাবা যেন আমতলার ছায়ায় বসে একমনে জাল বুনে চলেছে। দুপুর রোদে তেঁতুলতলায়

ছায়ায় বসে আমাদের বুধি গাইটা জাবর কাটছে। আমাদের নদীর ধার, আমের বাগান সব যেন চোখের সামনে ভাসে।

অঞ্জনা হেসে বললে, আর ক'দিন পরে ভাসবে না।

মাথা নেড়ে বললাম, আমাদের গাঁকে কখনই আমি ভুলব না।

—ভুলবি। আর ক'দিন যাক না।

—তুই ভুলতে পেরেছিস ?

—কবে। গাঁয়ের কথা ভাবতে গেলে শিউরে উঠি। কোনোদিন গাঁয়ের সম্বন্ধে যদি স্বপ্ন দেখি, ভয়ে চীৎকার করে উঠি।

কি আশ্চর্য !

অঞ্জনা বললে, তোর গাঁয়ের লোক নিজের জন্যে ঋণ যোগাড় করেছে। অথচ তারা ঠিক উদ্বাস্তু নয়। তদ্বিরের জোর আছে পেয়ে গেল। কিন্তু তোদের জন্যে চেষ্টা করলে না। অথচ এরাই একদিন গাঁয়ের ছেলেকে বাড়িতে রেখে তার চাকরি যোগাড় করে দিয়েছে।

—দিয়েছে বইকি ! ওই সুনীলের বাবাই প্রতিবছর পুজোয় দেশে গিয়ে একটি-দুটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে চাকরি করে দিয়েছেন। আমারই চোখে দেখা।

—কিন্তু আজ আর দি'চ্ছ না। পাছে তোর বাবা গিয়ে উৎপাত করে বলে ভুল ঠিকানা দিয়ে গেল।

—হ্যাঁ।

—কেন এমন হয় ?

—তুই বল।

—হয়, গাঁয়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে। গাঁয়ের লোকের ওপর আর দরদ নেই। নয়, নিজের জন্যেই এত তদ্বির করতে হচ্ছে যে, অন্যের জন্যে তদ্বির করার ফুরসুত নেই।

হর্তে পারে।

অঞ্জনা বললে, তোর বাবা খুব ঘোরাঘুরি করছে ঋণের জন্যে। কিন্তু পাবে না।

—কেন? সরকার ঋণ তো দিচ্ছে।

—দিচ্ছে, কিন্তু পাচ্ছে অন্য লোকে। আসল উদ্বাস্তুরা নয়। এমনিই হবে।

—কেন হবে?

—কারণ যাদের ওপর ভার, তারা আমাদের চেয়ে নিজেদের দুঃখ দূর করবার জন্যেই বেশি ব্যস্ত।

অঞ্জনা হাসতে লাগল।

বললে, কাল আমার কাছে একটি লোক এসেছিল। বললে, হাজার দুই টাকা ঋণ আমাকে পাইয়ে দিতে পারে।

শুনে আমার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। বললাম, তারপরে?

—বললে, বাবা গেলে হবে না।

—তবে?

—আমাকে যেতে হবে।

বলে অন্য দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। সে হাসির অর্থ বুঝলাম, কিন্তু একটু দেরি হল।

জিগ্যেস করলাম, তুই কি করবি?

অন্যমনস্কভাবে অঞ্জনা বললে, তাকে যাব না বলে ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন দেখছি যেতেই হবে। এই নরককুণ্ডে আর কতদিন থাকব?

অঞ্জনা সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরকম ছিল। ওর কথায় আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম, যাবি?

—উপায় কি!

আমি রেগে গেলাম: কেন, বিষ খাওয়ারও কি উপায় নেই, কি ট্রেনের তলায় কাটা পড়ার?

—কেন, কি দুঃখে আত্মহত্যা করব? কেন আমরা বাঁচতে পাব না?

অঞ্জনার চোখ জ্বলছে।

বললে, না। আমি মরব না। আমি মরতে চাই না। যদি মরি, শাস্তি দিয়ে মরব। আমি যাব।

এর ক'দিন পরে দেখি অঞ্জনার ভোল ফিরে গেছে। তার পরনে চমৎকার একখানা রঙীন শাড়ি। গায়ে সুন্দর ব্লাউস। পায়ে স্যাণ্ডাল।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

অঞ্জনা বললে, ঋণ পেয়েছি। দু'হাজার টাকা।

—পেয়ে গেছিস?

—না, এখনও ঠিক হাতে আসেনি। হপ্তাখানেকের মধ্যে আসবে। কাল গিয়ে ফর্মে সই করে এসেছি।

অঞ্জনা হাসতে লাগল। অদ্ভুত হাসি। বাঁকা ছুরির মতো ঝক্‌ঝকে।

বললাম, এবারে তো তোরা চলে যাবি নিশ্চয়?

তার আর কথা! দাদা গেছে জায়গা দেখতে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। একটা বুড়ার জায়গা জবর-দখল করা হয়েছে। সেই-খানে চেষ্টা করতে।

অঞ্জনা চলে যাবে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

বললাম, বাবা আজকেও গেছে ওদের আপিসে ঋণের চেষ্টায়। দেখি কি হয়।

—কিছুই হবে না। ঋণ পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু তোর বাবা পাবে না। তুই গেলে পাবি।

বলে একটা পাক দিয়ে চলে গেল।

বাবা সকল সময়ই ব্যস্ত।

দেশে থাকতে যে মানুষ সকল সময় বসে বসে জাল বুনত, সেই

মানুষের মধ্যে এত ব্যস্ততা, চলাফেরার এত উত্তম কি করে এল ভেবে আমাদের বাড়ির সবাই অবাক হতাম।

আর সে একেবারে নিষ্ফল ব্যস্ততাও নয়। যখনই ফিরত, হাতে কিছু-না-কিছু থাকত। হয় লজেন্স, নয় বিস্কুট, নয় মুড়ি-মুড়কি, নয়তো বা তেলেভাজা কিছু। কিন্তু কিভাবে এগুলো উপার্জন করে কিছু বুঝতে পারতাম না।

অঞ্জনাদের যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে।

একদিন বললে, চল্ একটু বেড়িয়ে আসি। আর ক'দিনই বা আছি!

জিগ্যেস করলাম, কোথায় যাবি?

—যেদিকে হোক। কয়েকটা জিনিসও কিনব, একটু বেড়ানও হবে।

বেশ।

আমি, অঞ্জনা আর খঞ্জনা।

অঞ্জনার মন খুব খুশি-খুশি। এই নরককুণ্ড থেকে নিস্তার পাওয়ার আনন্দ। আমাদের দুজনের মন ভারী। অঞ্জনাকে ছাড়তে হবে সেই দুঃখে।

আমরা জানতাম অঞ্জনা ভালো মেয়ে নয়। ওর সব কথা আমাদের ভালো লাগত না। কিন্তু তবু ওর মধ্যে কি যেন একটা আকর্ষণও ছিল, যার টান আমরা এড়াতে পারতাম না।

সে ওর মন।

ওর মনের মধ্যে কোথায় একটা উঁচু পর্দা ছিল। ওর হালকা চলাফেরা এবং কথাবার্তার চেয়ে উঁচুতে। তার জন্যে ওকে আমরা ভালোবাসতাম। তাই ওর. চলে যাবার কথা ভেবে আমাদের মন ভারী হয়ে উঠেছিল।

চলতে চলতে জিগ্যেস করলাম, যেখানেই যাস, মাঝে মাঝে আসবি তো?

—চেষ্টা করব।

—আমাদের ভুলে যাবি না তো ?

অঞ্জনা অম্লানবদনে উত্তর দিলে, তাই বা কি করে বলব ? কোথায় গিয়ে পড়ব, কাদের মধ্যে, জানি না তো।

খঞ্জনা বললে, তুই ওকে চিনিস না রঞ্জনা। ও নতুন জায়গায় যাবে কি আমাদের ভুলে যাবে। ও ওইরকমের মেয়ে।

অঞ্জনা প্রতিবাদ করলে না। বললে, সত্যি। আমি ওইরকমেরই। আমি কিছুই নিজের সঙ্গে জড়িয়ে রাখি না। ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে দি। আমি হালকা থাকতে ভালোবাসি।

অঞ্জনা হাসলে। বললে, তবু মনে হয় তোদের ভুলব না সময় পেলেই এখানে আসব।

আমরা এলোমেলো চলছিলাম। লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে ধর্মতলার মোড়। সেখান থেকে চলেছি ধর্মতলা দিয়ে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে।

সেখান থেকে একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে অঞ্জনা বললে আয়, কিছু খাওয়া যাক।

খাওয়া !

আমরা আকাশ থেকে পড়লাম। দু'বেলা দুটো ফেনভাত, এই আমরা খাই। যেদিন দুটো আলু, কি একটা পটল পাই, সেদিন তো রাজভোগ।

অঞ্জনা কি ঠাট্টা করছে ?

না, ঠাট্টা করেনি। আমাদের দুজনের দু'হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল।

চারদিকে চারখানা চেয়ার, মাঝে একটা মার্বল পাথরের টেবিল।

বুকের ভিতরটা কি রকম করছিল।

চপ এল, কাটলেট এল, চা এল। খাওয়া শেষে হাতের ছোট ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে অঞ্জনা বিল মিটিয়ে দিলে।

বাইরে এসে দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তার আলোগুলো

জ্বলছে। দোকানগুলো আলোয় ঝলমল করছে। শেয়ালদা স্টেশনের বদ্ধ খোঁয়াড় নয়। কলকাতার রাজপথ। দুই ফুটপাথ ধরে কত রংবেরঙের শাড়ি পরে মেয়েরা চলেছে।

মুহূর্তের মধ্যে শেয়ালদা স্টেশনের কথা ভুলে গেলাম। মনে হল, কোনোদিন সেখানে ছিলাম না। এই রাজপথ, এইখানেই চিরকাল থেকেছি, ঘুরেছি, ফিরেছি।

অঞ্জনা বললে, ট্রামে যাবি?

—ট্রামে?—একটা ঢোঁক গিললাম,—পয়সা আছে তো?

অঞ্জনা হাসলে: পয়সা? কত পয়সা চাস? কলকাতার পথে পয়সা ছড়ানো রয়েছে। কুড়িয়ে নিতে পারলেই হল।

অবাক হয়ে ওর দিকে চাইলাম। অঞ্জনা বলে কি! ওকি পরশ-পাথর পেয়েছে?

খঞ্জনা বললে, এত শিগগির ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

অঞ্জনা বললে, পার্কে বসবি?

—তাই চল।

তিনজনে পার্কের একটি অন্ধকার কোণে এসে বসলাম। প্রশস্ত পার্কে কত লোক যে গুচ্ছে গুচ্ছে বসে আছে তার ইয়ত্তা নেই। তারা আমাদের মতো উদ্বাস্তু নয়। গেরস্তঘরের ছেলে মেয়ে। সমস্ত দিনের খাটাখাটুনির পর পার্কের খোলা হাওয়ায় একটু বিশ্রাম করতে এসেছে।

অবাক হয়ে তাদের দিকে চাইছি, তাদের টুকরো টুকরো কথা শোনবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ পিছনে শুনলাম, একটি পয়সা দেবেন মা? সারাদিন খাওয়া হয়নি।

পিছনে চেয়ে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলাম।

বাবা!

আমাদের দেখে বাবাও থতমত খেয়ে গিয়েছে: তোরা এখানে কি করছিস? কি আশ্চর্য!

বলেই পোঁ পোঁ করে পালিয়ে কোথায় [redacted] হয়ে গেল।

আমরাও কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে। কারও মুখের দিকে চাইবার শক্তি আমার নেই।

সেদিন আর কোনো কথা নয়।

পরদিন একসময় নিরিবিলি বাবাকে জিগ্যেস করলাম, বাবা, তুমি সারাদিন ভিক্ষে করে বেড়াও?

লজ্জিত মুখে বাবা বললে, করি মা। আর কি করতে পারি বল। এখানে পুকুরও নেই, জালও নেই যে দুটো মাছ ধরে আনব। সজনে গাছ থেকে দুটো ডাঁটা পেড়ে আনলাম, কি ক্ষেতের থেকে দুটো তরকারি। কেউ আমাকে কাজও দেবে না।

—তাই বলে ভিক্ষে?

—হ্যাঁ, ভিক্ষে। দেখ্, ঘর তো একটা বানাতে হবে। মাথা গোঁজার একটা আস্তানা। সেইটে হয়ে গেলে আর ভাবি না। তখন সব হবে। চাই কি একটা দুধের গাই পর্যন্ত।

বাবার চোখ ছলছল করে

—কিছু তো করা চাই মা বসে থাকলেও তো কিছুই হবে না। তাই ভিক্ষেই করি।

মন স্থির করে ফেললাম।

চুপি চুপি অঞ্জনাকে ডেকে জিগ্যেস করলাম, আমি গেলে ঋণ সত্যি সত্যিই পাওয়া যাবে?

—আলবৎ যাবে।

—তাহলে তুই ব্যবস্থা কর। আমি যাব।

—তুই যাবি?

অঞ্জনা লাফিয়ে উঠল।

বললাম, যাব। অনেক দুঃখেই যাব। বাবা ভিক্ষে করছে সন্ধ্যের অন্ধকারে। তার চেয়ে যাওয়াই কি ভালো নয়?

—নিশ্চয় ভালো।

অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে ভাবতেই উত্তর দিলে অঞ্জনা। হঠাৎ সে খিলখিল করে হেসে ফেললে। সেই ভয়ংকর হাসি। আমার বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করে উঠল।

—হাসছিস যে?

—হাসছি। হাসবার সময় এসেছে বলেই হাসছি।

—সে আবার কি! তুই এমন করে মাঝে মাঝে হেসে উঠিস যে আমার বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।

—ওঠবারই কথা। আমারও বুকের ভিতরটা যখন কি রকম করে, তখন অমনি করে হেসে উঠি। কি হয় জানিস? হঠাৎ এক এক সময় ভাবনা আসে, বাংলাদেশের মেয়েরা যাচ্ছে কোথায়? যেই ভাবি, অমনি বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। তখনই অমনি হাসি আসে।

অঞ্জনা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

বললে, খঞ্জনার কথা ছেড়ে দে, ওর বর তৈরী। একদিন বিয়ে হয়ে যাবে। ঘর-সংসার করবে। কিন্তু তুমি আমি,—যদি দেশটা এমনি করে ভাগ না হত, তাহলে আমাদেরও বিয়ে হত। হয়তো কার্তিকের মতো পাত্র হত না, কিন্তু ঘর একটা পেতাম। সংসারের কাজকর্ম, রান্নাবাড়া, ছেলেমেয়ের কাঁথা সেলাই, এই নিয়ে দিনটা কাটত। সন্ধ্যেবেলায় নদীর ঘাট থেকে চান করে এসে তুলসী-তলায় প্রদীপ রেখে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করতাম। সুখে-দুঃখে জীবনটা কাটত।

—তা কাটত।

—কিন্তু আর তা কাটবে না। আমরা চলেছি ভিন্ন পথে।

নিজের ইচ্ছেয় নয়। একটা নিঠুর নিয়তি গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে ওই পথে।

—সে পথটা কোথায় শেষ হবে?

—জাহান্নামের দোরগোড়ায়।

অঞ্জনার চোখটা আবার তেমনি জ্বলে উঠল।

বললে, কিন্তু সান্ত্বনা কোথায় জানিস?

—কোথায়?

—যে বাংলাদেশ কখনও লোভ দেখিয়ে টেনে, কিংবা পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে আমাদের এই পথে নামালে, জাহান্নামের দোরগোড়ায় এসে পিছনে চেয়ে দেখব, সেই বাংলাদেশ আমাদের পিছনেই।

অঞ্জনা আবার তার সেই ভয়ংকর হাসি হেসে উঠল।

বললাম, অমন করে হাসিসনি।

—তো কি করব? কাঁদব? কি জানিস, কান্না আমার আসে না। চোখের সামনে ছোট ভাইটা শুকিয়ে শুকিয়ে মারা গেল। তোরা দেখিসনি। তোরা তখনও আসিসনি। মা কাঁদল, আমরা সবাই কাঁদলাম, বাবারও চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল পড়ল। তারপরে বাবাও একদিন হঠাৎ চলে গেল! ওই থামটায় ঠেস দিয়ে আপনমনে তামাক খাচ্ছিল। হুঁকোয় শব্দ উঠছিল ভুরুক ভুরুক। হঠাৎ হুঁকোর শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ে দেখি বাবার মাথাটা ঝুলে পড়েছে।

—সব শেষ?

—হ্যাঁ। তারপর থেকে আর কান্না আসে না। আমারও না, মায়েরও না। বুঝেছি কেঁদে লাভ নেই। কেঁদে ঘটনার স্রোত ফিরবে না। ফিরবে?

সাড়া দিলাম না।

অঞ্জনা বললে, আমরা এতদিন যা দেখে এসেছি, করে এসেছি,

বুঝে এসেছি, একটা ধাক্কায় সব উলটে গেল। ছেলেবেলায় আমাদের পাঠশালার গোবিন্দ পণ্ডিত বলত, লেখ। আমাদেরও আবার পুরোনো পাঠ মুছে নতুন পাঠ লিখতে হচ্ছে!

অঞ্জনা হাসলে: মুছেই লেখা যাক। দেখা যাক কি দাঁড়ায়।

আপনমনেই অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে; সন্ধের পর ফিরে মায়ের হাতে টাকা দিই। মা হাত পেতে নেয়। জিগ্যেস করে না, টাকাটা পেলাম কোথায়? নতুন পাঠ। বাবা থাকলে বাবাও হয়তো একমনে হুঁকো টেনে যেত। একটা কথাও জিগ্যেস করত না। টাকা টাকা। যেখান থেকেই পাওয়া যাক, তার দাম কমবে না। না কি বল্?

চুপ করে রইলাম।

ওদিকে চেয়ে দেখি, ছোট ভাইটি জাল বুনছে। বাবা কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে তার মুখে কি যেন একটা গুঁজে দিলে। বোধ হয় লজেন্স। কিন্তু কালুর ভ্রূক্ষেপও নেই। এই ক'মাসে যত জাল সে বুনলে তাতে গোটা পৃথিবীটাকেই জড়িয়ে ফেলা যেত। সে ফিরেও চাইল না বাবার দিকে। মুখ লজেন্স চোষে, আর হাত অনর্গল জাল বুনে যায়।

বাবা তার দিকে চেয়ে হাসলে। তারপরেই মায়ের হাতে কি যেন গুঁজে দিয়ে (বোধ হয় পয়সা) আবার যেমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছিল তেমনিভাবে বেরিয়ে গেল।

বাবার বিশ্রাম নেই। তার ধারণা পথে পথে দুটো চারটে পয়সা ভিক্ষে করেই ঘর হবে, বাড়ি হবে, পুকুর হবে, গোয়াল হবে, ক্ষেতখামার সবই হবে!

—কি ভাবছিস?—অঞ্জনা জিগ্যেস করলে।

—কিছুই না। আমি যাব। কবে নিয়ে যাচ্ছিস বল।

—সত্যি যাবি?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে। কাল খবর দোব।

অঞ্জনা চলে গেল।

সঙ্গে অঞ্জনা যায়নি। গিয়েছিল আর একটি ছেলে। অঞ্জনার চেনা। বোধ হয় সেই ছেলেটি যে অঞ্জনাকেও নিয়ে গিয়েছিল। ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে হয় ওই আপিসেই চাকরি করে। আপিসে কি কাজ করে জানি না। কিন্তু যুবতী মেয়েদের নিয়ে যাওয়া এবং ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া এইটেই তার বড় কাজ। ট্যাক্সি করে নিয়ে যাওয়া আর নিয়ে আসা।

ওখান থেকে ফিরে সরাসরি বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করছিল। কি যে করি ভাবছিলাম। সামনেই অঞ্জনা। আমাকে টানতে টানতে অন্য দিকে নিয়ে গেল।

বললে, আমি তোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম রঞ্জনা। ঋণের ব্যবস্থা হল ?

আমি তাকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলাম।

অঞ্জনা একটাও সান্ত্বনার কথা আমাকে বললে না। শুধু কান্নায় আমি ভেঙে পড়েছি দেখে আরও দূরের দিকে টেনে নিয়ে গেল। নির্জন একটা কোণে। যেখানে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। সেখানে ঘাসের উপর দুজনে বসলাম।

আমি কিছুটা শান্ত হতে বললে, ঋণের ব্যবস্থা হল ?

হাতের ফর্মটা দেখালাম। সেটায় যেখানে যা লেখবার সবই লিখে দিয়েছে। শুধু বাবার সই আর দুজন সাক্ষীর সই চাই।

বললাম, এইটে নিয়ে কাল বাবা আপিসে গেলেই সব হয়ে যাবে।

অঞ্জনা হেসে জিগ্যেস করলে, তোর বাবার সঙ্গে তোকেও যেতে হবে নাকি ?

হেসে বললাম, কাল নয়। অন্য একদিন।

অঞ্জনা হেসে বললে, কালও বলতে পারত। কেন বলেনি কে জানে।

—বাবার সঙ্গে ?

—হ্যাঁ। তোর বাবা বাইরে অপেক্ষা করত। তুই ভেতরে গিয়ে ঋণের ব্যবস্থা করতিস। এমনও কত মেয়েকে করতে হয়েছে আমি জানি।

—বলিস কি !

—হ্যাঁ। ওরা কি আমাদের মানুষ বলে মনে করে ভেবেছিস !

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে।

অঞ্জনা বললে, বাবা মেয়েকে নিয়ে গেছে, ভাই বোনকে নিয়ে গেছে, এমন কি ওখানে দেখলি না ?

দেখেছি বটে, কিন্তু চুপ করেই রইলাম।

—তোকেই যদি বলত কালকে তোর বাবার সঙ্গে যেতে, কি করতিস ?

শিউরে উঠলাম ঃ মাগো !

অঞ্জনা বললে, প্রথম দিন আমিও শিউরে উঠেছিলাম। যেতে পারিনি। শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতাম। আর কাঁদি না। চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

আবার দপ করে ওর চোখ জ্বলে উঠল।

বললে, হায় ভগবান, এই পশুগুলোর হাতে স্বাধীন ভারত তৈরির ভার পড়েছে ! ওরা ভাবে না আমরা বাংলা দেশেরই মেয়ে। ওদেরই মা-বোন। আমাদের নামিয়ে ওরা বাংলাদেশকেই নিচে নামাচ্ছে !

বললে, এখনই তোর বাবার কাছে যাস না। স্নান করে, সুস্থ হয়ে যাবি।

তাই করলাম।

বাবার হাতে ফর্মটা দিয়ে যখন বললাম, কাল আপিসে গিয়ে

এইখানে ওদের সামনে সই করতে হবে। সঙ্গে তুজন সাক্ষীও নিয়ে যেতে হবে।

বাবা তো লাফিয়ে উঠল : তাহলেই টাকা পাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ।

বাবা জিগ্যেস করলে না, তুই ছেলেমানুষ, কি করে এত কাণ্ড করলি, কি অত বড় আপিসে যেতে তোর ভয় করল না? ঋণ পাওয়ার আনন্দে ওসব প্রশ্ন তার মনেই উঠল না। কিন্তু সারারাত্রি নিজেও ঘুমুল না, আমাদেরও ঘুমোতে দিলে না।

—জানলি, গরিবের ভগবান আছেন।

সায় দিতে পারলাম না। যার দয়ায় ঋণ পেলাম, সে ভগবান না শয়তান সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম না। চুপ করেই রইলাম।

—টাকা যদি পেয়ে যাই, ঘর একখানা যদি বানাতে পারি, আর তোদের তুঃখু থাকবে না। তরকারি লাগাব, মাছ ধরব, ফলের গাছ লাগাব কত। ছ্যাশে যেমন প্যাট ভরে খেতে পেতিস, আবার তেমনি করে খাবি।

শুয়ে শুয়েই বাবা ঘর বানাতে বসল :

ছ্যাঁচি বেড়ার ঘর। দু'কুঠুরি হলেই চলবে, না গো?

মা সাড়া দিলে না।

আচ্ছা এখন তো তু'কুঠুরিই হোক। পরে পাশে আর একখানা চালা তুলতে কতক্ষণ! এ তো বানের দেশ নয়, উঁচু দাওয়া করার দরকার নেই, জানো?

সাড়া দিলাম, হুঁ।

আর একটা ছোট রান্নাঘর। তার ওপর লাউ-কুমড়োর লতা তুলে দোব। কত লাউ-কুমড়ো খাবি খাস।

বাবা হো হো করে হেসে উঠল।

সামনের জায়গাটায় একটা শিমের মাচা তুলে দোব। আলতাপাটি শিম। খেয়ে শ্যাষ করতে পারব না। আর আলু

লাগাব খানিকটায়। আর কাঁচা লঙ্কা। এখানকার মাটিতে বেগুন হবে কি না জানি না। হলে তাও লাগাব। আর ঢ্যাড়স। কপির সময় কপির চাষও করতে পারব। ব্যস্।

বাবার চোখে স্বপ্নের ধারা নেমেছে।

হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল : আর বাপু, এই গাই-গরু আমার চাই। না করতে পারবে না। কিচ্ছু খরচ নাই। দু'ধারে মাঠে লকলক করছে সবুজ ঘাস। প্যাট ভরে তাই খেলেই দুধ দেবে এক কেঁড়ে। ছেলেগুলো এসে পর্যন্ত এক ফোঁটা দুধ পায় নাই। আমারও বয়স হচ্ছে, দুধ একটু দরকার।

আমরা নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছি।

বাবা বলে চলেছে : ঈশান কোণে দ্যাশের মতো একটা আমগাছ লাগাতে হবে। আর দ্যাশের মতোই দখিনদুয়োরী ঘর। যেন মনে হবে দ্যাশেই আছি।

হা হা করে বাবা হেসে উঠল।

দ্যাশ বলে কথা রে! দ্যাশের মতন কিছুই নাই। দ্যাশে আছি ভাবতে বুকখানা দশ হাত ফুলে ওঠে।

মা বললে, ঘুমুবা না? রাত যে শ্যাষ হয়ে আসে।

—ঘুমুলা তো। এসে পর্যন্তই তো ঘুমুলা। আজকের রাতটা জাগ। আবার নতুন বাড়িতে উঠে গিয়ে ঘুমুবা।

রাতটা জাগবার জন্যেই বোধ হয় বাবা তামাক সাজতে বসল।

বললে, তোমার সেই কথাটা আমি ভুলি নাই গিন্নি।

—কোন্ কথাটা?

—বিয়ের ক'নে এসে তুমি জিগাইছিলা, 'তোমাদের এখানে পুকুর নাই?' 'না, আমাদের এখানে নদী।' 'মাছ নাই?' 'কত খাইবা'। তুমি কইছিলা, 'আমাদের ওখানে পুকুর। যেখানে নদী আছে সেখানে নদী ভালো, যেখানে পুকুর আছে সেখানে পুকুর। মাছ থাকলেই

হল। কি কও?' তা নতুন জায়গাতেও মাছের দুঃখু তোমার রাখব না। জালটা বুনতে যা দেরি।

তামাক টানতে টানতে বললে, কাল কখন যেতে হবে রে?

—দশটায়।

—সই করলেই টাকা মিলব?

—না। কয়েক দিন পরে।

শুনে বাবা বোধ হয় একটু দমে গেল। আবার কয়েক দিন পরে! আজ রাত্রে হলেই বাবার ভালো হয়। তা সে না হয় হবার নয়। কিন্তু কালকে হতে দোষ ছিল কি? বার বার ঘুরে ঘুরে বাবার এমন হয়েছে যে দেরি শুনলেই ভয় হয়।

কিন্তু কিছুক্ষণ তামাক টানতে টানতে সে ভাবটা আবার কেটে গেল।

মাকে ডাকলে: শুনছ?

—কি, কও।

মায়ের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি লক্ষ্য করে বাবা বললে, আচ্ছা থাক।

নিঃশব্দে, চোখ বন্ধ করে বাবা একাই স্বপ্ন দেখতে লাগল। বাবার চোখে সারারাত্রি আর ঘুম এল না।

আমারও না। সারারাত শুধু একটা কথাই বলতে লাগলাম, ভগবান, তুমি নাই, নাই, নাই।

॥ তিন ॥

বাড়ি হল। বাবা যেমন যেমন স্বপ্ন দেখত তেমনি। দক্ষিণদ্বারী দু'কুঠুরি বড় ঘর। বাঁ পাশে রান্নার চালা। চারিদিকে কঞ্চির বেড়া। সবই সেই রকম।

বললাম, বাবা, তেমনটি ঠিক হল না।

—কেমনটি ?

—দেশের বাড়ির মতো।

বাবা হাসলে : দাঁড়া। ওইখানে ঘটের মতো আমগাছটি হতে দে, আমি বসে জাল বুনি, দেখবি ঠিক সেই রকম। কোনো ফারাক নাই।

বাবার ধারণা দক্ষিণদ্বারী ঘর আর ঈশান কোণে ঘটের মতো আমগাছ হলেই দেশের মতো বাড়ি হয়ে যাবে। দেশের বাড়ির স্মৃতির ভিতর দিয়ে বাবা এই বাড়িটা দেখছে।

কিন্তু একদিন, অবশ্য অনেক দিন পরে, তামাক খেতে খেতে নিরিবিলি আমার কাছে স্বীকার করলে, বাড়িটা ঠিক দেশের মতো হয়নি।

—কি জানিস, নদী নাই যে।

হেসে বললাম, নদী থাকলেও হত না বাবা। ঘটের মতো আমগাছ থাকলেও না।

—ক্যান ?

— মানুষগুলা কই বাবা। মানুষগুলাও চাই যে।

বাবা কথাটা ভাবলে। বললে, হ, ঠিকই কইচিস। মানুষগুলাও চাই। তা কোথায় পাব ?

আমার মনে হয়, ঋণটা পাওয়া সম্বন্ধে মা যে কথা বুঝতে পেরেছিল, বাবা তা পারেনি।

ঋণ আনতে যাবার দিন আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়েছিল। বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, আমাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। ফিরে এলাম এক ঘণ্টা পরে।

বাবা এদিক-ওদিক ঘুরছিল। আমার দেরি দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে টাকাটার জন্যে। আমাকে দেখামাত্র ছুটে আমার কাছে চলে এল।

—পাইছস ?

আর কোনো কথা নয়। কেন দেরি হল তা নিয়ে তার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। চিন্তা শুধু টাকাটা পেয়েছি কি না।

যেই বললাম পেয়েছি, আর বাবা যেন আনন্দে নাচতে লাগল।

লজ্জায় আমি মাথা তুলতে পারছিলাম না। বাবার দৃষ্টি কিন্তু সেদিকে নয়। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। মাকে খবরটা দিতে হবে। ঘর বলে কিছু নেই। সঙ্গে অতগুলো টাকা। রাত্রে সজাগ থাকতে হবে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম বড় সোজা জায়গা নয়। চোর আর পকেটমার হরদম ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফেরবার পথে ট্যাক্সিতে শুধু এই সব কথা। তাও চুপিচুপি। পাছে ট্যাক্সিওয়ালা শুনতে পায়।

তারপরেও কোনোদিন বাবা জিগ্যেস করেনি টাকাটা পাওয়া গেল কি করে? তা নিয়ে কোনোদিন কৌতূহল প্রকাশ করেনি। টাকাটা পাওয়া নিয়ে কথা, পাওয়া গেছে। ও পর্ব ওইখানেই শেষ।

কিন্তু মায়ের মনে সন্দেহ ছিল। যদিও কোনোদিন এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেনি।

ঠিক এই সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। কালু মারা গেল।

এখানে এসেও কালুর কোনো পরিবর্তন হয়নি। যতক্ষণ জেগে থাকত, জাল বুনত। খাওয়ার কোনো চেষ্টাই ছিল না। দিলে খেত, না দিলে বায়না করত না। শরীর দিন দিন কাহিল হতে লাগল।

আমরাও, সত্যি কথা বলতে কি, সেদিকে বিশেষ খেয়াল করিনি।

হঠাৎ একদিন জ্বর হল।

রাত্রে বিকারের মতো হল। সমস্ত রাত শুধু মাথা চালে আর চেঁচায়ঃ আমার জাল কই? আমি জাল বুনব না?

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু করব কি? কাছাকাছি কোথাও ডাক্তার নেই। কলোনী সবে হয়েছে। দু'চারটি ঘর মাত্র। তাদেরও সঙ্গে বিশেষ চেনা হয়নি।

ভাবছি, সকালে যা হয় করা যাবে।

কিন্তু সকাল পর্যন্ত আর পৌঁছুন গেল না। বিকারের ঘোরে একবার উঠে বসে পড়ল। তখনই পড়ে গেল আর সব শেষ।

তখনও কাক-কোকিল ডাকেনি।

মা ডুকরে কেঁদে উঠল। সেই সঙ্গে আমরা সবাই। বাবা কিন্তু কাঁদল না। নিবোনো কলকেটা হুঁকোয় বসিয়ে দাওয়ায় বসে টানতে লাগল।

কান্না শুনে পাড়ার লোকেরা এসে উপস্থিত হল। মেয়েরা মাকে আর পুরুষেরা বাবাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। আর একদল মড়া নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল।

সকাল আটটার আগেই কালু চিরকালের মতো আমাদের কাছ থেকে চলে গেল।

এই ধাক্কাটা বাবা সামলাতে পারল না।

কালুর সঙ্গে বলতে গেলে বাড়ির কারোরই কোনো সম্পর্ক ছিল না। বাবারও না, আমাদেরও না। সে যতক্ষণ জেগে থাকত, আপনমনে জাল বুনত। কারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা কইত না। শেয়ালদা স্টেশনে থাকতে তো গণ্ডির বাইরে নড়তই না। এখানে এসে মাঝে মাঝে এঘর-ওঘর ঘুরত। উঠানে একটু হয়তো পায়চারি করত। কখনও কখনও বাড়ির বাইরে গিয়েও দাঁড়াত। চারিদিকে চেয়ে কি যেন খুঁজত।

বাবা বলত, ও আমাদের গাঁকে খুজছে।

—সে কি ওর মনে আছে?

—আছে হয়তো আবছা-আবছা।

সাত-আট বছরের ছেলে মনে থাকারই কথা। কিন্তু ওর মাথার জন্যে সন্দেহ হত মনে আছে কি না। মাথা তো সুস্থ নয়।

জিগ্যেস করতাম, হ্যাঁরে কালু, আমাদের গাঁ তোর মনে আছে? সেই ঘটের মতো আমগাছ, বেড়ার গায়ে রংবেরঙের ফড়িঙের ভিড়, নদীব ধার,—মনে আছে?

শুনতে শুনতে চকমক করে চাইত। কিন্তু মনে আছে কি না বোঝা যেত না।

বাবা বলত, মনে আছে রে, আবছা-আবছা মনে আছে। ইস্টিশনে থাকতে মনে পড়ত না। এখানে এসে গাঁয়ের ছবি একটু একটু মনে পড়ছে।

বাবা মাঝে মাঝে তাকে নিজের সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইত। একটু দূর গিয়ে কালু গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। আর যেতে চাইত না। বাধ্য হয়ে বাবা তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরত।

বাবা বলত, এখানে এসে খোলা জায়গায় ওর মাথাটা সেরে যেতেও পারে।

আশা আমাদেরও হয়েছিল।

মাথা তো ওর খারাপ ছিল না। দিব্যি সুস্থ ছেলে। হাসত, খেলত, পাঠশালায় যেত। আমাদের কাছে নানারকম নিষ্ঠুর গল্প শুনে আর নানা দৃশ্য নিজের চোখে দেখে আসবার পথে ওইরকম হয়েছিল। স্টেশনের বদ্ধ হাওয়ায় সেটা আরও বাড়ে। আশা হয়েছিল, এবং তার কিছু কিছু লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল, নতুন খোলা-মেলা জায়গায় এসে হয়তো আবার সে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

কিন্তু হল না।

ছেলেপুলের অসুখ তো হয়ই। কিন্তু এক রাত্রের মধ্যে ওরকম হয়ে যেতে পারে, আমরা ভাবতেই পারিনি।

ধাক্কাটা বাবাকে খুব লাগল।

পাগলই হোক আর যাই হোক, বংশে ছেলে বলতে ওই একটি

বাড়িঘর, গাছপালা, গরু-বাছুর, নতুন করে সংসার বাঁধবার যা-কিছু বাবার স্বপ্ন, সে তো ওরই জন্যে।

বাবা ভয়ানক একটা ধাক্কা খেলে।

দেশে থাকতে বাবার যা-কিছু কাজকর্ম, খাটাখাটুনি তা বেশির ভাগই বসে বসে। ঘোরাফেরা দৌড়ঝাঁপ বিশেষ ছিল না। এখানে এসে বাবার পুরোনো অভ্যাস একেবারে বদলে গেল। প্ল্যাটফর্মের ওই বদ্ধ জায়গার জন্যেই হোক, আর ভিক্ষে-সিক্ষে করে দু' পয়সা রোজগারের জন্যেই হোক, বাবা ঘরে বসে থাকতেই পারত না। সমস্তক্ষণই বাইরে-বাইরে ঘুরত।

নতুন বাড়িতে এসে ঘোরাটা কিছু কমলেও সেই চটপটে ভাবটা ছিলই। বাঁশ কাটছে, কাবারী তৈরি করছে, বেড়া বাঁধছে, মাটি খুঁড়ছে,—সব সময় কিছু-না-কিছু পরিশ্রমের কাজে ব্যস্ত থাকত।

সম্প্রতি বাবা জাল বোনার কাজও আরম্ভ করেছিল। নিজেদের পুকুর নেই বটে, কিন্তু কাছাকাছি কতকগুলো পুকুর দেখে এসেছে। মতলব ছিল, সন্ধের অন্ধকারে কিছু কিছু মাছ ধরে আনার।

কালুকে তখন ডাকতঃ আয় এইখানে। দুই বাপ-বেটায় জাল বুনি।

কালু কখনও খুশি হয়ে যেত। কখনও গোঁ ধরে বসে থাকত, যেত না।

কালুর মৃত্যুতে বাবা থমকে গেল। তার কাজকর্ম, উৎসাহ-উদ্যম সবই যেন থমকে গেল। বাবার সব সময়ের ব্যস্ত ভাব, ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়ে গেল। জাল বোনা পর্যন্ত।

একদিন একজন প্রতিবেশী ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে, বাবা একটা পুকুরের পাড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

ছুটলাম।

তখন বাবার জ্ঞান হয়েছে বটে, কিন্তু বুঝতে পারছে না কোথায়

আছে, এখানে কেনই বা এল। কথায় একটা জড়তা। কিন্তু মানুষ চিনতে পারছে, যদিচ চাইছে কি রকম ফ্যালফ্যাল করে।

ধরাধরি করে নিয়ে এলাম। সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম যাতে আর বাইরে চলে না যায়। যাতে আবার আগের মতো কাজে মন বসে, সে চেষ্টাও করতে লাগলাম।

—বাবা, বেড়াটা শেষ করলে না। কাল ওইদিক দিয়ে গরু ঢুকে অর্ধেক শাক খেয়ে গেছে।

বাবা শাকের ক্ষেতের দিকে একবার চাইলে, আর একবার অসম্পূর্ণ বেড়াটার দিকে। কিন্তু খব উৎসাহ বোধ করলে বলে মনে হল না।

বললে, কই গরু ?

—গরু কি আর আছে! চলে গেছে।

—হুঁ।

বাস। ওই পর্যন্ত।

—বাবা, জাল বুনবে না ?

দাওয়ায় একটা বাঁশে জাল এবং বোনবার সরঞ্জাম ঝুলছিল। বাবা উদাসীনভাবে সেইদিকে একবার চাইলে। কিন্তু কোন উৎসাহ দেখালে না।

—জালটা পেড়ে দোব ?

ঘাড় নেড়ে বললে, না।

বরং মা তার চেয়ে শক্ত। বুকের ভিতর তুষের আগুন জ্বলছিল। কিন্তু বাইরে কাজকর্ম সবই চলছিল। রান্নাবাড়া দু'চার দিন আমিই করেছিলাম। কিন্তু তারপর আর রাঁধতে দিলে না। নিজেই রান্না করতে লাগল।

একলা থাকলে চুপিচুপি কাঁদত, বুঝতে পারতাম। সেজন্যে একলা বড় একটা থাকতে দিতাম না।

একদিন দুপুরবেলায় মা বললে,. ওর তো ওই অবস্থা। আমার

ছেলে বলতেও তুই, মেয়ে বলতেও তুই। তোকে না বললে আর কাকে বলব।

—কি বল?

বললে, তরকারির মধ্যে তো শাক। বেগুনের ক্ষেত খোঁড়াই পড়ে রইল। কত কি লাগাবে বলেছিল, সে আর হবে না। তা সে যা হবার হবে। কিন্তু চাল যে ফুরিয়ে আসছে।

—বাবার কাছে টাকা নেই?

—আছে হয়তো সামান্য কিছু। সে আর ক'দিন চলবে? তার পরেও তো খেতে হবে। পুত্রশোকেও পেট তো মানবে না।

তা মানবে না। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি?

বললাম, গোটা পাঁচেক টাকা তো দাও। এখনকার মতন চাল তো নিয়ে আসি। তারপরে দেখব কি করা যায়।

একদিন নিজেই কোদালটা নিয়ে বেগুনের ক্ষেতটা তৈরি করতে বসলাম। দাওয়া থেকে বাবা চেয়ে চেয়ে দেখছিল। অনেকক্ষণ ধরে দেখলে। তারপর হঠাৎ এসে কোদালটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে।

বললে, অমন করে নয়।

নিজেই জমি তৈরি করতে লাগল।

দেখলাম এ তো মন্দ নয়!

একদিন বোনার ছল করে জালটা নিয়ে বসলাম।

সেও বাবা অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখলে। তারপর জালটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেই বুনতে বসে গেল।

এমনি করে বাবা একটি একটি করে কাজ করতে লাগল বটে, কিন্তু কোনটাই নিজের থেকে নয়, আগেকার উৎসাহের সঙ্গেও নয়। কাজ ধরিয়ে দিতে হত। দিলে করত।

মা বললে, এমনি করতে করতেই কাজে উৎসাহ আসবে। অমনি করে কাজ ধরিয়ে দিবি।

আমারও তাই মনে হল।

এই একটা কাজ আমার বাড়ল। বাবাকে কাজ ধরিয়ে দেওয়া কালু গেছে। এখন চিন্তা বাবাকে নিয়ে।

শুধু বাবাকে নিয়েই নয়। আরও আছে।

বাবা সুস্থ থাকলে আমরা পাহাড়ের আড়ালে থাকতাম। এটা-ওটা করে দুটো শাক-ভাতের ব্যবস্থা বাবা করত। আমাদের ভাবতে হত না। কিন্তু ওই যে মা বললে, ছেলে বলতেও আমি, মেয়ে বলতেও আমি। আমি কোথা থেকে কি করি?

কিছু একটা করতে হবে।

কিন্তু কি করতে হবে? আমি কি করতে পারি? মা বলে দিলে আমিই ছেলে, আমিই মেয়ে। কিন্তু সত্যি সত্যি তো আর আমি ছেলে নই। মা বললেই তো হবে না। সংসার চালাবার মতো আমার কি শক্তি আছে?

সেই কথাটাই ভাবি।

অঞ্জনার কথা অনেকদিন :রে মনে পড়ল।

যা ডামাডোল গেল, মনে পড়ার কথাও নয়। এই উপলক্ষ্যে মনে পড়ল। তার মাথায় নানা বুদ্ধি খেলে। তাকে পেলে সে হয়তো একটা রাস্তা বাৎলে দিতে পারত।

তারাও স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে অন্য একটা কলোনীতে। আমাদের কয়েকদিন আগেই গেছে। যাবার আগে ঠিকানা একটা দিয়ে গিয়েছিল। সেইটে খুঁজে বের করলাম। কিন্তু জায়গাটা যে কোথায় কিছুই জানি না।

কে জানে খঞ্জনারা ঋণ পেয়েছে কি না। পেয়ে থাকলে তারাও অন্য কোথাও উঠে গেছে। না পেয়ে থাকলে এখনও স্টেশনেই আছে। যাবে আর কোথায়?

মনে হল, তার কাছে গেলে হয়। অবশ্য যদি স্টেশনে থাকে। না থাকলে আর কিই বা করা যাবে।

এই ভেবে একদিন দুপুরে চলে এলাম শেয়ালদা।

আরে বাপ! কি চেহারা হয়েছে স্টেশনটার! লোক আরও বেড়েছে। সেই সঙ্গে নোংরাও বেড়েছে যেমন, অন্ধকারও তেমনি। চেনা মুশকিল!

প্রথমেই এলাম যেখানে আমরা থাকতাম সেইখানে। অন্য এক দল এসে বসে গেছে সেখানে। মাটির হাঁড়িতে তাদের রান্না চড়েছে।

আরও অনেক নতুন মুখ।

খঞ্জনাদের ওখানে গেলাম।

—আছিস এখনও?

—আছি বইকি। যাব কোথায়? এতদিন পরে মনে পড়ল?

—যা গেল ভাই, সে আর বলবার নয়। এখনও যাচ্ছে।

কালুর মৃত্যু এবং বাবার শরীরের অবস্থা শুনে খঞ্জনা খুব দুঃখিত হল।

জিগ্যেস করলাম, অঞ্জনা আসেনি?

—না। আর কি করতে আসবে বল। এ নরককুণ্ড যত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারা যায় ততই ভালো। তোর সঙ্গে দেখা হয়?

—না।

—তোর সঙ্গেও না?

—না। আমার ঠিকানাও সে জানে না। কিন্তু এইটেই আসবার-যাবার পথ। ভেবেছিলাম তোর সঙ্গে দেখা হয়।

—না।

—ওর ঠিকানা আমার কাছে আছে। যাবি?

বললে, ঠিকানা তো আমার কাছেও আছে। কিন্তু কোথায় সে জায়গা, কোন্ দিকে যেতে হয়, কিছুই জানি না।

—আমিও না।

—তাহলে ?

সেই তো সমস্যা। নিয়ে যাবে কে ?

বললাম, যদি কোনোদিন অঞ্জনা আসে, এই আমার ঠিকানা রইল, সে সব চেনে, তাকে নিয়ে তুই সুদ্ধ যাস, কেমন ?

খঞ্জনা ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। কিন্তু তার সন্দেহ, অঞ্জনা এর মধ্যে যখন আসেনি, তখন শীঘ্র আসবে না।

খুব সম্ভব।

জিগ্যেস করলাম, আছিস কেমন ?

খঞ্জনা হাসলে ঃ তোরা যেমন ছিলি তেমনি।

বললাম, তা যদি বললি, ওখানে বসে মাঝে মাঝে এখানকার কথা ভাবি। তখন এ জায়গাটাকে নরককুণ্ড মনে হত। এখন দূব থেকে যখন ভাবি, মনে হয় মন্দই বা কি ছিলাম !

খঞ্জনা বললে, চলে গেলে তাই মনে হয়।

—তোব বিয়েব কি হল ?

—বিয়ে তো হলেই হয়। কিন্তু

খঞ্জন। ম্লান হাসলে।

—কিন্তু

—খাব কি ? ও বলে, যতদি॰ ভদ্রভাবে থাকার ক্ষমতা না হচ্ছে ততদিন এই ভালো।

—আসে মাঝে মাঝে ?

—রোজই। ওব হয়েছে মুশকিল। সেখানে বাপ-মা, ভাই-:বান সবই আছে। তাদের দেখ ে হয়। এখানে আমি আছি; আমার বাপ-মা, ভাই-বোন আছে। আমাদেরও দেখতে হয়। তাঁতের মাকুর মতো একবার ওদিকে ঢুঁ দিচ্ছে, একবার এদিকে।

খঞ্জনা হাসলে।

বললে, তুই আর একটু আগে এলে ওর সঙ্গে আমরা অঞ্জনার ওখানে যেতে পারতাম।

—এখনই চলে গেল বুঝি ?

—হ্যাঁ।

একটু ভেবে বললাম, একটা কাজ করা যায়।

—কি কাজ ?

—ও সাধারণত কখন আসে ?

—দুপুরের দিকে। বারোটা-একটায়।

—অঞ্জনাকে আমার খুবই দরকার, জানিস। কাল দুপুরে আমি বারোটা নাগাদ আসব বরং। তারপর ওকে নিয়ে অঞ্জনার বাড়ি যাব।

—বেশ।

যে ছেলেটির সঙ্গে খঞ্জনার বিয়ের কথা হয়েছে, সে ছেলেটি ভালো। আমরা দেখেছি। অল্প পরিচয়ও হয়েছে। ফাজিল-ফক্কড় নয়, বেশ শান্তশিষ্ট ছেলে। ওদের বিয়ে হলে বেশ চমৎকার মানাবে।

॥ চার ॥

খঞ্জনার ভাবী বর, বরুণ ওর নাম, তাকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরবেলা অঞ্জনার ওখানে পৌঁছুলাম। বাবা, কোথায় থাকে সে! যাকে বলে ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর।

শেয়ালদা থেকে ট্রেনে চড়ে একটা ছোট স্টেশনে নামলাম। সেখান থেকে বাসে চড়ে কিছুদূর। একটা তেপান্তরের মাঠ। তারপরে পায়দল। সেটা অবশ্য বেশি দূর নয়।

ফটকের মুখেই অঞ্জনা দাঁড়িয়ে একজন সাহেববেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। আরও কাছে আসতে দেখি ডাক্তার। গলায় ঝুলছে ডাক্তারী যন্ত্র।

আমাদের দেখে অঞ্জনা লাফিয়ে উঠল।

—তোরা!

—আবার কে আসবে তোর সঙ্গে দেখা করতে? কিন্তু ডাক্তার কেন? কারও অসুখবিসুখ নাকি?

—হ্যাঁ। মায়ের।

—কি অসুখ?

—নাম জানি না। ডাক্তার বলেছেন, খুব ব্যয়সাধ্য অসুখ। খরচ করতে পারলে উনি বাঁচিয়ে দেবেন।

কি সাংঘাতিক ব্যাপার! ব্যারাম বুঝি, মরণও বুঝি। কিন্তু মাঝখানে এই যে খরচের নদী, জলের মতো বয়ে যায়, এইটে নিয়েই যত দুশ্চিন্তা।

খঞ্জনার দিকে চেয়ে বরুণ বললে, এইবার আমি যেতে পারি? তোমাদের ফিরতে অসুবিধা হবে না তো?

খঞ্জনা বললে, না, না। রাস্তা চেনা হয়ে গিয়েছে, আর কোনো অসুবিধা হবে না। যাবার সময় বাবাকে বলে যেও, আমরা এখানে এসেছি। ফিরতে দেরি হলে যেন ভাবে না।

—আচ্ছা।

বরুণ হনহন করে চলে গেল। তার অনেক কাজ। খঞ্জনা একরকম জোর করেই নিয়ে এসেছিল।

অঞ্জনা বললে, ফিরতে দেরি হলে তোর বাপ-মা এখনও ভাবে?

—ভাবে একটু।

—আমার সে বালাই নেই। বরং কোনোদিন যদি না বেরুই, কি বেরিয়ে সকাল-সকাল ফিরি, তাহলেই ভাবে।

অঞ্জনা হাসতে লাগল।

আমরা বললাম, চল্ আগে তোর মাকে দেখিগে।

অঞ্জনা থমকে দাঁড়াল। বললে, কি আর দেখবি। বিছানার সঙ্গে মিশে শুয়ে আছে। বুড়োমানুষ, গেলে সেও বাঁচে,

আসলেও বাঁচি। কিন্তু যাওয়া তো নিজের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না।

তবু গেলাম।

বিছানার সঙ্গে মিশে যাওয়াই বটে। মেঝেয় একটা ময়লা কাঁথা পাতা। তার উপর তেলচিটে একটা বালিশ। একটা তেমনি ময়লা কাঁথা ঢাকা।

মাথার দিকে একটি গাদা ওষুধের শিশি বাক্সয়-বাক্সয়। আর প্রচুর ফল।

বললাম, খরচ তো কম হচ্ছে না।

অঞ্জনা হাসলে : সব খরচ আমার নয়। ওষুধগুলো সবই ডাক্তার দিচ্ছেন। ফল আমি কিনি।

হেসে বললাম, ফি'ও নিচ্ছেন না নিশ্চয়।

—বলাই বাহুল্য।

বললে, ওসব বাজে কথা থাক। কোথায় আছিস বল। বঞ্জনা, তোর কি খবর ?

আমি যেখানে আছি তার ঠিকানা দিলাম। খঞ্জনাও তাব অবস্থার কথা বললে। অনুযোগ করলে, একদিনও অঞ্জনা যায়নি বলে।

অঞ্জনা বললে, এই তো অবস্থা দেখছিস। দেড় মাস মাকে নিয়ে এই চলছে। তবু একজন অমায়িক ডাক্তার পাওয়া গেছে। নইলে যে কি করতাম ভগবান জানেন।

বললাম, জুটে যায়।

—ঠিক বলেছিস, জুটে যায়। জুটে যাচ্ছেও। কত রকম তো করলাম। দেখলাম কিছুই কিছু নয়।

—কত রকম আবার কি করলি ?

—করলাম না ? ওরে বাবা ! ইস্কুল-মাস্টারী থেকে প্রাইভেট ট্যুইশান পর্যন্ত কিছু বাদ দিইনি।

—তারপরে!

—দেখলাম, এই দুরন্ত বয়স আর অসহায় অবস্থা থাকতে এরা আমাকে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে দেবে না।

অঞ্জনা হাসতে লাগল।

বললাম, অঞ্জনা, আমি তো আর পারি না।

—কি হয়েছে?

ভায়ের মৃত্যুর খবর দিলাম। বাবার শারীরিক অবস্থার খবরও। বললাম, টাকা ফুরিয়ে আসছে। কি করে যে সংসার চলবে ভেবে মায়ের তো ঘুম নেই।

অঞ্জনার মুখ গম্ভীর হল। বললে, বাংলাদেশে আজ কারও চোখে ঘুম নেই রে। চোরেরও না, সাধুরও না। বাংলাদেশ থেকে ঘুম ক্রমশ চলে যাচ্ছে।

আমরা দুজনে নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে চেয়ে।

বললে, আমার কি মনে হয় জানিস?

—কি?

—মা যদি মরে তো আমি বাঁচি।

বিস্মিতভাবে বললাম, সে কি রে! মাথার ওপর তবু একজন অভিভাবক রয়েছে। সে কি কম কথা!

—দরকার নেই। মাথার ওপর অবারিত আকাশ ছাড়া আর কিছুই আমি চাই না। আমি, আমার শয়তান আর অবারিত আকাশ। কি করব জানিস?

—কি?

—আঁচলে আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুনে বাংলাদেশকে দোব ছাই করে। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ জমেছে। আগুন ছাড়া সে পাপ যাবে না।

অঞ্জনার চোখে সেই জ্বালা।

বললাম, অঞ্জনা, আমার তো একটা-কিছু করা চাই।

—করব

—কি করব

—যা-খুশি। সমাজ তো নেই যে, কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

—কিন্তু কোনো সন্ধানই তো পাই না।

—অপেক্ষা কর। আপনি জুটে যাবে। খঞ্জনা, তোদের বিয়ের কদ্দূর?

মুখ নীচু করে খঞ্জনা বললে, সেই যদ্দূরে দেখে এসেছিলি তদ্দূরেই আছে।

—আর এগোয়নি?

—না।

—বরুণবাবু কোনো কাজকর্মের যোগাড় করতে পারেননি?

—না।

—পারবেও না। আমার কথা শুনবি?

—কি?

—বরুণের ভরসা ছেড়ে দিয়ে তুই নিজেই রোজগারের চেষ্টা কর।

—কি করে?

অঞ্জনা হেসে ফেললে: এতক্ষণ তবে শুনলি কি?

খঞ্জনা মুখ নীচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

জুটে যায়।

কথাটা কি অঞ্জনা বলেছিল? না আমরা দুজনেই বলেছিলাম? যেই বলুক, সত্যি। টাকার জন্যে চিন্তা যখন মাথায় মাথায়, সন্দেহ মাঝে মাঝে একটা বেলা করে খাওয়া ছুট দিচ্ছে বুঝি, বাবার মাথাটাও আবার যেন কেমন-কেমন লাগছে,—তখন জুটে গেল।

অভাবিতরূপে।

পালংশাকগুলো বেশ লকলক করে উঠছে। তাই আমাদের

একমাত্র ভরসানই। লঙ্কাগাছে দু'চারটে কাঁচা লঙ্কাও দেখা যাচ্ছে। আর বেগুনের চারাগুলো বেশ সবুজ হয়ে উঠছে বটে, কিন্তু বেগুন ধরতে এখনও দেরি। বিলিতী বেগুন সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে। অর্থাৎ ওর উপর ভরসা করা চলতে পারে, কিন্তু আজকের জীবনযাত্রায় ওর কোনো মূল্য নেই।

বাবা মাঝে মাঝে উৎসাহিত হয়ে ওঠেঃ ওইখানটায় দুটো আলু লাগালে হত রে।

হতই তো। কিন্তু আলুগাছের দিকে চেয়ে ভাত উঠত না। তাছাড়া শুধু আলু-বেগুন খেয়েও দিন চলবে না, চাল চাইই। সেই চালই বাড়ন্ত। কেনবারও পয়সা নেই।

একলা দাওয়ায় বসে বসে সেই দুশ্চিন্তাই করছিলাম। এমন সময় বেড়ার ফটক ঠেলে কয়েকটি ছেলে এল। চেনা ছেলে। এই কলোনীরই।

বললে, রঞ্জনাদি, একটা স্কুল তো করা দরকার। ছেলেমেয়ে-গুলোকে তো পড়াতে হবে।

বললাম, তা তো হবে। কিন্তু স্কুল হচ্ছে কি করে ?

—সবাই মিলে চেষ্টা ক .লে হয়ে যায়।

—কি করে ?

—গবর্নমেণ্ট থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে তো সময় নেবে। ইতিমধ্যে হিসেব করে দেখা গেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে জনকুড়ি হবে। সবারই অভিভাবকদের যথেষ্ট উৎসাহ আছে। যদি প্রত্যেক ছাত্র আট আনা করেও মাইনে দেয়, দশটা টাকা উঠবে।

—সবাই কি দিতে পারবে ?

—বলছে তো পারবে।

—সেই টাকাটা কি হবে ?

—শিক্ষিকার মাইনে।

হাসলাম : দশ টাকায় কি শিক্ষিকা পাওয়া যাবে ?

ছেলেরাও হাসলে : অন্য শিক্ষিকা হয়তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু আপনাকে পাওয়া যেতে পারে।

তাই সস্তায় মাস্টারের খোঁজে আমার কাছে এসেছে !

মা বললে, যা না। যা দশটা টাকা পাওয়া যায়।

—তাও কি যাবে মা। লোকদের তো চেন। ভিক্ষে করে দিন চলে। মাসে আট আনা করেই বা ক'জন দিতে পারবে ?

—বসেই আছিস।

সেই একটা কথা। বসে না থাকি বেগার খাটি।

রাজী হয়ে গেলাম।

—কিন্তু স্কুলের ঘর কোথায় ?

ওরা বললে, ঘর তুলতে হবে। যদ্দিন না ঘর হচ্ছে তদ্দিন ওই গাছতলায় ক্লাস হতে পারবে।

সেই গাছতলা ! যেখানে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। সেইদিন থেকে গাছতলাটাকে আমার কি রকম ভুতুড়ে বলে মনে হয়। চাবিদিকে ডালপালা ছড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ। তার নীচেটা ঘরের মতো অন্ধকাব। আরও ঠাণ্ডা। ঝিরঝিরে হাওয়া দেয় সব সময়। সেই ঠাণ্ডা হাওয়াটাই কি রকম ভুতুড়ে মনে হয়।

জিগ্যেস করলাম, টেবিল-বেঞ্চি ?

—পরে হবে। গবর্নমেণ্টের সাহায্য পাওয়া গেলে। আপাতত তালপাতার চাটাইতে বসবে।

তাতেই রাজী হলাম। যা হোক একটা জুটে তো গেল। দশটা টাকাই বা পাওয়া যেত কোথায় ?

গাছতলার স্কুল।

মন্দ হল না। ছায়া আছে, ঝিরঝিরে মিষ্টি হাওয়াও দেয়। মাঝখানে একটা চাটাই পেতে আমি বসি। সামনে গোল হয়ে

ছেলেমেয়েরা। মোট উনিশ জন। বেশির ভাগই অ আ ক খ। কয়েকজনের অক্ষর পরিচয় হয়েছে।

উপরে ডাকে পাখি। নীচে ছেলেমেয়েদের চীৎকার। চারিদিকে আর কোনো শব্দ নেই।

মন্দ লাগে না।

দু'বেলা স্কুল। একবার সকালে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা। আর একবার বিকেলে সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচটা। ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের চাটাই নিয়ে যায়, নিয়ে আসে। আমিও তাই করি।

মাস দুই চলার পর দেখা গেল, বেতন যদিও সাড়ে ন'টাকা ওঠবার কথা, কিন্তু ওঠে না। প্রথম মাসে ছ'টাকা, দ্বিতীয় মাসে সাড়ে পাঁচ টাকা উঠল। হিসাব করে দেখলাম, প্রতি মাসে যদি আট আনা করে কমতে থাকে তাহলে মাস আষ্টেক পরে ছাত্রদত্ত বেতন শূন্যে দাঁড়াবে।

তবু মন্দ লাগল না।

সকাল-বিকেল অতগুলি ছেলেমেয়ের সঙ্গে বেশ কাটে। অন্তত কিছু না করে বাড়িতে বসে বসে দুশ্চিন্তা করার চেয়ে ভালোই কাটে।

কলোনীর কতকগুলি ছেলে স্কুলটির জন্যে খুব খাটছে। তারা রিলিফ আপিসে যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট মহলে তদ্বির করছে। এই টাকাটা বেরিয়ে এলে ছাত্রদত্ত বেতনের উপর আর ভরসা করতে হবে না। ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মতো আয়ের ব্যবস্থা হলে আর ভাবি না।

কিন্তু হচ্ছে না কিছুতেই। অথচ ভরসা পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। এবং ছেলেরা নিশ্চিত আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টাকাটা বেরিয়ে আসবে, হালের তো বটেই, বকেয়া কয়েক মাসেরও।

কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, মাসের পর মাসও, সাহায্য আর মঞ্জুর হয় না।

আমি অধৈর্য হই: কি হল হে?

—হচ্ছে, হচ্ছে। হবে দেখুন না।

অগত্যা অপেক্ষা করি।

সত্যি কথা বলতে কি, কাজ সংগ্রহ সম্বন্ধেও আমার উৎসাহ দিন দিন কমে আসছিল। কোথায় কাজ? কি কাজই আমি করতে পারি? তার চেয়ে কিছুদিন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পর যদি স্কুলটি সরকারী সাহায্য পায়, তাহলে এই হবে আমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো কাজ। সেইজন্যেও অপেক্ষা করি।

এর মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটল:

যে গাছের তলায় স্কুল তার কোটরে, ঠিক আমার বসবার জায়গার মাথার উপর, মনে হল যেন একটা কাগজ গোঁজা রয়েছে।

ওখানে কাগজ গুঁজে রাখলে কে? স্কুলের কোনো ছাত্র-ছাত্রী বোধহয় লজেন্স-টজেন্স গুঁজে রেখেছে।

হাত বাড়িয়ে সেটা বার করে দেখলাম, না সেরকম কিছু নয়।

ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হল কি যেন লেখা আছে। পড়লাম।

> "স্কুলের ছুটির পর চলে যেও না। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

কে রে বাবা! কে কাকে চিঠি দিচ্ছে? উপরে নীচে কারও নাম নেই। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

প্রথমে খুব কৌতুক বোধ হল। এখানে সন্ধ্যায় কোনো দুজন মিলিত হয়। একবার লোভ হল, আড়াল থেকে দেখলে হয় তারা দুজন কে? এই কলোনীরই কেউ হবে। চিনতে পারব।

কিন্তু আর একবার চিঠিখানা পড়তে মনে হল 'স্কুলের ছুটির পর' লিখেছে কেন? তবে কি আমাকে লিখেছে?

অজানিত ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

সেদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই স্কুল বন্ধ করে বাড়ি চলে গেলাম।

পরদিন দেখি আবার একখানা চিঠি, সেই কোটরেই:

"ভয় পেও না। ভয় পাবার কিছু নেই। খুব জরুরী কথা আছে।"

কি সাংঘাতিক! জরুরী কথা আছে তো আমার বাড়ি গেলেই পারে। এখানে এই নির্জন মাঠে আমার সঙ্গে তার কি জরুরী কথা থাকতে পারে?

মনে হল অক্ষরগুলো পর্যন্ত যেন দাঁত বের করে হাসছে!

সেদিনও সকাল সকাল স্কুল বন্ধ করে বাড়ি ফিরলাম। পরদিন ফের আর একটা চিঠি:

"রঞ্জনা, আমার কাছে সতীপনা দেখান মিথ্যে। তোমার সব খবর আমি জানি। আজ যদি অপেক্ষা না কর তাহলে কাল সকালে সব রাষ্ট্র করে দোব। সাধের মাস্টারীটা যাবে।"

পড়তে পড়তে সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কেঁপে উঠল।

কে এই লোক, যে আমার সব জানে?

এই কলোনীর ছোকরাদের এক এক করে স্মরণ কবতে লাগলাম। এখানে আসার আগে তাদের কাউকে আমি কখনও দেখিনি। তারাও কখনও আমাকে দেখেনি।

তবে কি বাইরের লোক? শেয়ালদা স্টেশনে একসঙ্গে ছিলাম এমন কেউ? বাঁ হাতে চিঠি লিখেছে কেন? আরও পরিচিত কেউ যার হাতের লেখা চিনি?

খুব ভয় পেয়ে গেলাম। কি করব কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। সকলকে জানান ঠিক হবে না। কত লোক কত রকম ভাবতে পারে। ওর জন্যে ওর কথামত অপেক্ষা করতে তো একেবারেই সাহস হল না।

অবশেষে যে ছেলের দল স্কুলের জন্যে খাটছে তাদের মধ্যে অত্যন্ত বিশ্বাসী দুজনকে চিঠিগুলো দেখালাম।

বললাম, এ রকম করলে আমি তো এখানে পড়াতে পারব না।

তারা চিন্তিত হল।

একজন বললে, এক কাজ করতে পারেন রঞ্জনাদি?

—কি কাজ?

—আজ বিকেলে আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা গাছের ওপর লুকিয়ে থাকব।

ভয়ে শিউরে উঠলাম: ওরে বাবা! ও আমি পারব না।

ওরা হতাশ হল। তাহলে আর কি করা যেতে পারে?

একটু ভেবে একজন বললে, দেখুন, সকালে যখন পড়াতে বসেন তখন চিঠিখানা থাকে?

—না।

—তাহলে সকালের স্কুল শেষ হওয়ার পর বিকেলের স্কুল বসবার আগে চিঠিখানা কেউ রেখে আসে?

—নিশ্চয়।

—ঠিক আছে।

বলে তারা দুজনে চলে গেল।

সেই দিন বিকালে পড়াতে গিয়ে দেখলাম, আজ আর চিঠি নেই। কি ব্যাপার, লোকটি কি হাল ছেড়ে দিলে? না কি এর পরে আমার কুৎসা রটনায় লেগে যাবে?

নানারকম ভাবছি। চিঠি পাওয়ার মধ্যে এক দুশ্চিন্তা, না-পাওয়ার মধ্যে হাজার দুশ্চিন্তা।

এমন সময় যে দুটি ছোকরাকে চিঠি দেখিয়েছিলাম তাদের মধ্যে একজন বিদ্যুৎ হাসতে হাসতে এসে উপস্থিত।

—আজ আর চিঠি পাননি তো?

—না।

—আর পাবেন না। নিশ্চিত হয়ে পড়াতে পারবেন।

—কি ব্যাপার শুনি।

—সে আর শুনতে হবে না।

—লোক ধরা পড়েছে ?

—পড়বে না !

বিদ্যুৎ বললে, আমি আর দুলাল সকাল-সকাল খেয়েই গাছে উঠে লুকিয়েছিলাম। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি, কে চিঠি দিতে আসে দেখি। অপেক্ষা করছি, অপেক্ষা করছি। চারিদিকে কোনো মানুষের দেখা নেই।

যখন দুটো বেজে গেল তখন আর কেউ আসবে বলে আশা রইল না। গাছ থেকে নেমে পড়ব ভাবছি এমন সময় দেখি একজন ভদ্রলোক এই দিকে আসছেন।

তিনি যে চিঠি দিতে আসছেন, এ আমরা কল্পনাও করিনি। কিন্তু একজন মাতব্বর লোক আসছেন, এই সময়ে আমাদের গাছ থেকে নামতে দেখলে কি জানি কি ভাববেন, হয়তো নানা প্রশ্ন করবেন, এই ভয়ে গাছের উপরই লুকিয়ে রইলাম। উদ্দেশ্য তিনি চলে গেলে নামব।

ও হরি ! তিনিই নাটের গুরু।

চারিদিকে চেয়ে কোটরের মধ্যে একখানি চিঠি রেখে, আবার যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই ফিরে গেলেন।

লজ্জায় আমরা পরস্পরের দিকে চাইতে পারি না।

অনেকক্ষণ পরে নামলাম।

দুলাল দাঁড়াল না। মাথা নীচু করে চলে গেল। আমি কোটর থেকে চিঠিখানা বার করলাম।

জিগ্যেস করলাম, কি লেখা ছিল ?

—জানি না। না-পড়েই কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

অবাক কাণ্ড।

বললাম, কিন্তু লোকটা কে আমার তো জানা দরকার।

বিদ্যুৎ হাসল : কি হবে জেনে ?

—বাইরের লোক, না এই কলোনীর লোক ?

—এই কলোনীর।

—তা হলে তিনি নিশ্চয়ই।

—নিশ্চয়।

বললাম, তাহলে তো আমার জানা দরকার। ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক থাকা দরকার।

বিদ্যুৎ কাঁচুমাচু করতে লাগল: সে আর শুনতে হবে না রঞ্জনাদি। কেন মিছিমিছি মন খারাপ করবেন?

—মন খারাপ করব! মন খারাপ করব কেন?

—সে লোকের নাম জানলে মন খারাপ হবে। আমাদেরও হয়েছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

তবে তো জানতেই হবে। কৌতূহল আমার শিরায় শিরায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

জিগ্যেস করলাম, কি রকম লোক একটা আন্দাজ দেবে? তোমাদের বন্ধুবান্ধব?

বিদ্যুৎ হোহো করে হেসে উঠল: আমাদের পিতৃতুল্য।

চমকে উঠলাম: বল কি?

—হ্যাঁ। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। প্রবীণ লোক। বৃদ্ধ বললেই চলে।

সে আবার কি!

মনে মনে ভাবতে লাগলাম। প্রবীণ লোক, বৃদ্ধ বললেই চলে এমন লোক এই কলোনীর প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই আছে। তাঁদের প্রায় সকলকেই চিনি। অনেকের সঙ্গে কথাও বলি। এমন কোন্ লোকটির মনের মধ্যে এই পাপ রয়েছে, একটি একটি করে হিসেব করতে লাগলাম।

একজন লোককেও খুঁজে পেলাম না যাঁর চোখের কোণে, ঠোঁটের কোণে, বাক্যে অথবা ব্যবহারে সেরকম কোনো ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকতে পারে।

না। এরকম কাউকে মনে করতে পারলাম না।

বললাম, এরকম কোনো লোককে ভাবতে পারছি না।

বিদ্যুৎ বললে, ভালো কথা রঞ্জনাদি, আচ্ছা, এই কলোনীর কোনো প্রবীণ লোক আপনার সঙ্গে গায়েপড়ে গল্প করা, কি রসিকতা করার চেষ্টা করেনি কখনও?

অনেকক্ষণ ভাবলাম।

বললাম, না।

—কেউ কোনোদিন না? ভালো করে ভেবে দেখুন।

ভালো করেই ভেবে দেখলাম। না, কোনো লোক নয়।

বিদ্যুৎ বললে, কি আশ্চর্য! বুড়ো কি ভেবেছিল গাছতলায় আপনার কাছে প্রাণের কথা বলবে? তার আগে কোনোরকম জমি তৈরি করেনি?

—না বলেই তো মনে হয়।

তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে বললাম,কিন্তু তার নামটা আমাকে বলতেই হবে বিদ্যুৎ। আমি কোনোদিন কাউকে বলব না। দিব্যি করছি। ভবিষ্যতের জন্যে নামটা আমার জানা দরকার। বুঝতে পারছ না?

—নিতান্তই শুনবেন?

—হ্যাঁ।

—দুলালের বাবা।

কানের কাছে বজ্রপাত হলেও মানুষ এতখানি স্তম্ভিত হয় না। সামলাতে সময় নিলে।

বললাম, বল কি বিদ্যুৎ, এ কখনও হতে পারে?

—তাই তো চোখে দেখলাম।

—তিনি যে আমাকে মা ছাড়া ডাকেন না।

—তাহলেও চিঠি ওঁরই লেখা। দুলালের অবস্থার কথা ভাবুন। সে কি রকম হয়ে গেছে যেন।

হবারই কথা। আমিই কি রকম হয়ে গেলাম যেন। বিদ্যুৎকে বিদায় করে নিঃশব্দে ভাবতে বসলাম।

পাঁচ ॥

বিদ্যুৎ অমন করে বললে বটে, কিন্তু চিঠির উৎপাত একদিনের জন্যেও বন্ধ হল না। প্রতিদিনই বিকেলে যখন স্কুল বসে, গিয়ে দেখি কোটবের মধ্যে একখানি চিঠি নিয়মিতভাবে আমার জন্যে অপেক্ষা কবছে।

দুলাল স্কুলের জন্যে যেমন খাটছিল তেমনি খাটছে। কিন্তু কি জানি কেন, আমাকে সে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। বিশেষ প্রয়োজনে আমাব কাছে এলে, কাজের কথা শেষ করেই যত তাড়াতাড়ি পারে চলে যায়। ও জানে না চিঠির লেখকের নাম আমি জেনে ফেলেছি। ও নিশ্চিত যে বিদ্যুৎ কখনই পত্রলেখকের নাম আমার কাছে প্রকাশ করেনি। সংকোচটা ওর নিজের মনের মধ্যেই কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

বিদ্যুৎকে একদিন চিঠির কথা ফের বললাম।

বিদ্যুৎ বললে, লোকটাকে তো জানা গেছে। গলিতনখদন্ত একটা লোক। ও নিয়ে তুমি আর মাথা-খারাপ কোর না।

—মাথা-খারাপ করিনি। কিন্তু আমার খুব আশ্চর্য লাগছে। ওই গলিতনখদন্ত লোকটা সত্যি কি বলতে চায়?

—ভগবান জানেন।

বুড়োর সঙ্গে বাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে ইচ্ছে করেই আমি দাঁড়াই। হেসে দুটো কথা বলি:

—স্নান করতে চলেছেন?

—হ্যাঁ মা। স্নানটা সেরে আসি।

—দেরি হল যে!

বুড়ো বাঁ কাঁধের গামছাটা ডান কাঁধে নিয়ে দাঁতন করতে করতেই হেসে বলে, একবাব কলকাতা যেতে হয়েছিল। সেইজন্যেই দেরি।

—আপনি কেন গিয়েছিলেন? ছেলেদের কাউকে পাঠালেই তো পারতেন।

ফোঁকলা দাঁতে হা হা করে বুড়ো হেসে ওঠে: তোমরা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা পরের কাজে বুক দিয়ে পড়তে পার। নিজের কাজে নয়। আমি গিয়েছিলাম নিজের কাজে।

অপবাদটা বিনাপ্রতিবাদে গায়ে মেখে নিলাম। বললাম, তাই বুঝি? তা, বললে আপনার ছেলেরাও যেত।

—যেত না। বলত, ওরে বাপ, আজ ইস্কুলের জন্যে রিলিফ আপিসে একবার যেতেই হবে। আজ পারব না।

বুড়ো আবার তেমনি করে হাসতে লাগল।

বললে, কি জান মা, বসে থাকতে ভালো লাগছে না। ভাবছি কিছু করা দরকার। দেশে আমার একখানা মুদিখানার দোকান ছিল। এখানেও তো লোকজন ক্রমে ক্রমে হচ্ছে। চাল-ডাল-নুন-তেলের দরকার সকলেরই। তাই ভাবছি এখানে একখানা মুদিখানার দোকান করলে কেমন হয়।

উৎসাহের সঙ্গে বললাম, খুব ভালো হয়। চার পয়সার তেল আনতে সবাইকে এক মাইল হাঁটতে হয়। বাড়ির কাছে দোকান হলে সবাই বেঁচে যাবে।

—তুমিও তাই বল?

—বলি বই কি।

—কিন্তু একটা অসুবিধা আছে।

—কি অসুবিধা?

বুড়ো ধীরে ধীরে বললে, বলতে গেলে সবাই নিজেদের মধ্যে। সকলের অবস্থাও যে বিশেষ সচ্ছল তা বলা যায় না। ধারে দিতেও হবে। কিন্তু তারপরে টাকাটা আদায় হবে কিনা।

কথাটা শেষ না করেই বুড়ো হেসে উঠল। তার সঙ্গে আমিও।

—তা যা বলেছেন, বাকি আদায় করা কঠিন হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাইনের ব্যাপারেও দেখছি কিনা।

—এই তো, এই তো। ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমিও একজন ভুক্তভোগী। সেই কথাটাই ভাবছি মা। তোমার সকালের পাঠশালা হয়ে গেছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আবার তো সেই বিকেলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো ?

—অসুবিধা যেটুকু টাকাপয়সার ব্যাপারে।

মনে মনে বললাম, আর অসুবিধা তোমাকে নিয়ে। কিন্তু সে তো আর মুখে বলা যায় না।

—সরকারী সাহায্য পাওয়া গেলে আশা করি ও অসুবিধাটুকু থাকবে না।

—তাই তো সবাই বলছে। দেখি, কি কদ্দূর দাঁড়ায়।

চলে এলাম। আশ্চর্য, বুড়োর কথাবার্তা অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ! মা ছাড়া কথা নেই। আকারে-ইঙ্গিতেও ভিতরের দুষ্টবুদ্ধির কোনো প্রকাশ নেই। অথচ ওই ধরনের চিঠির লেখক যে বুড়ো স্বয়ং, তার প্রমাণ তার নিজেরই ছেলে।

বুড়ো আমাকে সত্যিই ভাবিয়ে তুললে।

কি ওর মতলব ? কেন ওইরকম চিঠি দেয় ? ওর কি আর কিছু চাইবার বয়স আছে ? এটা কি নিছক পাগলামি নয় ?

এক একবার মনে হয়, একদিন স্কুলের পরে গাছতলায় অপেক্ষা করে দেখাই যাক না, বুড়ো কি বলে!

কিন্তু গাছতলায় অপেক্ষা করারই বা দরকার কি ? কলোনীর মধ্যে, কলোনীর বাইরে কতদিনই তো দেখা হয়েছে। নির্জনেই দেখা হয়েছে। একটু আগেই তো নির্জনে দেখা হল।

বলবার কিছু থাকলে স্বচ্ছন্দে বলতে পারত। গাছতলায় বলবার দরকার ছিল না।

(পুরুষের মনে পাপ জমলে, কিছু বলবার আগেই মেয়েরা একটা সহজাত বুদ্ধিতে তা পূর্বাহ্ণেই টের পায়।) আশ্চর্য, বুড়োর সঙ্গে কত দিন, কত জায়গায়, কত ভাবে দেখা হয়েছে। ওর কথা, ওর চোখের চাউনি থেকে, কি চালচলনে সেবকম কোনো সন্দেহ আমাব মনে ওঠেনি।

বিশেষ করে চিঠির ব্যাপারটার পরে কতদিন গায়েপড়ে ওর সঙ্গে আলাপ করেছি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর হাবভাব লক্ষ্য করবার চেষ্টা কবেছি। না, কোনোদিন কোনো সন্দেহ জাগেনি। এই বয়সের একজন লোক তাব মেয়েব বয়সী একটি মেয়ের সঙ্গে যেমন স্বাভাবিকভাবে কথা বলে, কোনোদিন তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিনি।

সত্যি কথা বলতে কি, বুড়ো আমার কাছে একটি প্রকাণ্ড হেঁয়ালিতে পরিণত হয়েছে। এবং যতই রকমের-রকমের চিঠি পাচ্ছি, হেঁয়ালিও ততই প্রকাণ্ডতর এবং জটিলতর হচ্ছে।

আমাব উপর ওব কি কোনো অনুবাগ আছে? অথবা বিরাগ? কেন অকারণে এমন করে প্রত্যহ চিঠি লিখে আমাকে উত্ত্যক্ত করছে?

দিন দশেক পরে।

বিদ্যুৎ এবং দুলাল হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত: যেতে হবে।

কোথায়?

রিলিফ আপিসে। কলকাতার বড় আপিস থেকে সাহেব এসেছে, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে হবে। উপায় নেই।

উপায় নেই সত্যিই। সাংসারিক অনটন আরম্ভ হয়েছে।

বাবার বেগুনের ক্ষেত থেকে গুটিকয়েক করে বেগুন প্রত্যহ পাওয়া যায়। আর শাকের ক্ষেত থেকে শাক। কিন্তু শুধু তাইতেই তো হয় না। ডাল ছেড়ে দিলেও চাল আছে, নুন আছে, তেল আছে। সেগুলো পয়সা দিয়ে কেনা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু পয়সা কোথায়? ঋণের টাকার মোটা অংশ জমি আর বাড়িতে গেছে। তলানি যেটুকু পড়ে আছে তাই দিয়ে কোনোরকমে চলছে। কিন্তু সেই বা ক'দিন?

বাবা বায়না ধরেছে ট্রেনে ফেরি করতে বেরুবে।

মায়ের আপত্তি নেই। কিন্তু সেবারে সেই অজ্ঞান হওয়ার পর থেকে বাবার শরীর যে ঠিক সুস্থ হয়েছে এমন মনে হয় না। একটুক্ষণ পরিশ্রম করলেই দশ মিনিট মাথায় হাত দিয়ে বসে। এমন লোককে ট্রেনে ফেরি করতে পাঠাতেও ভরসা হয় না।

যা হয় আমাকেই করতে হবে।

সাহেব যখন এসেছে তখন দেখাই করা যাক। অনির্দিষ্টকাল এমনভাবে চলা যায় না। এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। হয় পাঠশালা থাকবে এবং সেখান থেকে সংসার চালাবার মতো টাকা পাব। নয় পাঠশালা উঠে যাবে, আমাকে অন্য রোজগারের চেষ্টা করতে হবে।

মাইল দুই দূরে রিলিফ আপিস।

সেজেগুজে ওদের সঙ্গে বেরুলাম। মধ্যে একটা জলা পতিত জমি। বর্ষায় জলে ডুবে যায়। তখন অনেক ঘুরে সরকারী সাহায্য আনতে যেতে হয়। এখন জল নেই। মাঝে মাঝে খানিকটা করে জলা জায়গা আছে। সেটুকু ঘুরে পার হতে হয়। উদ্বাস্তু সাহায্য-প্রার্থীদের পায়ে পায়ে একটা সরু রাস্তা বরাবর হয়ে গেছে। সেই পথ ধরে হনহন করে চললাম।

দুপুর নাগাদ আপিসে পৌঁছুলাম।

বহু লোকের ভিড়। ছোট উঠানটা নানা ধরনের প্রার্থীতে গিসগিস করছে। ওদিককার কোণে মেয়েরা বসেছে। নানা ধরনের নানা বয়সের মেয়ে। তারা উত্তেজিতভাবে রিলিফের অব্যবস্থা নিয়ে জটলা করছে।

পুরুষের সংখ্যাই বেশি। তারা সমস্ত উঠান জুড়ে রয়েছে। কথা বলছে, কিন্তু উত্তেজিতভাবে নয়, নিম্নকণ্ঠে। তারা আসল কাজের ফাঁক খুঁজছে।

সাহেবকে দেখলাম না। বোধ হয় ঘরের ভিতর।

বাইরে একটা আরদালি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাকে ধরলাম, সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

শুনে আরদালি হাসলে।

যদি বলতাম ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে চাই, অসুবিধা হত না। কিন্তু রিলিফ আপিসের সাহেবের সঙ্গে দেখা চাট্টিখানি কথা নয়।

হাসবেই তো।

কথা না বলে লোকটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। কি মনে করে আবার সামনে এসে দাঁড়াল। তীক্ষ্মদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, দিদিমণিকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

আমারও মনে হচ্ছিল চেনা-চেনা। বললাম, আরদালি সাহেব, আমাকে চিনতে পারছেন না?

—বড় আপিসে দেখেছি মনে হচ্ছে, নয়?

—দেখেছেনই তো। কতবার দেখেছেন।

— তাই বটে আপনার নামটা কি যেন?

—রঞ্জনা। কিন্তু কত মেয়েই তো আসা-যাওয়া করে। নাম কি সাহেবের মনে আছে?

—আছে। সাহেবের মনে রাখার অসম্ভব ক্ষমতা। দাঁড়ান আমি দেখছি।

আরদালি হেসে চলে গেল।

উৎসাহের সঙ্গে বিদ্যুৎ জিগ্যেস করলে, সাহেবের সঙ্গে চেনা আছে না কি?

—চেনা আর কি! ঋণ নেবার সময় অনেকবার যেতে তো হয়েছিল। তাই আর কি। কিন্তু কত সাহেবই তো আছে। আমার চেনা সেই সাহেব কিনা জানি না তো। আরদালিকে দেখে মনে হচ্ছে সেই সাহেবই হবে।

—লোক কেমন?

অত উদ্বেগের মধ্যেও হেসে ফেললাম: তখন তো ভালোই ছিলেন। এখন কেমন হয়েছেন কে জানে।

আমার কথা শেষ হবার আগেই আরদালি বেরিয়ে এল।

—একটু অপেক্ষা করুন। এইখান থেকে নড়বেন না। এই ভিড়টা কমলেই আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব।

—চিনতে পারলেন?

—পারবেন না? নাম ওঁর ভুল হয় না।

বলেই ওদিকে ছুটে চলে গেল।

কুড়ি মিনিট কি আধ ঘণ্টা হবে। আরদালি ছুটতে ছুটতে এসে বললে, আসুন।

আমার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎরাও যাচ্ছিল।

আরদালি জিগ্যেস করলে, আপনাদের কি?

—ওই একই ব্যাপার। একসঙ্গেই এসেছি।

—আচ্ছা। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। সাহেব হুকুম করলেই আপনাদের নিয়ে যাব।

ওরা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল।

ঘরের ভিতর ঢুকে দেখি আমার সেই সাহেবই। ধুতি-চাদর পরা সাহেব। মুখখানি সব সময়ই হাসি-হাসি।

বললেন, কি ব্যাপার? আর যে দেখাই নেই।

বললাম, কি করে দেখা করি বলুন। এত দূরে এসে পড়েছি তার ওপর নানা ঝামেলা।

হেসে বললেন, ঝামেলা থাকলেই তো আমাদের সঙ্গে দেখা হয়। যত বেশি ঝামেলা তত ঘন ঘন দেখা। আমি ভাবলাম, তুমি বোধহয় বড়লোক হয়ে গেছ।

বললাম, আমি আর কি কবে বড়লোক হব বলুন।

—মেয়েরা কি করে বডলোক হয় তার আমি কি জানি। ভেবেছিলাম হয়েছ।

সাহস আমারও বেড়ে গেল। বললাম, জানতে পারতেন বইকি। বড়লোক হলে তো আপনাদের অনুগ্রহেই হতাম। বলতে পারেন কতজনকেই তো অনুগ্রহ করতে হয়, সকলের খবর কি খেয়াল থাকে?

সাহেব হাসতে লাগলেন। বললেন, খুব শোনাচ্ছ দেখছি। বল কি ব্যাপার?

বললাম, ব্যাপার একটা স্কুল কবেছি।

—তুমি?

—আমাদেব কলোনীর সকলে মিলে। আমি তার একমাত্র শিক্ষিকা।

—ছাত্র হয়েছে?

—উনিশ জন।

—মন্দ কি!

—মন্দের মধ্যে এইটুকু যে, আপনার অনুগ্রহ না পেলে তো স্কুল রাখা যাবে না।

সাহেব প্রসন্নহাস্যে বললেন, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। সঙ্গে আর কেউ আছে? না তুমি একাই এসেছ?

—স্কুল কমিটির মেম্বাররা আছেন। ডাকব?

—তোমাকে ডাকতে হবে না। 'আমিই ডাকতে পাঠাচ্ছি।

আরদালি বিদ্যুৎদের ডেকে নিয়ে এল।

ওদের দেখামাত্র সাহেবের মেজাজ সাহেবী হয়ে গেল।

—স্কুল করেছেন ?

—হ্যাঁ স্যার।

—টাকাপয়সা আছে ?

—কোথায় পাব স্যার ?

—তাহ'লে স্কুল চলবে কি করে ?

—আপনি অনুগ্রহ করলে চলবে। নইলে চলবে না।

—আপনাদের কি ধারণা, গবর্নমেণ্ট আপনাদের জন্য তোশাখানা খুলে দিয়েছেন ? আপনাদের খেতে দিতে হবে, পরতে দিতে হবে তার ওপর স্কুলও করে দিতে হবে ?

বিদ্যুৎ খুব চটপটে ছেলে। হাত জোড় করে বললে, তা নইলে বাঁচব কি করে স্যার ? শুধু খেয়ে-পরেই তো বাঁচা যাবে না। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়াও শেখাতে হবে। বড়দের জন্যে লাইব্রেরী খুলতে হবে। রোগীদের জন্যে হাসপাতাল। সবই চাই তো স্যার।

সাহেব হেসে ফেললেন।

বললেন, আপনাদের শিক্ষিকার জন্যে বেতন মঞ্জুর করে দোব। স্কুল বসে কোথায় ?

—একটা গাছতলায়।

—গাছতলায়! বর্ষা নামলে কি করবেন ?

—ঘর কোথায় পাব স্যার ?

—টাকা পেলে একটা ঘর করে নিতে পারবেন ?

—নিশ্চয় পারব স্যার।

—ছাত্ররা বসে কিসে ?

—চাটাইএ স্যার।

—সুতরাং চেয়ার-বেঞ্চও তো দরকার। একটা ব্ল্যাকবোর্ডও। ছাত্রদের বই-খাতা-পেন্সিল কি করে হয় ?

—আপনারা যে চাল দেন তাই বাঁচিয়ে। পেটে মেরে। আর পাব কোথায় স্যার?

সাহেব হেসে উঠলেন: তাহলেই দেখুন একটা স্কুল নিয়ে গবর্নমেণ্টকে কত টাকার ফেরে ফেললেন।

দুলাল বললে, এর আর ফের কি স্যার? গবর্নমেণ্টের তো নোট ছাপালেই টাকা। আর কয়েকখানা বেশি ছাপালেই হবে।

এবারে সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন: আপনাদের কি তাই ধারণা নাকি?

—আজ্ঞে তাই তো ধারণা।

—অত সহজ নয় মশাই। যাই হোক,—বলে আমার দিকে চাইলেন,—আপনি যত শিগগির সম্ভব শিক্ষিকার বেতন, স্কুলের ঘর, আসবাবপত্র, ছাত্রদের বই ইত্যাদি বাবদ কত লাগবে, একটা এস্টিমেট নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

—কলকাতায়?

—হ্যাঁ। শনিবার বিকেলের দিকে যাবেন বরং।

সেই শনিবারের বিকেল! অর্থাৎ যখন আপিসের লোকজন বাড়ি চলে যাবে, আপিস খালি হয়ে যাবে, এস্টিমেট নিয়ে আলোচনা করার সেইটেই প্রকৃষ্ট সময়!

বললাম, তাই হবে।

রাস্তায় নেমে বিদ্যুৎ, দুলাল, এরা তো সব নাচতে লাগল।

বিদ্যুৎ বললে, এই সাহেবের কাছে কতবার যে সেলাম ঠুকিছি তার শেষ নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা হত না। 'আজ সাহেবের সময় হবে না, অন্যদিন আসবেন।' যেদিন দেখা হত সেদিন ধমকই খেতাম বেশি। কাজ কিছুই হত না।

দুলাল বললে, আজ গোড়া থেকেই মেজাজটা খুব সরিফ। এরকম হবে আমি জানতাম।

চমকে উঠলাম। দুলাল ঠিক কিঁ ইঙ্গিত করছে বুঝলাম না। জিগ্যেস করলাম, কি করে জানতে ?

দুলাল বললে, জানতাম।

—কি করে জানতে তাই জিগ্যেস করছি।

—কি করে জান ? আমি যেদিন যে কাজে ওই গয়লাদের বৌটার মুখ দেখে গিয়েছি, সেই কাজেই সফল হয়েছি।

বুকের ধুকধুকি থামল।

—আজ কি ওরই মুখ দেখে বেরিয়েছিলে ?

—মনে নেই ? তুমি যে কথা কইলে ওর সঙ্গে।

তাই বটে। খেয়াল ছিল না।

হেসে বললাম, কিন্তু সাহেবের মিষ্টি কথা শুনে মনে কোর না কাজ হাঁসিল হয়ে গেছে। না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

বিদ্যুৎ ও দুলাল দুজনেই বললে, না। গলার স্বরই অন্যরকম। এর আর মার নেই। তোমার সঙ্গে কি আগে আলাপ ছিল রঞ্জনাদি ?

—ছিল একটুখানি। ওই সাহেবই আমাদের ঋণের টাকাটা পাইয়ে দেন।

—ওরকম হয়। চোখে লেগে যায় আর কি! তখন তাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।

বিদ্যুৎ হাসতে লাগল ঃ দেখি তোমার পয়ে যদি স্কুলটা হয়ে যায়। একটা কাজের মতো কাজ হবে তাহলে।

হাত জোড় করে বিদ্যুৎ ভগবানকে প্রণাম জানালে।

দুটি ছেলেই স্কুলের জন্যে খাটছে খুব। নিঃস্বার্থভাবে। স্কুলটা হয়ে গেলে ওদের মতো খুশী কেউ হবে না।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সেই শনিবারের বিকেল এবং যেতে হবে আমাকে।

জিগ্যেস করলাম, সেদিন তোমরাও আমার সঙ্গে যাচ্ছ তো ?

—যাব না ? বা: ।

এ আর একটা মুশকিল।

একবার ভাবলাম, ওদের সঙ্গে নিয়ে যাব না। একাই যাব। সকলেই তো বাবার মতো চোখ-কান বন্ধ করা লোক নয়। আবার ভাবলাম, আমি আর যাব না। কোনো একটা অছিলায় ওদের হাত দিয়েই এস্টিমেণ্ট পাঠিয়ে দেব। স্কুলের অদৃষ্টে যা হবার হোক!

কিন্তু তার জো কি!

সকালে পাঠশালে গিয়ে বসতে না বসতে ওরা এসে হাজির।

—ছেলেমেয়েদের ছুটি দিয়ে দাও রঞ্জনাদি। এস্টিমেটটা করতে হবে।

কাগজ-পেন্সিল সব নিয়ে এসেছে।

—কি রকম এস্টিমেণ্ট করা যাবে রঞ্জনাদি ? মোটা দেখে, না হালকা করে ?

বললাম, মোটা দেখেই করা যাক। কাটছাঁট করে কি দাঁড়াবে বলা তো যায় না।

—সেই ভালো। হালকাব ওপর কাটছাঁট করলে মুশকিল হবে।

মোটা দেখেই একটা এস্টিমেণ্ট করা গেল। কিন্তু কিছুরই সঠিক দাম জানা নেই। ঠিক হল বিদ্যুৎ আর দুলাল কলকাতায় গিয়ে চেয়ার বেঞ্চ ইত্যাদির সঠিক দামটা জেনে আসবে। আপাতত যেটা হল সেটা খসড়া। তাতেই এককালীন দানের পরিমাণ হাজারের উপর উঠল।

—তোমার মাইনে কত ধরা যাবে রঞ্জনাদি ?

—যা হয় ধর।

—পঞ্চাশ ধরা যাক, কি বল ?

—অত কি দেবে ?

শিক্ষিকার বেতন সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার নেই

বললে, ধরা তো যাক। যা হয় দেবে।

—সেই ভালো।

তুলাল বললে, আমি বলে দিচ্ছি রঞ্জনাদি, আমরা যা এস্টিমেট ধরব, সব টাকাই সাহেব দেবে।

—তাহলে তো গয়লাদের বৌটিকে যাবার পথে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়।

—তা তো হবেই। তার ভার তোমাকেই নিতে হবে। কিন্তু তা ছাড়াও দেখবে, তুমি যে টাকা চাইবে, সাহেব সেই টাকাই দেবে।

তুলাল এবং তার সঙ্গে বিদ্যুৎও এমন করে হাসতে লাগল যেটা আমার ভালো লাগল না। আমার সন্দেহ হল, সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ওরা খুব সম্ভব আন্দাজ করেছে। ভারি লজ্জা পেলাম।

কিন্তু চিঠির ব্যাপারটা নিয়ে ওদের সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়ে এসেছিল।

কাগজগুলো দিয়ে বিদ্যুতের মাথায় আঘাত করে কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললাম, খুব ফাজিল হয়েছ, না? ওরকম করলে আমি যাবই না।

—ওরে বাপ! তাহলে তো স্কুলের দফা রফা। তুমি না গেলে কিছুই হবে না।

মনে মনে বললাম, যাকগে। এ একরকম ভালোই হল যে ওরা একটা আন্দাজ পেয়েছে। সংকোচের আর কোনো অবকাশ রইল না। অঞ্জনা জানে, খঞ্জনা জানে। না হয় এরা তুজনও জানল। সে আর এমন কি!

॥ ছয় ॥

বিদ্যুৎ এবং দুলাল আমার সঙ্গে গিয়েছিল। ওরা অবশ্য ভিতরে ঢুকতে পায়নি, বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। যখন বললাম, এস্টিমেটে ভুল ছিল, ওদের চক্ষুস্থির!

—তাহলে?

বললাম, ঘর তৈরির যে খরচ ধরেছ, ওই টাকায় ঘর তৈরি হয়?

—হয় না?

—না। চেয়ার-বেঞ্চির দামও ঠিক ধরা হয়নি।

বিদ্যুৎ তিক্তকণ্ঠে বললে, আর পারছি না বাপু। ওরা যা দেবার দিক, গতরে খেটে আমরা তাতেই কুলিয়ে নোব।

—তা বলতে পার।

বলে ওদের মঞ্জুর-করা নতুন এস্টিমেটটা দেখালাম। দেখে আর এক দফা ওদের চক্ষুস্থির!

যেখানে আমরা এককালীন দান হাজার টাকা ধরেছিলাম, এবং অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে, সেখানে সাহেব মঞ্জুর করেছেন দু'হাজার, —আরও এক হাজার বেশি। আর মাসিক বেতন বাবদ মঞ্জুরি চাওয়া হয়েছিল পঞ্চাশ, সেখানে আরও পঁচিশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে!

আনন্দে ওরা দুইজনেই চীৎকার করে উঠল, রঞ্জনাদি!

—কি?

—করেছ কি?

বললাম, সাহেব বললে, খরচ ঠিকই ধরা হয়েছে। কিন্তু ঠিক ধরলে তো হবে না। সরকারী সাহায্য আবার কবে পাবে তার ঠিক নেই। যেটা বাঁচবে সেটা কারও নামে দান বলে স্কুলের হিসেবে জমা করে রেখ।

—সত্যি কথা বলেছেন। রঞ্জনাদি।

—কি ?

—তোমার তুলনা নেই।

গৌরবে, গর্বে পুলকিত হয়ে উঠলাম।

ঋণ নেবার সময় যখন বাবার সঙ্গে এই আপিস থেকে ফিরছিলাম তখন লজ্জায়, ক্ষোভে মাথা তুলতে পারছিলাম না। কিন্তু আজ মাথা উঁচু। লজ্জা নয়, ক্ষোভ নয়। পল্লীর একটা পাঠশালা যে করে দিতে পারলাম, সেই গর্বে বরং উদ্ধত।

বিদ্যুৎ এবং দুলাল বয়সে আমার চেয়ে সামান্য কিছু ছোটই হতে পারে। তারা অঞ্জনাদের মতো সব জেনে ফেলেছে। সুতরাং অঞ্জনাদের মতো বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। ওদের কাছে আমার আর লজ্জা পাবার কিছুই রইল না।

ভালোই হল। একসঙ্গে কাজ করতে গেলে মাঝখানে লজ্জা-সংকোচের পর্দা না থাকাই ভালো।

পল্লীতে ঢোকার পথে বটতলায় তিনজনে এসে বসলাম।

চাঁদিনী রাত্রি।

পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো আলো এসে পড়ছিল আমাদের মুখে, মাথায়, গায়ে, মাটিতে। হাওয়া দিচ্ছিল ঝিরঝির করে। শরীর যেন জুড়োল।

বিদ্যুৎ মাটির উপরই শুয়ে পড়ল। দুলাল কাৎ মারলে।

বললে, আঃ! এখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

সত্যি।

বললে, রঞ্জনাদি, একটা কথা জিগ্যেস করব ?

—কি কথা ?

—সাহেবের সঙ্গে তোমার কি আগে থেকেই পরিচয় ছিল ?

এই রকম একটা প্রশ্নের জন্যে তৈরীই ছিলাম। বললাম, কি মনে হয় ?

—মনে হয় ছিল।

—ব্যস, ওই পর্যন্ত। আর কোনো কথা জানতে চাইবে না কোনোদিন। তাহলে আমি স্কুলের সম্পর্ক ছেড়ে দোব।

ওরা ব্যস্ত হয়ে বললে, না না। আমরা আর কোনোদিন জানতে চাইব না।

—আর যা জানলে তা কোনোদিন কারও কাছে গল্প করবে না।

—না না।

—অন্তত যে-লোকটি রোজ চিঠি দিচ্ছে তার কাছে কোনোদিন নয়। তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।

—না না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

একটু পরে ওরা জিগ্যেস করলে, টাকাটা ঠিক পাওয়া যাবে তো?

—তা কি করে বলব? তবে ঋণের টাকাটা যখন পাওয়া গেছে তখন এটাও আশা করি পাওয়া যাবে।

—কবে?

হেসে ফেললাম: দাঁড়াও। টাকা পাওয়া এতই সহজ মনে কর? আরও অনেকদিন যেতে হবে, তবে তো।

বিদ্যুৎ বললে, ঘর কোথায় করা যায় বল তো?

—একটা মাঝামাঝি কোনো জায়গায়।

—আমাদের বাড়ির পিছনের মাঠটায় হলে কেমন হয়?

—জায়গাটা কার?

—কে জানে কার। যখন বাধা দিতে আসবে তখন দেখা যাবে।

জায়গাটা আমাদের সকলেরই পছন্দ। কিন্তু টাকাটা আগে পাওয়া যাক তার পরে তো। তখন চিন্তা করে দেখা যাবে।

বললাম, চল। এবারে ওঠা যাক। সাপখোপ থাকতে পারে।

সার্পের নামে ওরা দুজনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বললে, যা বলেছ। মাঠটা ভালো নয়। চল, বাড়ি ফেরা যাক। কাল সকালে আবার বসা যাবে। কিংবা, সকালে তোমার স্কুল আছে, দুপুরে।

সমস্ত সকালটা ঘুরেছি স্কুলের জায়গা পছন্দ করতে। পল্লীর লোকেরা আন্তরিকভাবে স্কুল চায়। কিন্তু সমস্ত লোকই নানা সমস্যায় বিব্রত। ইচ্ছা থাকলেও স্কুলের জন্যে খাটবার সময় কারও নেই। কিন্তু সবাই যখন শুনলে স্কুলের জন্যে সরকার থেকে মোটা টাকা পাওয়া যাচ্ছে, স্কুলের বাড়ি হবে, চেয়ার-বেঞ্চ হবে, ছাত্রদের মাইনে তো লাগবেই না, পড়ার বই পর্যন্ত বিনা পয়সায় পাওয়া যাবে, তখন সকলেই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল।

সুতরাং স্কুলের জায়গা পছন্দ করতে যখন বেরুলাম তখন গোটা পল্লীর লোক আমাদের সঙ্গে। কেউ বলে এ জায়গাটা ভালো, কেউ বলে ও জায়গাটা। সবাই নিজের নিজের বাড়ির কাছে স্কুল বসাতে চায়।

সে এক বিভ্রাট।

এ জায়গা পছন্দ করলে উনি চটবেন, ও জায়গা পছন্দ করলে ইনি। কার মন যোগাতে গিয়ে কাকে চটাই?

বলতে গেলে সমস্ত সকালটা এই করেই নষ্ট হল।

বিকেলে আমরা স্কুলের গাছতলায় গিয়ে বসলাম: কি করা যায়? এবারে আর ভিড় নয়, আমরা তিনজন শুধু। বিদ্যুৎ, দুলাল আর আমি।

স্কুল সম্বন্ধে যার যত কম উৎসাহ ছিল, বাড়ির কাছে স্কুল বসাতে তারই রোখ তত বেশি। এবং একজনের রোখ অন্যজনের মনে রোখের সঞ্চার করে।

আমরা ভয় পেয়ে গেলাম।

—কি করা যায় রঞ্জনাদি ?

—তাই তো ভাবছি।

কিন্তু ভেবে কোনো কূলকিনারা কেউই দেখতে পাই না। কাউকে আমরা চটাতে চাই না। কিন্তু সকলকে খুশী করারও কোনো পথ দেখি না।

বিদ্যুৎ তো এমন ভড়কে গেছে যে বলে বসল, শেষ পর্যন্ত স্কুল হবে না রঞ্জনাদি।

—টাকাপয়সা পাওয়ার পরেও ?

—হ্যাঁ। সব চেয়ে মজার খবর শুনেছ, এই স্কুল নিয়ে আমাদের এই বিশ-পঁচিশ ঘরের কলোনী দুটো পাড়ায় ভাগ হয়ে গেছে।

এটা নতুন খবর।

বললাম কি রকম ?

—এই বটগাছের ওদিকটা হয়ে গেছে উত্তরপাড়া, আর এই দিকটা দক্ষিণপাড়া।

—তারপরে ?

—উত্তবপাড়ার লোকেরা বলছে স্কুল তাদের পাড়ায় যদি হয় তো হোক, নইলে হয়ে কাজ নেই। তারা আমাব কাছে এসেছিল, কেন না আমি উত্তরপাড়ার লোক।

বিদ্যুৎ হাসতে লাগল।

বললাম, দক্ষিণপাড়ার লোকেরাও তাই বলছে নিশ্চয় ?

—তোমার কাছে যায়নি তারা ?

—না।

—যাবে। কারণ তুমি দক্ষিণপাড়ার লোক। যতদূর শুনেছি, তাদেরও জেদ সমান।

—কি হবে তাহলে ?

—স্কুল হবেই।

—কি করে ?

হুলাল বললে, এক কাজ করা যায়।

—কি কাজ?

—এই গাছতলায় স্কুল করা যাক। দুই পাড়ারই কথা থাকবে। এটা দুই পাড়ারই মাঝামাঝি।

উৎসাহে আমরা করতালি দিয়ে উঠলাম: এটা তো মন্দ বলনি দুলাল! চল, দুই পাড়া ঘুরে আসা যাক।

প্রথমে গেলাম উত্তরপাড়া।

দেখলাম, পাঁচকড়ির বাড়ির উঠানে বোধ হয় একটা সভাই বসে গেছে এবং বোধ হয় স্কুল নিয়েই। উচ্চকণ্ঠে কি যেন একটা আলোচনা চলছিল, আমাদের দেখে থেমে গেল।

বললাম, আপনাদের কাছেই এলাম। সবাইকে একসঙ্গে পাওয়া গেল, ভালোই হল।

বললে, কি ব্যাপার?

—স্কুল নিয়ে।

বললে, আচ্ছা গোলমালটা কিসের বুঝিয়ে দাও দিকি। ক'ঘর তো লোক। তার মধ্যে এপাড়া-ওপাড়াই বা কি আর গোলমালই বা কিসের? এপাড়াতেই যদি স্কুল হয়, ক্ষতিটা কি হবে? তার জন্যে জেদাজেদিই বা কিসের?

চমৎকার কথা!

হেসে বললাম, ওঁরাও ঠিক ওই কথাই বলছেন। ওপাড়ায় হলে ক্ষতিটা কিসের? কিসের জন্যে জেদ? মুশকিলে পড়েছি আমরা। বহুকষ্টে টাকাটা যদি পাওয়া যাচ্ছে, আপনাদের দুই পাড়ার জেদা-জেদির ফলে স্কুলটা বুঝি ভেস্তে যায়।

বললে, আমরা ওদের মতো অমানুষ নই। আমাদের কোনো জেদাজেদিও নেই। আমরা শুধু বলছি, স্কুলটা এই পাড়ায় হোক, নয় তো হয়ে কাজ নেই। ব্যস।

উত্তরপাড়া শেষ রায় দিয়ে দিলে।

বললাম, সেইজন্যে আমরা বলি কি, গাছতলায় যেখানে স্কুল হচ্ছে ওইখানেই হোক। দুই পাড়ার মাঝামাঝি জায়গা। দুই পাড়ারই জেদ বজায় থাকবে।

বললে, তাই বা হবে কেন? এপাড়ায় হলে ওদের বুকের ওপর কি তপ্ত ভাতের হাঁড়ি নামান হবে, বুঝিয়ে দাও।

—তা বুঝিয়ে দিতে পারব না।

আমার দিকে চেয়ে একজন বললে, কেন পারবে না? তুমি তো দক্ষিণপাড়ার লোক।

—আজ্ঞে না, আমি দুই পাড়ারই লোক। কিন্তু কোনো পাড়ার জেদের মধ্যে নেই।

উত্তেজিতভাবে একজন প্রবীণ ব্যক্তি বললে, তোমাকে তো বলছি বাপু, আমাদের কোনো জেদ নেই। কিন্তু ওদের অন্যায় জেদ কেন সহ্য করব সেইটে বুঝিয়ে দিতে হবে।

হেসে বললাম, কিন্তু মাঝখানে স্কুল হলে তো জেদের কিছু রইল না।

—রইল বইকি। ওদের জেদের জন্যেই তো এপাড়ায় হল না।

সকলের দিকে চেয়ে বললে, তোমরা কি বল?

সকলে বললে, তা ছাড়া আর কি?

—তাহলেই বোঝ, মাঝখানে স্কুল হলেই বা আমরা শুনব কেন, তার মধ্যে থাকবই বা কেন? তাতে আসলে তো আমাদেরই হার হল।

হতাশভাবে আবার গাছতলায় ফিরে এলাম।

নিঃশব্দে বসে আছি।

কারও মুখে কোনো কথা নেই। তিনজনেরই মনের মধ্যে একটা কথা তোলপাড় করছেঃ স্কুলটা বুঝি আর হয় না। ঘাটের

কাছে এসে বুঝি নৌকা ডোবে। এতদিন ধরে যে পরিশ্রম করা গেল, সবই পণ্ডশ্রমে দাঁড়াল!

ভাবছি, এমন সময় দেখি অঞ্জনা আর খঞ্জনা আসছে এইদিকে। ওরা বোধ হয় আমাদের বাড়ি গিয়েছিল প্রথমে। সেখান থেকে খবর পেয়ে এখানে।

দুলালরা জিগ্যেস করলে, কে ওঁরা?

—আমার দুটি বন্ধু। একসঙ্গে শেয়ালদা স্টেশনে অনেকদিন কাটিয়েছি।

ওরা এসে পড়ল।

—গাছতলায় কি হচ্ছে?

আনন্দে ওদের জড়িয়ে ধরলাম, গাছতলাই শেষ পর্যন্ত সার করলাম ভাই।

অঞ্জনা বললে, ভালো করেছিস। ওর তুল্য জায়গা নেই। বিশেষ যদি গঙ্গার ধারের গাছতলা হয়।

বললাম, চল, বাড়ি চল। তোদেরই আমি খুঁজছিলাম। অনেক কথা আছে।

ওরা বললে, তাহলে এইখানেই বলে ফেল। আর তোর বাড়ি যাব না। সেইখান থেকেই আসছি।

—একটু চা তো খাবি।

—তাও খেয়ে এসেছি। তোর মা ছাড়েননি। এখান থেকে সটান স্টেশন চলে যাব।

বিদ্যুৎ এবং দুলাল বললে, তাহলে আমরা যাই রঞ্জনাদি। সন্ধের পর দেখা হবে।

—আচ্ছা!

ওরা চলে যেতে অঞ্জনা বললে, কে রে ওরা?

—এই কলোনীর দুটি ছেলে। জানিস, এখানে একটি স্কুল করেছি। আমিই তার একমাত্র শিক্ষিকা।

—তাই নাকি ? মাইনে পাস ?

—এখনও পাইনি। আশা হচ্ছিল পাব। কিন্তু আবার ভয় হচ্ছে পাব না বুঝি।

হাসলাম।

—তার মানে ?

—তার মানে যতদিন সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়নি, কারও পাত্তা ছিল না। এখন তার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এসে জুটেছে।

—তারপরে ?

তারপরে যেমন কবে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হল, সেই ইতিহাস। কলোনীতে দুটো পাড়া হয়ে গেছেঃ উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া। উত্তরপাড়া বলছে স্কুল হবে তাদের পাড়ায়। দক্ষিণপাড়া বলছে তাদের পাড়ায়

—বাঃ! তারপরে ? তোরা কি বলছিস ?

—বলছি মধ্যিখানে হোক।

—ওরা রাজী হয়েছে ?

—না।

- কি হবে তাহলে ? তুই কোন্ পাড়াব ?

—দক্ষিণপাড়ার।

—ছেলেদুটি ?

—একটি দক্ষিণ পাড়ার একটি উত্তর পাড়ার। যাকগে সে যা হয় হবে। সাহেবকে মনে আছে ?

—কোন সাহেব ?

—রিলিফ আপিসের সেই সাহেব। সেই তো সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিলে। তোর কথা জিগ্যেস করছিল।

—বলিস কি ? আমার নাম মনে আছে ?

বললাম, আছে। আশ্চর্য ভাই, যার সঙ্গে একবার চেনা হয়েছে, তারই নাম মনে আছে। আমারও তোরও।

—এবং আরও অনেকেরও! এরা কি জানিস, যাকে বলে জন্ম-পাষণ্ড। এর পরে যেদিন যাবি, দেখবি খঞ্জনার কথা জিগ্যেস করবে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ওরাও ঋণ পেয়েছে।

ভালো কথা। কিন্তু মনে একটুখানি খটকা ছিল। জিগ্যেস করলাম, বরুণবাবু জানে না?

অঞ্জনা বললে, তার মত নিয়েই গিয়েছিল।

অবাক হয়ে খঞ্জনার দিকে চাইলাম। সে লজ্জায় মুখ নামাল।

অঞ্জনা বললে, কি করবে? কিছুতেই ঋণ পাচ্ছিল না। কত দিন শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকবে? ঘর সংসার করার সাধ কার নেই বল?

আমরা গল্প করতে করতে স্টেশনের দিকে হাঁটছিলাম। ওদের ট্রেনে তুলে দিয়ে একলাই ফিরছিলাম, এই কথা ভাবতে ভাবতে যে, বরুণ সম্মতি দিলে। পৃথিবীতে এমন ঘটনাও ঘটে!

॥ সাত ॥

আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছিল : সাহেবকে দিয়ে দুই পাড়ার মাঝখানের জায়গাটা পছন্দ করালে বোধ হয় আর কোনো গোলমাল থাকবে না। দুই পক্ষই তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। বিদ্যুৎ এবং দুলাল এই ব্যবস্থা সমর্থন করলে। আমরা আবার একদিন গেলাম সাহেবের কাছে। তিনিও সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং একদিন এসে যথারীতি মাঝের জায়গাটাই পছন্দ করলেন।

আমরা সবাই উৎসাহিত হলাম। ভাবলাম সব গোলমাল মিটে গেল। এবার নিশ্চিন্তে স্কুলের বাড়ি তৈরিতে মন দেওয়া যাবে। আর কোনো আপত্তি উঠবে না।

ও হরি, তার জো কি!

দুই পাড়ায় তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। ভয় হল স্কুল করতে গিয়ে দাঙ্গা না বাধে। সত্যি সত্যি, দুবার দাঙ্গা বাধতে বাধতে বেঁচে গেল। পুরুষদের সঙ্গে পুরুষদের শুধু নয়, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে স্ত্রীলোকদেরও, নল্‌কূপ থেকে জল আনবার সময়। প্রায়ই বাধতে লাগল।

আমরা ভড়কে গেলাম।

কি করব ভাবছি এর মধ্যে ব্যাপার আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। প্রথম দিন একখানা, তারপর থেকে প্রত্যহ কয়েকখানা করে প্রাচীরপত্র বেরুতে লাগল। তাতে আমার নামে সত্য এবং মিথ্যা নানারকম কুৎসা।

প্রথম দিন সকালে উঠে সকলে বিস্মিত হয়ে দেখলে স্কুলের গাছের গুঁড়িতে মস্ত বড় একখানা খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা : সাহেবের সঙ্গে রঞ্জনার কি সম্পর্ক? রঞ্জনার কাছেই খবর নিন।

গাছের গুঁড়িতে আঠা দিয়ে কাগজটা আঁটা।

কেউ দেখেনি কে মেরেছে, কখন মেরেছে। সম্ভবত রাত্রের অন্ধকারে চুপিচুপি কেউ এসে মেরে গেছে।

কিন্তু কে এ কাজ করলে ?

দেখামাত্র সন্দেহ হয়েছিল তুলালের বাবাকে। ইতিপূর্বে বুড়া অনেক চিঠি দিয়েছে। কিন্তু তার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে থাকলেও এর প্রচারক সে নয়, কারণ সেও আমারই মত দক্ষিণপাড়ার লোক। উত্তরপাড়ার বিরুদ্ধে জেহাদে তার পক্ষে আমার বিরুদ্ধাচরণ করা চিন্তার বাইরে।

তাহলে আর কে হতে পারে ?

নিশ্চয় এমন কোনো লোক যে কিছু কিছু ব্যাপার জানে। এবং তুলাল ও বিদ্যুৎ ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। তুলাল দক্ষিণপাড়ারই লোক। সুতরাং সে হতে পারে না। বিদ্যুৎ যদিও উত্তরপাড়ার লোক, কিন্তু উৎসাহী কর্মী হিসাবে স্কুলের ক্ষতিকর কোনো কাজ কখনই করবে না।

তাহলে কে ?

তুলাল লোকটাকে ধরবার জন্যে খুব চেষ্টা করতে লাগল। একা, চুপি চুপি। এমনকি বিদ্যুৎকেও না জানিয়ে।

কিন্তু ধরা গেল না।

প্রথমত একই জায়গায় রোজ আঁটে না। আজ এখানে, কাল অন্য এক জায়গায়। মারবার সময়ও ঠিক এক নয়। সুতরাং ধরা কঠিন। তবে এ পর্যন্ত নিশ্চিত যে কাজটা উত্তরপাড়ার লোকেরাই করছে।

কিন্তু আমার উপর উত্তরপাড়ার এত রাগ কেন ? আমি তো কিছু করিনি। সাহেব এসে জায়গা পছন্দ করে গেছে। তাতে আমার, কি বিদ্যুতের, কি তুলালের কি হাত থাকতে পারে ?

আরও আশ্চর্য, যদি আমাদের হাতে থাকেই, তাহলে সকলকে

ছেড়ে দিয়ে, আমি গৃহস্থঘরের মেয়ে, আমার উপর এই অভদ্র আক্রমণ কেন?

অর্ধসত্য যখন শেষ হল, তখন নির্লজ্জ মিথ্য আমার বিরুদ্ধে প্রচার করা হতে লাগল। উত্তেজনা প্রবল হলে কদর্যতার মাত্রা থাকে না। এও তাই হল।

আমি দমে গেলাম বটে, কিন্তু বাইরে তা কাউকে জানতে দিলাম না। সকাল-বিকেল নিয়মিত যাই, ছেলে-মেয়েদের পড়াই, চলে আসি।

বাবা-মা ভীষণ দমে গেল। মা সব চেয়ে বেশি। রীতিমত কেঁদে কেঁদে বেড়াতে লাগল।

বললে, আর ইস্কুলে কাজ নেই। তুই ছেড়ে দে ইস্কুল।

বললাম, দেখি আর কয়েকটা দিন। তারপরে ছেড়ে দেওয়া তো আছেই।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী একটি দুটি করে কমতে লাগল। উত্তরপাড়ার ছেলেমেয়েরা কেউ আসে না। এমন কি বিদ্যুতের ছোট ভাইটি পর্যন্ত আসা বন্ধ করে দিলে

কি ব্যাপার?

বিদ্যুৎ নিজেও আসে না। তারই বা কি হল? সে কি এখানে নেই? না তাকেও জেহাদের ছোঁয়াচ লাগল?

দুলালকে জিগ্যেস করলে সে চুপ করে থাকে।

বললাম, যাও না একদিন বিদ্যুতের কাছে। তাকে ধরে নিয়ে এস না।

দুলাল হাসলে: সে আসবে না।

—কেন?

দুলাল চুপ করে রইল।

—তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

দুলাল ঘাড় বেঁকিয়ে জানালে, হয়েছিল।

—এখানে আসবার কথা বলেছিলে ?

—বলেছিলাম।

—কি উত্তর দিলে ?

—বললে, উপায় নেই।

—কেন ?

—বললে, আমরা তিনজনেই স্কুলটা করলাম। কত ঝড়ঝাপটা গেল। যখন ওদিকের মেঘ কাটল তখন এদিকে আবার মেঘ করে এল। কি করি বল তো ? পাড়ার সবাই শাসাচ্ছে, স্কুলের ধারে-কাছে আমাকে দেখলে আমার ঠ্যাং ভেঙে দেবে। সবাই রেগে বারুদ। এমন কি আমার বাবা পর্যন্ত। দেখি দিনকতক চুপচাপ থাকি তো।

আমি অবাক : এই কথা বিদ্যুৎ বললে ?

দুলাল হেসে বললে, এতে অবাক হচ্ছ ?

—হবারই তো কথা দুলাল।

দুলাল বললে, তাহলে শোন। তোমার নামে প্ল্যাকার্ড লেখার মালমসলা বিদ্যুৎই যোগাচ্ছে।

—কি করে জানলে ? অনুমান করছ ?

—না, অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ। নিজের চোখে দেখা।

হেসে দুলাল বললে, এমনিই হয় রঞ্জনাদি। যেমন করে পাকিস্তান হয়েছে তেমনি করে আমাদের কলোনীও দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কবে জোড়া লাগবে কে জানে !

ভাবলাম তাই হবে। বিচ্ছেদ আমাদের রক্তের মধ্যেই রয়েছে। উপলক্ষ্য পেলে তাকে আর সামলান যায় না।

হঠাৎ দুলাল ডুব মেরে দিলে। তার আর দেখা নেই। তারপর আর এক দিন হঠাৎ এসে উপস্থিত। মুখখানা কঠিন।

আমি তখন একলা বসে ভাবছিলাম স্কুলের কথা। বাইরে বেরুবার উপায় নেই। যেদিকে চাইব, প্রাচীরপত্র। নানা ভঙ্গিতে

লেখা। শুধু যে উত্তরপাড়ার শত্রুপক্ষও সেসব অপবাদে বিশ্বাস করছে তা নয়, দক্ষিণপাড়ার মিত্রপক্ষও সেই সমস্ত প্রাচীরপত্র উপভোগ করতে লাগল। তারাও মুখ টিপে টিপে হাসে। মনে হয় অপবাদে বিশ্বাসও করে। এমন কি অবিশ্বাস্য রকম অপবাদেও।

ম্লানমুখে বললাম, দুলাল ভাই, কি করতে কি হল?

—কি আবার হবে? ওতে কান দিও না।

—শুধু কান হলে তো হত, কান চোখ দুই বন্ধ করে থাকি কি করে? দম বন্ধ হয়ে আসে যে। তারপর দেখ, আমাদের পাড়াতেও এ নিয়ে রসালো কানাঘুষো চলছে!

—জানি।

—তাহলে? কোথায় পালাই বল। আবার শেয়ালদা স্টেশনে ফিরে যাব?

—পাগল!

বললাম, পাগল এখনও হইনি দুলাল ভাই। কিন্তু হতেও বোধ হয় বেশি দেরি হবে না।

—অনেক দেরি হবে। শোন। যে জন্যে তোমার কাছে আসা। স্কুল হবে।

—হবে?—নানা আবর্জনার মধ্যেও মনের ভিতরটা উসখুস করে উঠল।—কোথায় হবে? গাছতলায়?

—না।

—তবে? উত্তরপাড়াতেই? আমাদের পাড়ার সবাই রাজী হবে? আমার আপত্তি নেই।

—না। উত্তরপাড়াতেও না।

—তবে?

—আমাদের দক্ষিণ পাড়াতেই। স্কুল আমরা করছি, আমাদের পাড়াতেই করব। ওরা পারে ওদের পাড়ায় আর একটা স্কুল করুক। আমাদের আপত্তি নেই।

ও কি বলছে আমি যেন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। মূঢ়ের মতো ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

দুলাল হেসে উঠল: আমার কথা বুঝতে পারলে না? বাঙলা করেই তো বললাম।

—তা হোক। আর একবার বল। ঠিক বুঝতে পারলাম না।

দুলাল আর একবার বললে।

বুঝলাম। ভাবলাম খানিকটা।

বললাম, এই ধাক্কাতেই কাৎ হয়েছি। সে ধাক্কা সামলাতে পারবে?

—পারব। আমি কাউকে ভয় করি না।

—কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, আমি যে করি।

দুলাল জোর করে বললে, না। তোমাকে ভয় করতে দোব না। আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব।

হেসে ফেললাম: সে তো আর এক ভয়।

—ভয় কিসের বল? ভয়ের চেয়ে ভরসাই বেশি।

গুনগুন করে বললাম, ভয়ও আছে ভাই। যাকগে, এখন তুমি আমাকে কি করতে বল?

—সাহেবের কাছে কাল যেতে হবে।

—গিয়ে?

—সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে। বলে স্কুলটা দক্ষিণ-পাড়ায় করতে হবে।

—আমার মনে হয় সাহেব রাজী হতে পারে। তুমি কি বল?

—আমারও তাই বিশ্বাস। টাকাটা এতদিনে বোধ হয় পাস হয়ে গেছে। আমাদের টাকা বার করতে বিশেষ দেরি হবে না।

আবার জিগ্যেস করলে, কাল কখন যাব?

—যে সময় যাই। তিনটে-চারটে। কিন্তু আরও ভাববার কথা আছে।

—কি বল ?

—ধর স্কুলের ঘর হল।

—হ্যাঁ।

—ওরা যদি রাত্রে আগুন লাগিয়ে দেয় ?

কঠিন কণ্ঠে দুলাল বললে, ওরা নিজেরা কি দালান ঘরে বাস করে ?

—কি ধর যদি চেয়ার-বেঞ্চ চুরি করে ?

—চুরি করে রাখবে কোথায় ? ধরা পড়ে যাবে না ?

বললাম, তাহলেই তো সেই থানা-পুলিসের ব্যাপার দাঁড়াল। সেও তো কম ঝকমারি নয়।

—ভালো কাজে নামতে গেলে একটু ঝকমারি পোয়াতে হয় রঞ্জনাদি। তোমাকে বলি, আমাদের পাড়ার ছেলেরা একদিন বিদ্যুৎকে মেরে তক্তা বানাতে চায়।

ভয়ে শিউরে উঠলাম: কি সর্বনাশ! নিষেধ করে দিয়েছ তো ? বিদ্যুৎ কি করেছে ?

—তোমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে রঞ্জনাদি, কিন্তু সেই তো এখন লীডার। প্ল্যাকার্ড বল, আন্দোলন বল, সবই তো সেই চালাচ্ছে।

—বিদ্যুৎ! আমাদের বিদ্যুৎ! সে ওই সব নোংরা কথা—

—তাছাড়া আর কে!

গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলাম। পাড়ার ভয়ে আমাদের মধ্যে আসতে পারছে না, দু'একটা রসাল প্রাচীরপত্র চাপে পড়ে লিখছে তাও বুঝি। কিন্তু ইদানিং যে সমস্ত প্রাচীরপত্র বার হচ্ছে তা যেমন নোংরা তেমনি মিথ্যে।

বললাম, বিদ্যুৎ এমন হয়ে গেল ?

—তাই তো দেখছি।

রাগে সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। যাদের ভালো করে চিনি না, জানি না, তাদের নোংরা কাজে তাদের উপর ঘৃণা আসে। কিন্তু

যাকে চিনি জানি, হয়তো একটু ভালোও বাসি, তাদের নোংরা কাজে রাগই হয় বেশি। তার সঙ্গে এত চেনা-জানা, এইরকম নোংরা কাজ সে ক্রমাগত করে যাচ্ছে, এই কথা ভাবতে আমার গা জ্বালা করে উঠল।

দুলালকে বললাম, ঠিক আছে দুলাল ভাই। কাল দুপুরে সাহেবের কাছে যাব। কিন্তু এখানে তোমাকে আসতে হবে না। ওরা সব সময় আমাদের লক্ষ্য রাখছে। স্টেশনে আমাদের দেখা হবে। কি বল?

—বেশ!

বলে দুলাল চলে গেল।

যে বিশ্বাস এবং আশা নিয়ে গিয়েছিলাম, তা পূর্ণ হল।

সাহেব বললে, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। তোমার টাকা ইচ্ছে করলে এখনই নিয়ে যেতে পার। তবে টাকাটা হাতে পেয়ে একেবারে যেন ভুলে যেও না।

হেসে বললাম, তার জো কি? আপনাকে ভুললে স্কুল ডকে উঠবে। টাকা নেওয়ার এই কি শেষ?

—আশা করি শেষ নয়।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে দুলালকে বললাম, চল একটা ট্যাক্সি করে যাই।

ঋণের টাকা পাবার সময়ও ট্যাক্সিতে গিয়েছিলাম। এতগুলো টাকা নিয়ে ট্রামে বাসে যাওয়া নিরাপদ নয় একথা সাহেবই বলে দিয়েছিল।

কিন্তু বিদ্যুতের ব্যবহারে মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলাম। টাকা পাওয়ার কথা দুলালকে তখন বললাম না। কিন্তু দুলাল ধরে ফেললে।

জিগ্যেস করলে, কিছু পাওয়া গেল নাকি ?

—সামান্য কিছু। কাজ চলবার মতো। মাঝে মাঝে এসে নিয়ে যেতে হবে।

—সে মন্দ নয়। কলোনীর যে রকম অবস্থা তাতে একসঙ্গে বেশি টাকা কাছে রাখা নিরাপদও নয়।

ট্যাক্সি পাওয়া কঠিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল একটা। তাইতে চড়ে শেয়ালদা স্টেশন।

গাড়ির কিছু দেরি ছিল।

বললাম, দুলাল ভাই, এইখানে খঞ্জনারা থাকত। এখনও আছে কিনা, একটু ঘুরে দেখে যাই চল।

—চল।

খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না। না পেয়ে খুশীই হলাম। সেদিন অঞ্জনা অবশ্য বলেছিল, ওরা ঋণ পেয়েছে। সুতরাং সন্দেহ নেই তারা কোনো একটা কলোনীতে উঠে গেছে। ঠিকানা পাওয়া কঠিন হবেনা।

গাড়িতে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। সুতরাং ট্রেনে আর কোনো কথা হল না। আমাদের স্টেশনে ।..র্জন মাঠের পথে নেমে তখন কথা শুরু হল ঃ

—দুলাল ভাই, কাল-পরশুর ভেতর উত্তরপাড়া যখন টের পেয়ে যাবে আমরা টাকা বার করে এনেছি, তখন কি কাণ্ড ঘটবে বুঝতে পারছ ?

উৎসাহের সঙ্গে দুলাল বললে, একেবারে রমারম কাণ্ড !

—হ্যাঁ। যাকে বলে মৌচাকে ঢিল।

—তোমার কি ভয় করছে রঞ্জনাদি ?

—করছে বইকি ! কি রকম জান ?

—কি রকম ?

—নাগরদোলায় চড়ার মতো। একটু ভয়, অনেকখানি আনন্দ। তোমার করছে না ?

—না। আমার শুধুই আনন্দ।

বললাম, তোমাদের সুবিধা আছে। কুৎসার তো ভয় নেই।

—ভয় আছে কিন্তু করি না।

—কেন করনা?

হেসে দুলাল বললে, কেন করি না জান? ভয় করলেই ওদের লম্ফঝম্ফ বাড়ে। যখন দেখবে ভয় করছি না, ওরা আপনিই তখন দমে যাবে।

—এটা মন্দ বলনি। দুলাল ভাই, কাল সকালে পাড়ার ছেলেদের খবর দিতে হবে।

—নিশ্চয়ই। ভিত্তিপ্রতিষ্ঠায় কিছু সমারোহ করতে হবে, যাতে ওরা বোঝে কিস্তি মাৎ করেছি।

—হ্যাঁ। আচ্ছা আর একটা কথা জিগ্যেস করি: গায়ের জোর তোমাদের বেশি, না ওদের?

—আমাদের।

—কি করে জানলে? পরখ তো করনি।

দুলাল পরিষ্কার গলায় বললে, না। সে সুযোগ যদিও কখনও হয়নি, কিন্তু যখন হবে তখন দেখবে আমি বাজে কথা বলিনি।

—কেন জিগ্যেস করলাম জান?

—জানি। তোমার ভয় একদিন শক্তিপরীক্ষার দরকার হবে। আমার নিজেরও সেই সন্দেহ। ওরা সহজে ছাড়বে না।

—তখন যেন পিছিয়ে না পড়ি।

—না, পড়ব না। কথা দিলাম।

দুলালের কথার মধ্যে বেশ জোর ছিল। নিজের উপর বিশ্বাসের জোর। বুকে খানিকটা বল পেলাম।

বললাম, ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা একটা ভালো দিন দেখে করতে হবে। না, তুমি এসব বিশ্বাস কর না?

—আমার কথা ছেড়ে দাও। তোমার যখন বাতিক আছে,

তখন তাই হবে। আমি পণ্ডিতের কাছ থেকে কালই একটা ভালো দিন দেখিয়ে নিয়ে আসব।

বলতে বলতে হঠাৎ তুলাল থমকে গেল ঃ কে ?

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, অল্প দূরে পাশাপাশি তুটি তালগাছের আড়ালে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, গায়ের সাদা কাপড়-জামা ছাড়া।

তুলাল আবার হাঁকলে, কে ওখানে দাঁড়িয়ে ?

মূর্তিটা দ্রুতপদে একটা ঢিপির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তুলাল ছুটে তাকে ধরতে যাচ্ছিল। আমি হাত ধরে আটকালাম!

—আমাকে ফেলে যাও কোথায় ?

তুলাল আর গেল না। কিন্তু তার একটি চোখ ঢিপির দিকে রইল।

ফিসফিস করে বললে, বিত্যুৎ বোধ হয়।

হাঁটার ভঙ্গি দেখে আমারও সেই সন্দেহ হচ্ছিল। ও আমাদের জন্যে এইখানে অপেক্ষা করছিল, না একটু দূরে দূরে আমাদের পাশে পাশে আসছিল বোঝা গেল না। কে জানে আমাদের কথাবার্তা শুনেছে কি না।

কিন্তু লোকটি যেই হোক, পরদিন প্রাচীরপত্রে দেখা গেল—"রঞ্জনা ও তুলাল, বড় যে ভাব দেখি! সাবধানে চলা-ফেরা কোর। দিনকাল ভালো নয়।"

ব্যস। এবার আরম্ভ হল আমাকে আর তুলালকে নিয়ে।

॥ আট ॥

তারপরে যে কাণ্ড আরম্ভ হল, নরক তার কাছে হার মানে।

অবশ্য আমাদের সেনাপতি, বয়স অল্প হলেও, খুব কুশলী।

ছুলাল বললে, রঞ্জনাদি, প্রথম ধাক্কাটাই হবে সব চেয়ে প্রবল ধাক্কা। এইটেতেই মাথা ঠাণ্ডা রেখ। তারপরে আর ভয় নেই।

মাথা আমার স্বভাবতই ঠাণ্ডা। কিন্তু যে কাণ্ড আরম্ভ হল তাতে ঠাণ্ডা মাথাও ঠাণ্ডা রাখা কঠিন হয়ে উঠল।

ঘর আরম্ভ হয়ে গেছে। ছুলাল কোথা থেকে তার জানা একটি ঘরের মিস্ত্রী আর একটি কাঠের মিস্ত্রী নিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি ঘর তুলে ফেলতে হবে, এই তার পণ। ওদের সঙ্গে দিবারাত্রি খাটছে সে নিজে আর পাড়ার সমস্ত ছেলে, যে যা পারে। তারা নিজেরাও বিশ্রাম নিচ্ছে না, মিস্ত্রীদেরও বিশ্রাম নিতে দিচ্ছে না।

দলাদলির একটা মাদকতা আছে বোধ হয়। সাধারণভাবে ভারতীয়ের চরিত্রে, বিশেষ করে বাঙালীর চরিত্রে এর ক্রিয়া খুব স্পষ্টই। সেটা বোঝা গেল মিস্ত্রী ছুটিকে দেখে।

তারাও পূর্ববঙ্গীয়। কিন্তু এটা তাদের কলোনী নয়। তারা অন্য কলোনীতে থাকে। দিনমজুরি করতে এসেছে। দক্ষিণপাড়া তাদের মিত্র নয়। উত্তরপাড়াও তাদের শত্রু নয়। অথচ দলাদলির মাদকতা যেন তাদেরও পেয়ে বসেছে।

ছুলাল বলে, ওদের নেশা জমে গেছে। ছু'দিনের কাজ দেড় দিনে করছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। কাঠের মিস্ত্রীটা কি বলে জান?

—কি বলে?

—বলে, শালারা আসুক না একবার এইদিকে। হাতে অস্ত্র রয়েছে, একটিকে আস্ত ফিরতে দোব না। আমাদের জন্যে মিস্ত্রীরাও মারামারি করতে প্রস্তুত!

আনন্দে এবং উৎসাহে তুলাল হাসে।

বলে, শুধু এই গোড়ার ক'টা দিন মাথা ঠাণ্ডা রেখে চল। দেখবে তু'দিনে সব ঢিট্ হয়ে যাবে।

কিন্তু তার লক্ষণ কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রথমে ওরা ভেবেছিল স্কুলের উপর একটা হামলা করবে। কিন্তু কি ভেবে সেদিকে যাচ্ছে না। বোধ করি ভয়েই। যে ছেলের দল চব্বিশ ঘণ্টা মিস্ত্রীদের সঙ্গে রয়েছে, শক্তির দিক দিয়ে তাদের সঙ্গে মারামারি করতে যাওয়া সুবিধা হবে না, একথা ওরা বোধ হয় বুঝেছে।

সুতরাং ওদের আক্রোশের সমস্তটা পড়েছে আমার মতো একটি তুর্বল স্ত্রীলোকের উপর। যা চলছিল প্রাচীরপত্রে হাতের লেখায়, তা নেমে এল মুখের কথায়।

প্রথমে দূর থেকে টিটকারী দেয়। আঙুল দিয়ে দেখায়। অভদ্র কথা বলে। হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। আমি গ্রাহ্য করতাম না। ওদের দিকে চাইতাম না পর্যন্ত। তুলাল বলেছে, এই প্রথম ধাক্কাটায় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সেনাপতির হুকুমে প্রাণপণে মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা ক'রে।

কিন্তু আমার এই নীরবতা ওরা তুর্বলতা বলে ভেবে নিলে। ওদের সাহস বাড়তে লাগল। যা বলত দূর থেকে, অনেক সময় ইঙ্গিতে, ইশারায়, সেই অভদ্র কথা ক্রমে কাছাকাছি এসে বলতে আরম্ভ করল।

আমি নিঃশব্দে আমার কাজে যাই। কথা বলি না। এমন কি, এরকম যে হচ্ছে তাও তুলালকে জানাই না। পাছে সে মাথা ঠাণ্ডা না রাখতে পারে।

কিন্তু বেশ বুঝি, এরা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে দেবে না বেশি দিন।

মানুষের মাথা এত উৎপীড়নে কত ঠাণ্ডা রাখতে পারা যায়! ক্রমাগত আলপিনের খোঁচা অনির্দিষ্টকাল সহ্য করা যায় না। বুঝি, তবু যথাসাধ্য ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করি।

একদিন বেরুচ্ছি। ওরা পথের ধারে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বোধ করি আমারই প্রতীক্ষা করছিল।

একজন বললে, মেমসাহেব সাহেবের কাছে চললেন। ফিরতে রাত্রি দশটা।

—একলা ফেরে? না সাহেব পৌঁছে দেয়?

—পৌঁছে দেয় গাড়ি করে।

—তাই রাত্রে মোটরগাড়ির শব্দ পাই। আমি ভাবতাম,

ছোঁড়াগুলো একেবারে রাস্তার ধারে বসে। আগে আরও দূরে বসত। ক্রমে ক্রমে সরতে সরতে আজ গাছের গুঁড়িটার উপরই বসেছে। ওদের পাশ দিয়েই আমাকে যেতে হবে।

ছাতাটা খুলে ওদের দিকে আড়াল করলাম।

দ্বিতীয় দিনও যখন এইভাবে যাচ্ছি তখন একটা ঢিল এসে পড়ল ছাতার উপর। খুব বড় ঢিল নয়। ছাতাটা ফুটল না। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ইচ্ছে করছিল, এই ছাতা দিয়েই ওদের উত্তমমধ্যম দু'ঘা দিই। ওরা কি করতে পারে দেখি। তখনই ভাবলাম, তাহলে এখনই ভিড় জমে যাবে। দু'পক্ষের ভিড়। এবং তারপরে একটু লাঠালাঠি এবং উভয় পক্ষের দু'চারজন অল্পবিস্তর জখম না হয়ে যাবে না। অথচ দুলাল বলেছে,

বোধ হয় দু'সেকেণ্ড দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর আবার পথ চলতে আরম্ভ করলাম।

পরদিন থেকে অন্য পথ ধরলাম। সময়টাও বদলালাম। কোনোদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বেরিয়ে যাই, কোনদিন বা তার অনেক পরে।

ওরা মহামুশকিলে পড়ল।

একদিন ওরা স্টেশনে গিয়ে হাজির হল।

ট্রেন আসতে একটু দেরি আছে। প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছি। ছোঁড়াগুলোকে দেখেই চমকে উঠলাম। বদমাইশগুলো এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে!

ছাতাটা মেলে ওদের দিকে আড়াল করলাম।

কিন্তু তাতে কি পরিত্রাণ পাওয়া যায়?

ওরা সদলবলে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ছ'সাত জন হবে।

বললে, কি রে মেমসাহেব, সাহেবের কাছে চললি বুঝি?

সেনাপতির পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। হাতের ছাতাটা বন্ধ করে একটা ছোঁড়ার মাথায় বসিয়ে দিলাম এক ঘা।

ওরা এর জন্যে বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। অতর্কিত আক্রমণে প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল। কি যে করবে বুঝতে পারলে না। কিন্তু কিছু করবার সময়ও পেলে না।

আজ একটু সকালেঃ বেরিয়েছিলাম। দুপুরের এই সময়টা কলেজের ছাত্রদের ভিড়ই বেশি হয়। আমি প্রথম চোট দিতেই তারা কি হল, কি হল করে ছুটে এল।

কেঁদে বললাম, দেখুন তো এই ছেলেগুলো আমাকে কি বিরক্ত করছে!

আর বলতে হল না। কেউ জিগ্যেস করলে না, কে এই ছেলেগুলো? আমিই বা কে? কেনই বা বিরক্ত করছে? আমার কথা শেষ হবার আগেই প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন ছাত্র নেকড়ে বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সেই ছোঁড়াগুলোর উপর। এবং চাঁদা করে যে পরিমাণ কিল-চড়-ঘুঁষি বৃষ্টি আরম্ভ করলে, সে বর্ষণ একমাত্র পকেটমার ছাড়া আর-কারও সহ্য করার ক্ষমতা নেই।

ওরা পকেটমার নয়। সুতরাং অধিকাংশই প্ল্যাটফর্মেই শয্যাগ্রহণ করল। অবশিষ্টরা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল।

কিন্তু আহত অবস্থায় কতদূর ছুটতে পারে! তাদের মারতে মারতে ফের প্ল্যাটফর্মে ধরে নিয়ে এল। এবং যতক্ষণ না ধরাশয্যা গ্রহণ করে ততক্ষণ অমানুষিক প্রহার চলল।

যে ট্রেনটায় আমাদের যাবার কথা সেটা এল, চলেও গেল। ছাত্রেরা একজনও গাড়িতে উঠল না। একদিন কলেজ না গেলে কি হয়? এত বড় একটা হুজুগ ছেড়ে কে যেতে পারে?

আমি একপাশে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। মুখে কথা নেই। চোখ দিয়ে দরদরধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

ইতিমধ্যে একটা ভ্যানে করে পুলিস এসে উপস্থিত। হাঙ্গামা শুরু হতেই বোধ হয় স্টেশন থেকে খবর দেওয়া হয়েছিল।

ছেলেরা বললে, এই লোকগুলো ওই ভদ্রমহিলাকে বিরক্ত করেছিল।

—দিয়েছেন তো উত্তমমধ্যম?

একটি ছেলে বললে, উত্তম ঠিক হয়নি, মধ্যম-মধ্যম হয়েছে।

অর্থাৎ তখনও ছাত্রদের হাতের সুখ হয়নি।

পুলিস বললে, ওতেই হবে। এর পরে মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থা করব। এই হারামজাদারা, ওঠ্।

কাঁপতে কাঁপতে ছোঁড়াগুলো উঠে দাঁড়াল।

এতক্ষণ ভিড়ের আড়ালে ছোঁড়াগুলোকে দেখতে পাইনি। ওরা উঠে দাঁড়াতে ওদের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম।

কি সাংঘাতিক মার!

মারের চোটে মুখ-চোখ ফুলে ঢোল হয়েছে। বোধ হয় কোনো শক্ত জিনিসের আঘাতে দু'একজনের মাথা ফেটে রক্তও পড়ছে। দেহের অবস্থাও সেই রকমই।

আমার দিকে চেয়ে পুলিস বললে, আপনাকেও একবার আমাদের সঙ্গে থানায় আসতে হবে।

শুনে আমার চক্ষুস্থির! কাঁদ-কাঁদ অবস্থা।

ছাত্রেরা সাহস দিলেঃ চলুন না। ভয় কি? আমরা সুদ্ধ আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

সবাই থানায় গেলাম। ছোঁড়াগুলো পুলিসের ভ্যানে। আমি একটা রিক্‌শায়। তার সঙ্গে আরও অনেক রিক্‌শায় আরও অনেক ছাত্র।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

আসামী হয়েই হোক আব ফবিয়াদী হয়েই হোক, পুলিসের হাতে একবাব পড়লে আব বক্ষা নেই। সুতরাং ছাড়া পেতে রাত আটটা হল। ছাত্রগুলি ভদ্র। আমাদেব কলোনীব কোল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল।

ফিরে এসে গা ধুয়েই দুলালকে খবব পাঠালাম।

সে আসতেই বললাম, দুলাল ভাই, আজ সাংঘাতিক খবর।

শুনে ওর তো মুখ শুকিয়ে গেলঃ কি ব্যাপার?

—ব্যাপাব গুরুতর।

সমস্ত ব্যাপারটা ওকে বললাম।

শুনে ও তো আনন্দে নাচতে লাগলঃ বল কি! এত বড় সুখবর! দেখলে তো, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। এইবার বাছাধনরা জব্দ হবে। কে কে ছিল বল তো?

সকলের নাম জানতাম না। যাদের জানতাম, তাদের নাম বললাম।

—উঃ! সেই পাজি ক'টাই। আচ্ছা হয়েছে! কিন্তু এখানে তো খবর এখনও পৌঁছয়নি।

—কি করে পৌঁছুবে? ওবা তো হাজতে। আমি এইমাত্র পৌঁছুলাম।

—হাজতে! আচ্ছা হয়েছে!

বললাম, আজ রাত্রি হাজতবাস। কাল কোর্টে হাজির করবে। সেখানে যদি জামিন পায় ভালো। নইলে ফের হাজতে।

—হে হরি! হে মা কালী! জামিন যেন না পায়।

—কি করে পাবে? বাড়ির লোকেরা জানতে পেরে যদি কোর্টে যায়, তবে তো?

—তাহলে তুমি চুপ করে থাক। এ ঘটনার কথা কাউকে জানাবে না। কে খবর দেবে? তারা তো সব হাজতে।

কিন্তু তবু খবর পেয়ে গেল। স্টেশন তো দূরে নয়। ঘটনাটা অনেকেই দেখেছে। তাদের মুখে মুখে খবরটা রটে গেল।

এখানে কেউ কারও জন্যে ভাবে না। গেছে কোথাও। আসবে এখন। কোথাও আটকে গেছে হয়তো। ট্রাম-বাস-ট্রেন সবই তো পদে পদে আটকাচ্ছে। সুতরাং কেউ কারও জন্যে ভাবে না।

কিন্তু খবরটা রটে যেতে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কে কে ধরা পড়েছে জানা নেই। বলছে সাত-আট জন, কিন্তু আরও বেশিও হতে পারে। সুতরাং যারা যারা ফেরেনি, তাদের বাড়িতেই দুশ্চিন্তার কালো ছায়া পড়ছে।

উত্তরপাড়া নিস্তব্ধ।

দুলাল একসময় খবর আনলে, উত্তরপাড়ার প্রবীণেরা সদলবলে থানায় গেল।

—ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে না তো?

বললাম, তার জো নেই। সব খবর নিয়ে এসেছি। কাল কোর্টে হাজির করার আগে ছাড়া পেতেই পারে না।

—ঠিক জান?

—হ্যাঁ।

—হে মা কালী! হে হরি!

দুলাল আবার হাত জোড় করে প্রণাম জানালে।

বললাম, কিন্তু আমার বিপদ শোন।

—তোমার আবার বিপদ কি?

—আছে। আমাকেও কাল কোর্টে যেতে হবে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সেই এক দুশ্চিন্তা।

দুলাল ভরসা দিলেঃ চিন্তার কিচ্ছুই নেই। আমরা দশ বারো জন তোমার সঙ্গে যাব।

—সে তো যেতেই হবে। আমি মেয়েমানুষ, একা গিয়ে কিছু করতে পারি?

—খরচ আছে নাকি?

—খরচ ওদের। আমার আবার খরচ কি? আমি তো সাক্ষী। ছেলেরা কেউ সাক্ষী হয়নি?

—পাঁচ-ছ'জন। ওদেরই তো মজা।

—আমাদেরও কম মজা নয়। উত্তরপাড়া একেবারে দমে গেছে। সাড়া নেই। জেলটা যদি হয়ে যায়।

বললাম, থানার লোকেরা কিন্তু বলাবলি করছিল, জরিমানা তো হবেই, জেলও হয়ে যেতে পারে।

—বাস। হে হরি! হে মা ক লী!

দুলাল জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে ঠাকুর-দেবতাদের কাউকে ডাকতে বাকি রাখলে না।

বললে, আমরা যাব। ওদের দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসব। নইলে মজা হবে কেন? এখন চলি। অ্যাঁ?

দুলাল ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল। বোধ হয় আর সবাইকে খবরটা দেবার জন্যে!

॥ নয় ॥

উলটা বুঝলি রাম।

দক্ষিণপাড়ার আশা-ভরসা, দুলালের নাচন-কোঁদন হঠাৎ সব উলটে গেল। এরকম যে হতে পারে আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এবং এর জন্যে আমরা প্রস্তুতও ছিলাম না।

বিদ্যুৎ না পারে কি?

যে ক'টি ছোকরাকে স্টেশনে ধরা হ'যছিল, পরদিন তাদের কোর্টে হাজির করা হয়েছিল। উত্তরপাড়ার অনেকে গিয়েছিল কোর্টে। কিছু চাঁদা রাতারাতি সংগ্রহ কবে একজন উকিলও দেওয়া হয়েছিল। পুলিসের আপত্তি সত্ত্বেও তাদের জামিন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত জামিনদারের অভাবে তাবা জামিন পেল না।

উত্তরপাড়াব নেতা বলতে বিদ্যুৎ। তার পরেই এই ছোকরার দল। এরা জামিন না পাওয়ায় আমাদের স্কুলবাড়ি তৈরির কাজে খুবই সুবিধা হল। উত্তরপাড়া একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু বিদ্যুৎ না পারে কি?

ঘটনাস্থলে কি সব তদন্তের জন্যে একদিন পুলিস এল। কবে কোথায় কোথায় আমাকে কি টিটকারি ছোকরাগুলো দিয়েছে সেই তদন্তের জন্যে আর একদিন পুলিস এল।

আমরা সাক্ষী দিচ্ছি, এমন সময় কোথা থেকে প্রায় চার-পাঁচশো লোক লাল শালুব উপর লেখা নানারকম পতাকা নিয়ে হাঁক দিতে দিতে উপস্থিত।

পুলিসী জুলুম চলবে না।

চলবে না, চলবে না।

শুধু আমরাই নয়, পুলিসের লোকেরা পর্যন্ত এই অতর্কিত আক্রমণে হতচকিত হয়ে গেল।

লোক জোগাড় করেছে বিহ্যুৎ।

পুলিসের বিরুদ্ধে লোকের মন উত্তেজিত হয়েই আছে সেই ইংরেজ আমল থেকে। সে মনোভাব এখনও বদলায়নি। কি বলেছে বিদ্যুৎ, সেই জানে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজেরও অভাব। বেকারের সংখ্যাই বেশি।

নেই কাজ তো খই ভাজ।

কাজ না থাকলে লোকে জ্যান্ত খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করে থাকে। সুতরাং বিদ্যুতের লোকসংগ্রহে অসুবিধা হয়নি।

দেখতে দেখতে উত্তেজিত জনতা পুলিসের জীপ ঘিরে ফেললে।

—কি চান আপনারা?

উত্তর এল: জুলুমটা বন্ধ করতে হবে।

—জুলুমটা কোথায় দেখলেন?

সমাগত জনতা সব খবর ভালো করে জানে বলে মনে হল না। হু'চারজন হয়তো জানে, বাকি সবাই টানে-টানে চলে এসেছে।

উত্তরে তারা তাদের আগের ধ্বনিরই পুনরাবৃত্তি করলে, জুলুমবাজি চলবে না। চলবে না, চলবে না।

পুলিস বিব্রত। তারা সংখ্যায় মাত্র তিনজন। এতগুলি লোক তাদের আক্রমণ করলে কি হ:ব সে একটা ভাবনা। দক্ষিণপাড়ার অনেক লোক অবশ্য উপস্থিত। কিন্তু তারাই বা ক'জন হবে? পাঁচশো লোকের বিরুদ্ধে তারাই বা কি করতে পারে?

পুলিস বললে, আহা! ধ্বনি রাখুন। জুলুমবাজিটা কি দেখলেন তাই বলুন না।

তখন বিদ্যুৎ এগিয়ে এল।

মাথায় তার একটা পাগড়ি বাঁধা। উত্তেজনায় চোখ-মুখ লাল। ক্রোধে শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে।

চীৎকার করে বললে, জানেন না, জুলুমবাজিটা কি?

—না।

—আমাদের ছেলেদের খামোখা ধরেছেন কেন? কেন তাদের জামিন দেওয়া হল না?

আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওই একটা কুলটা বদমাইশ স্ত্রীলোকের কথায় কেন ওদের ধরা হল? ওই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আপনাদের কিসের দহরম-মহরম?

দারোগার ভুরু একবার কোঁচকাল। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, সে সব কোর্টে গিয়ে বলবেন এখন, তখন তার বিচার হবে। এখন আমাদের কি করতে বলেন?

—ছেলেগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে।

বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতাও হুঙ্কার দিলেঃ হ্যাঁ। ছেড়ে দিতে হবে।

দারোগা হাসলেন। বললেন, সে কথা আমাকে বলে তো লাভ নেই। আসামীরা ও. সি.র জিম্মায় থানার হাজতে রয়েছে। সেইখানে চলুন। মিছিমিছি আমাদের এখানে ঘেরাও করেছেন কেন?

উত্তরপাড়া টোপ গিলল। দারোগার সামনে গলাবাজি করে তাদের সাহস বেড়ে গিয়েছিল।

বললে, চলুন।

ওরা রাস্তা ছেড়ে দিল। পুলিসের জীপ বোঁ করে বেরিয়ে গেল। তার পিছু পিছু জনতা চলল ধ্বনি দিতে দিতে আর রাস্তার বেকার পথিকদের দলে টানতে টানতে।

ভুল কার হল কে জানে, কিন্তু এমন ভুল অনেক ক্ষেত্রে অনিবার্য।

জীপ অনেক আগে থানায় পৌঁছে গেছে। জনতা দেখলে থানা থেকে একশো গজ দূরে মাঠের মধ্যে রাস্তা আটকে সশস্ত্র পুলিস দাঁড়িয়ে।

হল্ট!

মেঘের মতো ডাক।

দু'সারির মিছিল থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ডিস্‌পার্স!

পুলিসের কাঁধের রাইফেলে শব্দ হল ক্লিক ক্লিক। রাইফেল জনতার দিকে নিবদ্ধ।

বিদ্যুৎ অভিজ্ঞ লোক। কিন্তু নেতা নয়। যারা এসেছিল তারাও বেকার, ভবঘুরে।

রাইফেলের ক্লিক ক্লিক শব্দ হওয়ামাত্র একটা বিপর্যয় কাণ্ড হয়ে গেল। জনতা বিশৃঙ্খলভাবে দৌড়ুতে লাগল। কত লোক পড়ে গেল পথে। তাদের উপর দিয়ে মাড়িয়ে পালাচ্ছে লোক। কত লোক রাস্তা থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল।

সকলের আগে পালাল বিদ্যুৎ!

মুহূর্তমধ্যে রাস্তা জনশূন্য। মোটর-ট্যাক্সি-বাস যে সব মিছিলের জন্যে আটকে পড়েছিল তারা তখনও দাঁড়িয়ে। রাস্তায় পড়ে গিয়ে, লোকের পায়ের চাপে যারা জখম হয়েছিল, তাদের না সরান পর্যন্ত তারা রাস্তা পাচ্ছিল না।

পুলিস তাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে রাখলে। যারা বেশি জখম হয়েছিল তাদের যে কটি ট্যাক্সি খালি ছিল তাইতে করে একজন পুলিসের জিম্মায় হাসপাতালে পাঠান হল।

খবর পেয়ে পুলিসের ভ্যান এসে গেল। অবশিষ্ট আহতদের তাইতে করে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে।

দু'তিনজন ছাড়া কেউই গুরুতর আহত হয়নি। সেই দু'তিনজন হাসপাতালে রইল। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাজতে নিয়ে আসা হল।

নরক গুলজার।

বিদ্যুতের যত বুদ্ধিই থাক, শুধু স্টেশনের ঘটনার উপর ভিত্তি

করে একটা বড় রকমের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলা কিছুতেই সম্ভব হত না। মূল ঘটনাকে বিকৃত করে একেবারে সে উলটে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মূল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব ছিল না। আর সে প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছে যারা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলে তারাই। অর্থাৎ ছাত্রদল। মামলায় কোর্টে আসল কথা তারা সবই প্রকাশ করত।

কিন্তু বিরাট উদ্বাস্তু মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে ব্যাপারটা একেবারে উলটে গেল। রটে গেল, সহস্রাধিক অসহায় বাস্তুহারার মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে পুলিস বেপরোয়া গুলি চালায়। কত লোক যে হতাহত হয়েছে তার সীমাসংখ্যা নেই। বহু লাশ পুলিস গাপ করে ফেলেছে।

সাধারণ মানুষ হুজুগে চলে। তার বিশ্বাস করার ক্ষমতারও শেষ নেই। ঘটনা যত বেশি অবিশ্বাস্য হবে, সাধারণ মানুষ তত সহজে তা গলাধঃকরণ করবে। তার বিশ্বাসের প্রবণতাই নিম্নমুখী।

মুখে মুখে ঘটনাটা এইভাবে রটতে লাগল। এবং যত রটে, অতিরঞ্জন তত বাড়ে এবং বিবরণ তত বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়। খবরের কাগজ মধ্যপন্থা গ্রহণ করলে। যা মিথ্যা তার প্রতিবাদ করে না, যা সত্য তার আংশিক বলে।

খবরের কাগজের দোষ দেব কি, আমরা, দক্ষিণ-পাড়ার লোকেরাও, ওই সমস্ত মিথ্যার প্রতিবাদ করিনি। ভয়ে নয়, আলস্যবশতও নয়, বোধ হয় পুলিসের সম্বন্ধে আমাদের মনও ভিতরে ভিতরে প্রসন্ন ছিল না। তাই আমাদের জন্যেই পুলিস বিব্রত একথা জেনে এবং বুঝেও আমরা চুপ করে ছিলাম।

সুতরাং চারিদিক দিয়েই পুলিস মার খেতে লাগল।

সত্য কেউ জানতে চায় না। সাধারণ মানুষ তো নয়ই। তারা মুখে মুখে নানা অতিরঞ্জিত কাহিনী রটাতে লাগল। খবরের কাগজ পরিবেশন করিতে লাগল সত্য-মিথ্যায় জড়ান খবর। আর

আমরা নিশ্চুপ। এমন কি, যে ছাত্রদল উৎসাহ ভরে সাক্ষ্য দিতে অগ্রসর হয়েছিল, তারা ইতস্তত করতে লাগল, এর পরে সত্য সাক্ষ্য দেওয়া সংগত হবে না।

পুলিস বিব্রত। এমন কি গবর্নমেণ্টও।

ব্যাপারটা রাজনৈতিক দলের হাতে পড়েছে। রোজ খবর বেরুচ্ছে। রোজ মিটিং। বিভিন্ন বক্তা প্রত্যহ আলকাতরা মাখাচ্ছে একদিকে পুলিসের মুখে, অন্যদিকে আমার মুখে। কারোরই প্রতিবাদ করার কোনো পথ খোলা নেই।

উপরের এবং নীচের চাপে পুলিস শেষ পর্যন্ত আপোষ করতে বাধ্য হল। নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় আমি ও তুলাল কোর্টে যাইনি।

সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা এর ক'দিন পরেই ঘটল, যার ফলে আমার জীবনের গতি অন্য দিকে মোড় ফিরল।

অন্ধকার রাত্রি।

কলোনী অঞ্চলে অকারণ তেল পোড়াবার রেওয়াজ নেই। চাঁদিনী রাত্রি হলে তবু লোকেরা কিছু রাত্রি অবধি বাইরে বসে গল্প করে। অন্ধকার রাত্রে ন'টার মধ্যেই নিশুতি।

একটু আগে অল্প এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ ছিল। তার জন্য অন্ধকার আরও জমাট।

রাত্রি তখন কত হবে বলতে পারি না। একটু আগে একদল শেয়াল ডেকে গেল। মনে হয় মাঝরাত্রি।

দরজা খুলে বাইরে এসেছি। দাওয়া থেকে নামব, মনে হল বেড়ার ওপাশে রাস্তায় কারা যেন সন্তর্পণে চলাফেরা করছে। লোক দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে।

মনে আমার কোন ভয় হয়নি। ভেবেছিলাম, পাড়ার ছেলেরাই বোধ হয় কোনো কাজে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—কে?

সাড়া নেই।

আর একবার জিগ্যেস করতে যাব, কে? কিন্তু তার আর ফুরসুৎ পাওয়া গেল না।

পিছন থেকে কারা যেন এসে একখানা চাদরে আমার মুখ বেঁধে ফেললে।

একে সদ্য ঘুম থেকে উঠেছি, তাতে অতর্কিত আক্রমণ এবং মুখ বাঁধার জন্য নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

যখন জ্ঞান হল, দেখি, মাঠের মধ্যে একটি পুকুরের পাড়ে শুয়ে। সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। একবার চোখ মেলেই আবার বন্ধ করলাম।

অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে, কিন্তু রাত তখনও কাটেনি। মাথা ঝিমঝিম করছিল। চোখের উপর যেন একটা ঝাপসা পর্দা। সব কেমন গোলমাল লাগছিল।

হঠাৎ একটা অজানিত ভয়ে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল।

উঠে বসলাম।

চারিদিকে চেয়ে ঠাহর করবার চেষ্টা করলাম এ জায়গাটা কোথায়। বুঝতে পারলাম না। চারিদিকে কোথাও পরিচিত কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলাম না,—কোনো রাস্তা, কি রেললাইন, কি ঘরবাড়ি, কি কোনো গাছ পর্যন্ত না।

বেশবাস অসম্বৃত।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। মাথা ঘুরছে। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা।

চীৎকার করিবার চেষ্টা করলাম। পেরেছিলাম কি না জানি না। হয়তো আমার চীৎকার আমার গলার বাহিরে যায়নি। গেলেও অত ভোরে কেউ পথে বেরোয় না যে, আমার ডাক তার কানে যাবে।

দেহ ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। অন্ধকার এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। ভয় হল আবার তারা যদি এসে পড়ে!

রাস্তাটা কোন্ দিকে? বড় রাস্তাটা?

বোঝা গেল না।

গেলেই বা কি করতাম জানি না। দেশে কতরাস্তাই তো আছে। তার একটিমাত্র আমাদের দেশবন্ধু পল্লীর পাশ দিয়ে গেছে। সেই রাস্তাটি পেলে তবে না!

কিন্তু এখানে তো থাকা চলবে না। আবার তারা যদি এসে পড়ে কি হবে? রাস্তা একটা খুঁজে বার করতেই হবে।

কিন্তু কী করে করি? কী কবে করি?

দাঁড়াবার শক্তি নেই। মাথা ঝিমঝিম কবছে। চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত ঝাপসা।

প্রাণপণ শক্তিতে হামা দিয়ে চলবাব চেষ্টা করলাম। কতটা এগিয়েছিলাম জানি না। যখন জ্ঞান হল, দেখি হাসপাতালে।

একা।

চেনা মুখ আশেপাশে একটিও নেই। শুধু আরও অনেক রোগিণী। খাটে, মেঝেয়, এখানে সেখানে শুয়ে। আমারই মতো হতভাগিনী কিনা কে জানে।

বিকেলে বাবা এল, মা এল, তুলাল এল। আমাদের দক্ষিণ-পাড়ার অনেকে এল।

সকলের চোখে সহানুভূতি। সবারই চোখে উদ্বেগ। সবারই মুখে এক প্রশ্ন: কেমন আছ?

বলি, ভালো।

তাছাড়া আর কি বলার আছে?

ভালোই আছি। আমার চোখে জল নেই। মুখে হাসিও নেই। মনে হল, অঞ্জনার মতো চোখে যদি আগুন আনতে পারতাম!

কিন্তু সবাই কি তা পারে? সবাই অঞ্জনা হতে পারে না।

॥ দশ ॥

তারপরে ?

তারপরে একটু সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে এলাম। তারও পরে একটা প্রকাণ্ড মামলা বেধে গেল। নারীধর্ষণ এবং তাতে সহায়তা করার অপরাধে একদল লোক ধরা পড়ল। তার মধ্যে বিদ্যুৎ এবং আরও কয়েকজন চেনা। উত্তরপাড়ার সেই ছেলেগুলোও আছে তার মধ্যে। আর যারা আছে তাদের চিনি না, কখনও দেখেছি বলেও মনে পড়ে না।

তাই নিয়ে বিরাট এক মামলা।

আসি যাই, সাক্ষ্য দিই, কিন্তু মামলার মধ্যে কিছুতে কোনো উৎসাহ পাই না।

বাবা তার সমস্ত রুগ্নতা ঝেড়ে ফেলে আশ্চর্যরকম শক্ত হয়ে গেছে। দুলাল আর তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে দিনরাত ঘোরাঘুরি করছে, থানা আর উকিল-বাড়ি এবং আরও কত কত জায়গা।

ঠিক শেয়ালদা স্টেশনের মতো উৎসাহ।

শুধু আমিই যেন মারা গেছি।

দিনরাত দাওয়ায় নিঃশব্দে বসে থাকি আর ভাবি। কি যে ভাবি তারও কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

ওপারে সমস্ত পৃথিবীর মারামারি, হানাহানি। এপারে একা আমি। মাঝখানে বয়ে চলেছে মামলার দুরন্ত নদী। তার দিকে আমার দৃষ্টি নেই, যদিও সেইদিকেই চেয়ে আছি।

সবাই বলছে, এরকম মামলা নাকি কেউ বাপের জন্মে দেখেনি।

হবে।

মামলা এক আদালত থেকে অন্য আদালতে গেল। বোধ হয়, দায়রা আদালতে।

কি ভয়ঙ্কর আদালত! গমগম করছে এজলাস। সেখানেও একদিন আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

ওরা বললে, অজ্ঞান না ছাতু। ওসব বদমাইশ মেয়ের ঢং!

এরা বললে, চমৎকার! একশো দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার চেয়ে এই ঘণ্টাখানেকের মূর্ছা ঢের বেশি কাজ দেবে। হাকিমের মন নাকি গলেছে। তাঁর চোখে নাকি বেদনার গভীর ছায়া পড়েছিল।

হবে।

কিন্তু মামলার কথা নয়। কি হবে মামলার কথায়, তার জয় পরাজয়ের বিবরণে? আমার যা গেছে, দেহ মন এবং বুদ্ধির দিক দিয়ে, তা কে পূরণ করতে পারে? আমার অতীত, আমাব বর্তমান ভবিষ্যৎ, আমার ভালো মন্দ এই অভূতপূর্ব মামলার নদীর জলে ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে।

সুতরাং মামলার কথা যাক।

সে শুনে তোমাদের কোন লাভ নেই। বলে আমারও লাভ নেই। তারপরে যে ঘটনা ঘটল সেইটেই বলি।

তখন মামলা শেষ হয়ে গেছে।

বিকেলে মা কোথায় বেড়াতে গেছে। বাবা ছায়ায় বসে বেড়ার জন্যে কাবারী চাঁচছিল। কাদের গরুতে সেদিন বেড়ার খানিকটা ভেঙে দিয়ে গেছে। কাবারী চাঁচছিল আর সেই অজ্ঞাত, অদৃষ্ট গরু আর তার মালিকের বিরুদ্ধে গজগজ করছিল।

আমি দাওয়ায় চুপ করে বসে চালের কাঁকর বাচছিলাম।

এমন সময় বেড়া ঠেলে ঢুকল অঞ্জনা আর খঞ্জনা।

আমি মনে মনে, মনের অজ্ঞাতসারেই ওদের বোধ হয় খুঁজছিলাম। অনেকদিন আসেনি ওরা। দায়রায় মামলা চলবার সময় একদিন এসেছিল, আর না।

আমিই আসতে নিষেধ করেছিলাম। বলেছিলাম, যে রকম অবস্থা, এখন আর আসিন না। রাস্তায় একা পেয়ে তোদেরও অপমান করে বসতে পারে। মামালা শেষ হোক, তারপর আসিস।

তাই বোধ হয় এতদিন আসেনি।

অনুযোগ করার কিছু ছিল না। বললাম, আমি তোদেরই কথা ভাবছিলাম।

—সত্যি রে!

—সত্যি তো একদিন যাসনি কেন আমাদের বাড়ি। বাড়ি তো চিনিস। না ভুলে গেছিস?

ম্লান মুখে বললাম, ভুলে যাওয়ার মতোই অবস্থা। আমি কোথাও বেরুই না, জানিস?

—বেরুস না কেন?

—ভয়ে। লজ্জায়।

—ভয়ই বা কিসের? লজ্জাই বা কিসের? যাদের জন্যে ভয় তারা তো শ্রীঘরে ঘানি টানছে। আর লজ্জাই বা কিসের? কাকেই বা লজ্জা? মানুষকে লোকে লজ্জা করে, জন্তুকে নয়।

বললাম, কি জানি ভাই। লজ্জা করে। ভয়ও করে। যাকগে। তোদের খবর বল।

—ভালোই।

ভালো তা তো চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। মাজা পিতলের মতো ঝকঝক করছে রূপ। রং-করা মুখ। জমকালো মূল্যবান সজ্জা। দেখলেই বোঝা যায় ওরা বেশ ভালো আছে।

জিগ্যেস করলে, কি করছিস?

—চাল বাচছি আর ভাবছি।

—কি এত ভাবনা ?

ওদের কাছে লজ্জার কিছু নেই। বললাম, ভাবছি, কাল কি হবে ?

—কেন ?

—এই ক'টি শেষ চাল। ট্যাঁকও খালি। ভাবছিলাম কাল কি হবে ? অন্তত বাবার জন্যে তো দুটি চাই।

—কি করছিস ?

—কি আর করব ? স্কুলটা তো হল না।

পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি বিনিময় করে ওরা বললে, আমরা একটা কাজ পেয়েছি। করবি ?

—কেন করব না ?

ওরা হেসে উঠল : কি কাজ না জেনেই রাজী হয়ে গেলি ?

বললাম, আমার তো বাছবিচারের কিছু নেই ভাই।

ওরা মাসাজ ক্লিনিকের কথা বললে। ভালো মাইনে। কিন্তু মাইনেটা কিছুই নয়। উপরি যথেষ্ট। রানীর হালে থাকতে পারবি।

বললাম, করব।

—পাঁচটায় যেতে হবে। ফিরতে প্রায়ই দেরি হবে। এগারোটা-বারোটাও হতে পারে।

ওরা হাসলে।

সে হাসির অর্থ বুঝতে বাকি রইল না।

বললে, ঠোঁটের কোণে লিকলিক করবে সাপের জিভের মতো হাসি। নীল বিষে সাপের ফণার মতো তুলবে দুই চোখ। পারবি ? আমি পেরেছি। খঞ্জনা পেরেছে। আরও কত মেয়ে পেরেছে।

বললাম, আমিও পারব।

বলতে বলতে আমার ঠোঁটের কোণে লিকলিক করে উঠল বুঝি সাপের জিভের মতো হাসি। চোখছুটোও সাপের ফণার মতো তুলে উঠল।

অঞ্জনা বললে, হ্যাঁ। তুই পারবি। কত মেয়ে পারছে। সন্ধেবেলায় যাদের তুলসীতলায় প্রদীপ দেবার কথা, জলা-মাঠে তারা নিজেরাই আলেয়ার মতো জ্বলছে! চল।

ওদের সঙ্গে চলে গেলাম।

'নেতাজি মাসাজ ক্লিনিক'।

সেই থেকে ওখানেই আছি।

বিকেলে রং-করা মুখ, ভ্যানিটি ব্যাগ আর বেঁটে ছাতাটা নিয়ে বেরুই। লজ্জা করি না।

ক্লিনিকে কত লোক আসে। কত বয়সের কত লোক। ছোকরা, আধবুড়ো, বুড়ো। আমার কাছে সবাই সমান। সমান যত্নে সকলকেই নীল আগুন ভাগ করে দিই।

ভিড়টা শনিবারেই বেশি হয়। পরের দিন ছুটি বলেই বোধ হয়। খদ্দেরের পরিচর্যা করে সেইদিনই ফিরতে রাত হয়, এগারোটা-বারোটা।

তারা লোক মন্দ নয়। অত রাত্রে তারা আমাকে পথে নামিয়ে দিয়ে চলে যায় না। গাড়ী করে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়।

পল্লীর যারা জেগে থাকে, মোটরের শব্দ পায়। প্রথম প্রথম উঠে দেখত, এত রাত্রে কে আসে মোটর চড়ে।

এখন তাদের কৌতূহল মিটে গেছে। জানে, রঞ্জনা এল।

জানে, কিন্তু পরিহাস করে না। প্রশ্ন করে না, গৃহস্থের মেয়ে, বাড়ি ফিরতে এত রাত হয় কেন? চণ্ডীমণ্ডপে জটলা পাকায় না, এ তো ভালো নয়। পাড়ার মধ্যে অনাচার!

মা উঠে প্রদীপটা জ্বেলে দরজা খুলে দেয়। মাও কোনো প্রশ্ন করে না, এত রাত হল কেন?

একবার শুধু জিগ্যেস করে, তোর খাবারটা আনি?

রাত যেদিন হয়, হোটেল থেকে খেয়েই আসি। বলি, না। খেয়ে এসেছি।

সব দিন সুস্থও থাকি না। শরীর টলে।

পরম স্নেহে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মা আমাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়। বেশি অসুস্থ হলে মাথার শিয়রে বসে কতক্ষণ মা হাত-পাখা চালায়।

মাথার শিয়রে টিমটিম কবে মাটির প্রদীপটি জ্বলে। তার কম্পিত আলো পড়ে মায়ের চিন্তাক্লিষ্ট শীর্ণ মুখের ওপর, পাণ্ডুর দুই চোখে।

কে বলে, বাংলাদেশে সন্ধের দীপ নিভে আসছে?

নিজে দেখেছি, গভীর রাতে সমস্ত পল্লী যখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে, শিয়রে বসে অসুস্থ মেয়েকে হাওয়া করছে মা। সেই মায়ের চোখে জ্বলছে সন্ধ্যার প্রদীপ। স্নিগ্ধ। মিষ্টি। শুকতারার মতো করুণ।

অসুস্থ মন ভয়ও পায়।

বলি, অত জোরে হাওয়া কোব না মা। নিভে যাবে যে প্রদীপ।

—নিভবে না বাছা। তুই ঘুমো।

ঘুম আসে না তবু। খালি ভয় হয়, জোর হাওয়ায় প্রদীপ কখন নিভে যাবে বুঝি। অন্ধকারে আমার ভয় করে।

পাশের ঘরে চকমকি ঠোকার শব্দ পাই। বাবা তামাক সাজছে।

—মা, বাবা কি ঘুমোয়নি?

—ওর চোখে তো ঘুম নেই মা। ও তো ঘুমোয় না।

—ঘুমোয় না?

উত্তেজনায় উঠে বসতে যাই ঃ ঘুমোয় না? কি করে তবে?

—জেগে থাকে।

—তুমিও তো ঘুমোও না?

—না। ঘুম আসে না।

ঘুম আসে না। বাবার চোখেও না, মায়ের চোখেও না। কত বাপ-মার চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে। সমাজের শবকে ঘিরে মাঠময় শুধু আলেয়ার আলোর মিছিল।

বাপেদের চোখ থেকে ঘুম গেছে চলে। মায়েদের চোখ থেকেও।

খঞ্জনার কথা

খঞ্জনা বলতে লাগল ঃ

আমাদের বাড়ি বরিশাল। সহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। সোজা যদি কোনো রাস্তা থাকত তাহলে দূর বেশি নয়, মাইল কুড়ির মধ্যে। কিন্তু ঘুরপথ। খানিকটা নৌকায়, নদীপথে ঘুরতে ঘুরতে। বাকিটা হেঁটে। অনেক সময় লাগত।

সত্যি কথা বলতে কি, কলকাতা আসার আগে আমি সহর কখনও দেখিনি। বরিশাল কখনও যাবার প্রয়োজন হয়নি। যাওয়া সহজও ছিল না।

গ্রামের নাম শুনে লাভ নেই। সে নাম কাছাকাছি কয়েকখানা গ্রামের লোক ছাড়া আর কেউ শুনেছে বলে মনে হয় না। সুতরাং নাম শুনে গ্রামখানি চেনবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

দুটি নদীর মাঝখানে, দুটি নদী থেকেই বেশ খানিকটা দূরে ছোট্ট একখানি গ্রাম। গাছের ছায়ায় খানিকটা উঁচু জায়গার উপর ত্রিশ-চল্লিশখানা ঘর। তার চারিদিকে অবারিত মাঠ, সব সময় সবুজ। একটা ফসল উঠল তো আর একটা ফসল বোনা হল। মাঠ পড়ে থাকত না কখনও। দুঃখ যে ছিল না তা নয়, দুঃখ আর কোথায় নেই বলুন। রোগ, শোক, প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহ, মামলা-মোকর্দমা, এ সব ছিলই। কিন্তু মোটা ভাত-কাপড়ের দুঃখ ছিল না।

দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে। পর্তুগীজ হার্মাদের অত্যাচারের কথা শোনা গেছে। কিন্তু আমাদের এই নিরীহ গ্রামটির উপর কখনও তার আঁচড়টিও লাগেনি। ছোট্ট একটা গ্রাম, খেটে-খাওয়া দিন-মজুরের গ্রাম। তার উপর কারও লোভ হয়নি কখনও। বরাবর নিরুপদ্রবেও কাটিয়ে এসেছে।

প্রথম বিপর্যয় ঘটল দেশ-বিভাগের পরে। দুঃখের দিক দিয়ে, বঞ্চনার দিক দিয়ে, ভয়ের দিক দিয়ে তাকে অভূত-পূর্ব, বলা যায়। এমনটি আর কখনও ঘটেনি।

গোলমালের জন্য নয়, ভয়ে। স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের গ্রামে মেয়েদের স্কুল ছিল না। মাইল দুই দূরে স্কুল। সেইখানে পড়তে যেতাম। একটি সবুজ মাঠ। গুটি কয়েক ছোট ছোট খাল! একটা বাগান। তাই পেরিয়ে আমরা কয়েকটি মেয়ে স্কুলে পড়তে যেতাম।

গোলমাল লাগেনি বটে। কিন্তু থেকে থেকে গুজব যা উঠছে তা গোলমাল লাগার চেয়ে বেশি। এই গোলমালে কে যাবে নির্জন মাঠের পথে স্কুলে? মেয়েরা তো নয়ই, ছেলেরা পর্যন্ত স্কুল যাওয়া বন্ধ করেছে।

শোনা যাচ্ছে স্কুল বন্ধ। শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যেই নয়, শিক্ষক শিক্ষিকাদেব জন্যেও। তাঁদের বেশিব ভাগই হিন্দু। কেউ পালিয়ে গেছেন, কেউ পালাবার চেষ্টায় আছেন।

আমাদেরও সেই অবস্থা।

বাবা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। পসার যে খুব ভালো ছিল তা নয়। কিন্তু নগদ ফি যেটা পেতেন না, মাছে-ডিমে, তরিতরকারীতে সেটা পুষিয়ে যেত। পৈতৃক আমলের কিছু জমি-জায়গা ছিল তার উপর। সুতরাং এক রকম করে চলে যেত। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান উভয় মহলেই সৎ এবং নিরীহ ভদ্রলোক হিসাবে তাঁব যথেষ্ট খাতির সম্মানও ছিল। তিনিও পাঁচজনের উপকার করতেন, পাঁচজনেও তাঁর করত।

প্রথমে একটা সমাজ ছিল। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সমাজ। এবং তার শাসনও ছিল। ছেলেরা মুরুব্বিদের ভয় করত। তাঁদের নিষেধ মেনে চলত।

আগেই বলেছি আমাদের গ্রামে সত্যকার কোনো গোলমাল

হয়নি। কিন্তু গুজব রটত নানা ভয়ঙ্কর রকমের। আর দেখলাম সমাজটা রাতারাতি ভেঙে গেল। ছেলে-ছোকরারা আর মুরুব্বিদের মানতে লাগল না। তারা পথে পথে দল বেঁধে ঘোরে। শিষ দেয়। কাউকে মানে না। সেইটেই গোলমালের চেয়েও ভয়ঙ্কর বোধ হতে লাগল।

আর দেখা গেল, অনেক পুরুষের বন্ধুতা, আত্মীয়তা, পরস্পরের নির্ভরতা এবং বিশ্বাস চিড় খেয়ে গেল। উপরে কিছুই নেই। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ফাটলের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু ভিতরে ফাটল ধরেছে। মেরামতের বাইরে।

গ্রাম ছাড়ার আগের রাত্রে বাবার যে চেহারা দেখেছি, তা কোনো দিন ভুলব না। চোখে-মুখে বিষাদের কালো ছায়া নেমেছে। দেখে মনে হয়, শরীর এবং মন দুর্বল।

বললেন, হোমিওপ্যাথী পাস করার পরে বন্ধুরা বলেছিল, সহরেই বসতে। বসিনি। বলেছিলাম, সাতপুরুষের গ্রাম। তা ছেড়ে কোথায় যাব ?

মা বললেন, সহরে বসলেই বা হত কি ? সেও তো ছেড়ে যেতে হত।

—হত। কিন্তু ছাড়তে এমন কষ্ট হত না। স্বচ্ছন্দে ছেড়ে যেতে পারতাম।

বললাম, তোমার অসুবিধা কি বাবা ? যেখানে বসবে, সেখানেই রুগী জুটবে। পেটের ভাতের অভাব হবে না।

—এতই সোজা মনে করিস ?

বাবা হাসলেন। হাসিটা যেন তীরের মতো বিঁধল। চলে যাওয়া নিয়ে আমার মনে বিশেষ দুঃখ ছিল না। মেয়েদের বোধহয় থাকেও না। তাদের তো একদিন চলে যেতেই হয় অচেনা কোনো জায়গায়। বিভীষিকা সম্বন্ধেও সঠিক কোনো ধারণা ছিল না। সত্যিকারের ভয় পেলাম বাবার সেই হাসিতে।

বললেন, আমার মতো ডাক্তার কলকাতার অলিগলিতে।

—তাদের সঙ্গে তুমিও বসবে। শাক-ভাত না হোক, নুন-ভাত ত জুটি জুটবে।

বাবা আবারও হাসলেন: বসতে পয়সা লাগবে না? বাড়ি-ভাড়া আছে। ওষুধ কেনা আছে।

—কিন্তু তোমার কি সে পয়সা নেই?

—পয়সা? রেলভাড়া দিয়ে সাতটা দিনের মতো খোরাকী থাকবে। না কি বল?

বলে মায়ের দিকে চাইলেন।

মা সাড়া দিলেন না। মাটির দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

যথার্থ অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি তখনও। মনের মধ্যে কিছু সাহস ছিল। বললাম, সে তুমি ভেবনা বাবা। ঠিক হয়ে যাবে এখন। তুমি কিছু ভেবো না! বাবা চুপ করে রইলেন।

—কলকাতায় আমাদের আত্মীয় স্বজন, কি চেনা-জানা কেউ নেই বাবা?

—না।

মা বরাবর চুপ করেই ছিলেন। কি ভাবলেন জানি না, এতক্ষণ পরে সাহস দিলেন, আছে, আছে। এখন ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু মুখ দেখলেই মনে পড়বে এখন।

মায়ের বোধ হয় ধারণা ছিল, কলকাতা আমাদেরই গ্রামের মতো একটা জায়গা। পথে-ঘাটে রোজ সকলের সঙ্গেই দেখা হয়। এখন যাদের মনে পড়ছে না, তাদের সঙ্গেও দেখা হবে। আর দেখা হলেই মনে পড়বে।

বরুণকে ছেলেবেলায় দাদা বলতাম। বরুণদা। বিয়ের কথা হওয়ার পর থেকে কিছুই বলতাম না। লোকজনের সামনে পরস্পরকে এড়িয়ে যেতাম। গোপনে দেখা হত।

পাশের গাঁয়ে স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করবার পর থেকে বাড়িতেই আছে। বাপের একমাত্র ছেলে। বাপ বাইরে চাকরী করতে ছেড়ে দেয়নি।

জমি-জায়গা যা ছিল গতরে খাটলে এবং হিসেব করে চললে কষ্ট হবার কথা নয়।

বরুণের গতর ছিল। সুন্দব বলিষ্ঠ চেহারা। বাপের মতোই কর্মঠ। হিসেব করে চলবারও ক্ষমতা ছিল। গ্রামের সেই ছিল প্রাণ।

প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে বুক দিয়ে পড়ত। সেজন্য সবাই তাকে স্নেহ করত, লেখা পড়া জানে বলে শ্রদ্ধাও করত। কিন্তু শুধু চাষ বাস নিয়েই সে পড়ে থাকত না। গ্রামে স্কুলের নাম-গন্ধ ছিল না। সে সকালে একটা পাঠশালা আর রাত্রেও একটি পাঠশালা খুলেছিল।

সকালের পাঠশালায় পড়ত ছোট ছেলেমেয়েরা। আর রাত্রে বড়রা। তার মধ্যে পাকা-পাকা গোফদাড়িওলা বুড়োরাও থাকত। তাদের অ আ ক খ শেখান থেকে খবরের কাগজ থেকে খবর পড়িয়ে শোনান, মাসিক পত্র থেকে চাষবাসের সম্বন্ধে নতুন নতুন কথা শোনান হত।

মাছ-তরকারী গাঁয়ের কাউকেই কিনে খেতে হত না। সবারই পুকুরে মাছ, বাগানে তরকারী হত। কিন্তু বরুণদার বাগানের মতো ভালো তরকারী কারও বাগানেই হত না। আর বাড়ির সামনে ফুলের বাগান দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। ভিন গাঁয়ের লোক তার বাগানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ত। কত রকমারি ফুল! আর কি তার শোভা!

সন্ধেবেলা সেই বাগানের সামনে সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল। ইসারা করে ডাকলাম।

—কি ভাবছ?

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ দেখা দেখছিলাম।

—একটু আগে গাছে জলও তো দিচ্ছিলে।

—দিই। যতক্ষণ আছি, দিই।

—মমতা যাচ্ছে না?

—মমতা কি যায়?

বাবাকে সব কথা জিগ্যেস করতে ভয় হয়। চলে যাবার কথা উঠলেই তাঁর মুখ কি রকম হয়ে যায়। দেখে কষ্ট হয়। সেজন্যে ওকেই জিগ্যেস করলাম।

—চলে তো যাব, পথে কোনো ভয় নেই তো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ভয় তো সর্বত্রই আছে। পথেও, ঘরেও। ঘরে নিরাপদ নই বলেই তো পথে বেরুচ্ছি। নইলে কে আর ঘর ছেড়ে বার হত, বল।

—তা বটে।

বললাম, সঙ্গে মানুষের মধ্যে তো তোমরা ক'জন। আর তো সব বুড়ো-বুড়ি, বাচ্চা-কাচ্চা।

—আরও একজন আছেন।

—কে?

যিনি সবাইকে বিপদ থেকে বাঁচান, ভয় থেকে রক্ষা করেন, তিনি। তাঁকে ভুলো না।

—তবে আর চিন্তা করছ কেন?

—চিন্তা হয়। ভরসা তিনি।

বরুণদার দেবদ্বিজে অসীম ভক্তি। মন্দির দেখলেই প্রণাম করা চাই। বাপ-মায়ের উপরও তেমনি ভক্তি। প্রতিদিন সকালে বাপ-মায়ের পাদোদক না খেয়ে কাজে বেরোয় না। তবু বেশ চিন্তিত বোধ হল।

জিগ্যেস করলাম, কখন বেরুচ্ছি?

—আজ তো নয়।

—জানি কাল। কাল কখন?

রাত্রে। বেতাই চণ্ডীর ঘাঁটে নৌকা ঠিক করা আছে। জোয়ার পেলে সন্ধের আগেই গোয়ালন্দ পৌঁছে যাব।

—সেখান থেকে ট্রেনে?

—হ্যাঁ।

জিগ্যেস করলাম, এতদিন কত যত্নে যাদের পড়ালে সেই মুসলমান ছাত্রেরা কোনো সাহায্য করবে না?

—বলছে তো করবে।

—কিন্তু ভরসা করতে পারছ না?

—না।

ও হাসলে। বললে, তার চেয়ে অন্য কথা বেশি ভাবছি।

—কি কথা?

—কি কথা বল তো?

বুঝতে পারলাম। সামনের অঘ্রাণে আমাদের বিয়ের স্থির হয়েছিল। সেই কথা ও ভাবছে।

—বললে, সব ভেস্তে গেল।

—বললাম, কেন? কলকাতার লোকেদের কি বিয়ে হয় না?

—হয়। কিন্তু আমরা তো কলকাতার লোক নই খঞ্জনা। উদ্‌বাস্তু। গিয়ে কোথায় পৌঁছব, কেমন থাকব কে জানে। তাই ভাবি।

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললাম, অমন করে নিশ্বেস ফেল না। আমার ভয় করে।

ও হাসলে: জান খঞ্জনা, খবরের কাগজে এই উদ্‌বাস্তু কথাটা পড়ি আর ভাবনা আসে।

—ভাবনা কিসের?

ভাবনা নয়? ছিলাম গেরস্ত, হতে চলেছি উদ্‌বাস্তু। সেটা যে কি, তা এখনও জানি না। ঘর নেই, বাড়ি নেই, আত্মীয় বন্ধু

নেই, সমাজ নেই, কিছু নেই। মানুষের একটা আশ্চর্য অবস্থা নয় কি? যখন মানুষ যাযাবর ছিল, কি বনে বাস করত, তখনও তার এমন অবস্থা ছিল না। নয় কি?

চুপ করে রইলাম।

বললে, বিয়ে আমাদের হবেই। কিন্তু কবে, কোথায়, কি ভাবে জানি না। তাই ভাবি।

বললাম, ভাবনার কিছু নেই। ভেব না। যেখানেই থাকি, কাছাকাছিই থাকব। অঘ্রাণ কোনো মতেই পার হতে দোব না। তুমি একটা পাশ করেছ, দুটো শাক-ভাত জুটিয়ে নিতে পারবে। নয় তো আমিও খাটব তার সঙ্গে। ক্লাস নাইন অবধি পড়েছি। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পড়াতে খুব পারব। বাবার কথা ভাবছ? বাবা তো চাকুরে নন, ডাক্তার। দুটো ওষুধপত্তর আর দুখানা চেয়ার টেবিল নিয়ে বসলে পেটের ভাত করতে পারবেন। আমি তো সেজন্যে ভাবি না। ভাবনা এই পথটুকুর জন্যে। ভালোয় ভালোয় এইটুকু পার হতে পারলেই আর ভাবনা নেই।

ও চুপ করে রইল।

বললাম বটে এই পথটুকু; কিন্তু পথে নেমে দেখলাম দুরন্ত পথ। শেষ হতে চায় না। নৌকা, স্টীমার, রেল। প্রত্যেকটাই চলেছে তো চলেছে। কোনোটাই পৌঁছুতে চাচ্ছে না। কলকাতা কত দূরে সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারনাই ছিল না।

কি হয়তো যতদূর আমার, আমার কেন সকলেরই মনে হল, অত দূর নয়। সময়ের দিক দিয়েও না, মাইলের দিক দিয়েও না। ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার জন্যে অমনি মনে হচ্ছিল।

আসলে দূর কাছে মনের উপরেও অনেকখানি নির্ভর করে। দেশে গাঁয়ে থাকতে মাঠ ভেঙে স্কুলে যেতাম। একই পথ। যাবার সময় মনে হত, এই তো এসে গেলাম। আসবার সময় সেই পথই যেন আর ফুরোতে চাইত না।

চলেছি তো চলেছি।

চালানী জন্তু যেমন একটুখানি জায়গার মধ্যে ঘেঁষা ঘেঁষি করে জড়ো হয়ে থাকে, আমরাও তেমনি চলেছি।

নিস্তব্ধ।

কেউ কোনো সাড়া দিচ্ছেনা। কথা কইছে ফিস ফিস করে। পাছে কেউ শুনে ফেলে। যেন চুরি করে পালাচ্ছি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু ঘুমোবার জায়গাও নেই, মনও নেই। কখনও কখনও দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে একটুখানি তন্দ্রা যাচ্ছি। কোথাও হুট করে শব্দ হলেই চমকে জেগে উঠেছি।

এমনি করে স্টীমার ঘাট পর্যন্ত বেশ এলাম।

দু'পাশে অন্ধকার ক্ষেত আর ঝোপ-ঝাড়। তার মধ্যে প্রায় নিঃশব্দে দাঁড় বেয়ে চলেছে জনকয় মাঝি। নৌকায় দুরু দুরু বক্ষে আমরা ক'জন।

স্টীমার ঘাটে এসে দেখি, আমাদের মতো আরও কত লোক কত পথে যে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে তার শেষ নেই। এক এক জায়গায় এক এক দল জড়সড় হয়ে বসে।

তাদেরই এক প্রান্তে আমরাও স্থান করে নিলাম।

গম্ভীর শব্দ করে স্টীমার এল। নামল খুব কম লোক। প্রায় সব গোয়ালন্দের যাত্রী। তারাও আমাদেরই মতো দেশ ছেড়ে চলেছে।

কি ভিড়! আর কি তাড়াহুড়ো!

ঠেলা ঠেলিতে দু'চারটে পড়ে না যায়।

এমনি করে আমরাও উঠলাম। কিছু পরে আবার গম্ভীর আওয়াজ করে স্টীমার ছেড়ে দিলে।

অনেকক্ষণ স্টীমার চলার পর কে যেন চীৎকার করে উঠল: ওমা, আমাদের পালু কই? ক্ষান্তকই?

পালু আর ক্ষান্ত বরুণদার বাবা-মা অর্থাৎ আমাদের নেতার বাপ মা!

কি সর্বনাশ। কোথায় তারা ?

উঠেছে কোথাও। স্টীমারেই কোথাও আছে।

কিন্তু এই ভিড়ে কি খুঁজে পাওয়া যাবে ?

অসম্ভব।

—বহু লোক ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমাদের গ্রামের লোকেরা তো বটেই, অন্য যাত্রীরাও।

ওমা! খোঁজ। খুঁজে দেখ। ইস্টিমার তো আর একটা সহর নয়। আমাদের বরিশাল হলে খুঁজে পাওয়া যেতনা। পটুয়াখালি হলেও না।

কিন্তু ইস্টিমার তো ইস্টিমার। খুঁজে পাওয়া যাবে না কেন ? খোঁজ।

ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগল বরুণদা আর আমাদের গ্রামের অন্য ছেলেরা। তার সঙ্গে আরও অনেক গাঁয়ের আরও অনেক ছেলে। কিন্তু তারা তো আর বরুণদার মা-বাবাকে চেনেনা। খোঁজাই সার।

তবু স্টীমার শুদ্ধ লোক ব্যস্ত হয়ে উঠল :

—বয়স কত ?

—গোঁফ-দাড়ি আছে, না নেই ?

—লম্বা না বেঁটে ?

—গায়ে কি আছে বলুন তো ? নিমা না পাঞ্জাবী ? একজন নিমা-পরা বুড়ো মানুষ ওই দিকের কোণে বসে ধুঁকছে দেখুন।

ওঁর গায়ে নিমা নয়, পাঞ্জাবী ছিল। তবু আমাদের গাঁয়ের ছেলেরা ছুটল সেইদিকে। কি জানি, পাঞ্জাবীটা হয়তো গরমে খুলে ফেলেছে। কি যা ভিড়, হয়তো লোকের চাপে ফর্দাফাঁই হয়ে ছিঁড়ে পড়ে গেছে। দেখে তো আসা যাক।

এমনি দৌড় ঝাঁপ, হাঁক-ডাক, খোঁজা খুঁজি চলল যতক্ষণ না স্টীমার গোয়ালন্দ পৌঁছুল। সেই সময় একবার শেষ চেস্টা হল, নামবার মুখে যদি খুঁজে পাওয়া যায়।

ষ্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে, ধোঁয়া ছাড়ছে।

বরুণদা আর ক'টি ছেলে, মুখ তাদের শুকিয়ে গেছে, বললে, তারা নিশ্চয় স্টীমারে উঠতে পারেনি।

তা কি করে হবে? ওরা একেবারে থুর থুরে বুড়ো-বুড়ি নয়, খেটে-খাওয়া সমর্থ মানুষ। বুড়ো হাবড়া, আধমরা লোক পর্যন্ত উঠতে পেরেছে, আর ওরা পারলে না? তা কি করে হয়?

হয়। বরুণের বাবা এত ব্যস্তবাগীশ যে বেশি ভিড় ঠেলাঠেলি করতে গিয়ে স্টীমার ফেল করা অসম্ভব নয়।

বাবা জিগ্যেস করলেন, তাহলে কি করা যাবে?

বরুণদা বললে, ট্রেন দাঁড়িয়ে। আপনারা অন্যদের গুছিয়ে নিয়ে চলে যান। এখানে থেকে লাভ নেই। বিপদ কখন কি ভাবে আসে বলা যায় না। আমার সঙ্গে হাবল থাক। আমরা ফিরে যাব। দেখি যদি পাওয়া যায়।

আমি তো কেঁদে ফেললাম।

কোনোদিকে সময় নেই সুস্থভাবে পরামর্শ করার। এদিকে ট্রেন ছাড়-ছাড়। ওদিকে স্টীমারেরও সেই অবস্থা।

বরুণদা আমার চোখের জল দেখলে কিন্তু কিছু বললে না। তখন কথা বলার সময় নয়। হাবলের হাত ধরে একরকম ছুটতে ছুটতে গিয়ে স্টীমারে উঠল। আর আমরা উঠলাম ট্রেনে। সত্যি, যতক্ষণ না হিন্দুস্থানের এলাকায় পৌঁছুচ্ছি ততক্ষণ কিছু বিশ্বাস নেই।

চোখের জল মুছে চুপ করে বসে রইলাম।

॥ দুই ॥

শেয়ালদা স্টেশনে নেমে আর একদফা কান্না এল।

যত আমি কাঁদি, তত মা। এখানে থাকব কি করে? একটুখানি জায়গা ইঁট দিয়ে ঘের করে নেওয়া। তার মধ্যে থাকব কি করে?

বাবা বললেন, থাকতে হবে। নইলে আর উদ্‌বাস্তু কিসের?

কারও কোনো কাজ নেই। ঘর নেই যে, ধোয়া-মোছা করতে হবে। গোয়াল নেই যে, গরুর পরিচর্যা করতে হবে। বাবারও রোগী নেই যে, চিকিৎসা করতে হবে।

শুধু খাওয়া আর থাকা।

বাবার আর আমার কাজই হল, হয় তিনি নয় আমি, নয় আমরা দুজনে গেটে দাঁড়ান। যত ট্রেন আসছে তাতে বরুণদা আর তার বাপ-মা নামছে কি না দেখা।

—না।

সাতদিন সাত রাত্রি কেটে গেল, তাব মধ্যে কোনো গাড়িতে ওরা কেউ নামল না। এমন কি হাবল পর্যন্ত না, যে, একটা যা-হোক-কিছু খবর পাব।

আমি তো ভেঙ্গে পড়লাম।

—কি হল তাদের?

অনেক কিছু হতে পারে। স্টেশনে উদ্‌বাস্তুদের মুখে রোজ যে সব গল্প শুনি তার কোনো একটা ঘটেছে কল্পনা করলেও গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

সেই সব শুনে শুনে মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে, ওদের সম্বন্ধে আমরা আলোচনাই করি না।

গেটে গিয়ে দাঁড়াই। ট্রেন আসে। যাত্রীরা নামে, গেট দিয়ে

বেরিয়ে নিজের নিজের জায়গায় চলে যায়। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কেউ কারও দিকে চাইতেই পারি না।

—আজ কাল উদ্‌বাস্তু কত কম নামছে দেখছিস?

—হ্যাঁ, কেন বল তো?

—কি জানি। হয়তো আসছে না। আসতে দিচ্ছে না। কি হয় তো আপস হয়ে গেছে। আসবার দরকার হচ্ছে না।

পরে শুনলাম, তা নয়। ট্রেনভর্তি উদ্‌বাস্তু আসছে। কিন্তু তাদের আর এখান পর্যন্ত আসতে দেওয়া হচ্ছে না। রাস্তায় নানা জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। উদ্‌বাস্তুদের জন্যে সে সব জায়গায় শিবির খোলা হয়েছে।

শিবির! কিসের শিবির! যুদ্ধ লেগেছে নাকি যে, শিবির খোলা হয়েছে?

না, যুদ্ধ নয়। কিন্তু তারও বাড়া। যুদ্ধেও মানুষ এত কষ্ট এত অত্যাচার ভোগ করে না।

তবে কি বরুণদাদের রাস্তায় কোথাও নামিয়ে নেওয়া হয়েছে? কোনো শিবিরে?

তাই বটে। কিন্তু খবরটা পেতে আরও কয়েকদিন লাগল।

কালকের বাসি একখানা রুটি দিয়ে চা খাচ্ছি, বাবার গলা পেলাম, দেখ, কারে আনছি।

—দেখি বরুণদা!

সমস্ত দেহ ঠক ঠক করে কেঁপে উঠল। চলকে পড়ে গেল খানিক চা। কি ব্যাপার! ওর বাপ-মা কোথায়?

জানা গেল, খবর খারাপ নয়, ভালোই।

অনেক কথা। বরুণদা বসে বসে বলতে লাগলেন:

হাসির কথা। আপনারা শুনতে পাচ্ছিলেন বাবার চীৎকার: উঠে পড়, উঠে পড়। ইস্টিমার বেশিক্ষণ দাঁড়াইব না।

মা বললে, হ্যাঁ, শুনছিলাম বটে। সে কি উনি হাঁকছিলেন?

উনি ছাড়া আর কে? ওই জনসমুদ্রের মধ্যে ওঁর মতো ব্যস্তবাগীশ কেউ ছিল না। উনিই হাঁকছিলেন! তারপরে সবাই উঠে পড়ল, উনি আর পারলেন না। নিজেও পারলেন না, মাকেও উঠতে দিলেন না!

মা হেসে বললে, হ্যাঁ। বরাবরই খুব ব্যস্তবাগীশ মানুষ। কিন্তু নৌকোতে তো চুপ করে এসেছিলেন।

—সেটা ভয়ে। স্টীমার যখন এসে গেল, ওঁরও সাহস বেড়ে গেল। ভাবলেন বোধ হয় আর ভয় নেই। 'হিন্দুস্থানে আইস্যা গিছি'। অমনি ব্যস্ততা আরম্ভ হল!

সবাই হাসতে লাগলাম।

—তারপরে?

—ওই স্টীমারেই আবার ফিরে গেলাম। গিয়ে দেখি, স্টেশনের এক কোণে ভিজে বেরালের মতো বসে। স্টীমার ছেড়ে দেওয়া মাত্র স্টেশন নির্জন হয়ে গেল। সেই নির্জন স্টেশনে উনি আর মা। আমরা গিয়ে দেখি ভয়ে মানুষটা ছোট হয়ে গেছেন। মা কত সাহস দিয়েও এক ফোঁটা জল খাওয়াতে পারেননি। আমাদের দেখে বাবার কী রাগ!

—কেন?

—'আমাদের ফেলে চলে গেলি'? তাঁকে কিছুতে বোঝাতে পারি না, আমরা ফেলে চলে যাইনি, আপনারাই উঠতে পারলেন না। মা বললে আমি উঠতে পারতাম, ওই আমাকে উঠতে দিলে না। তখন বাবা বললেন, 'হু, আমিও উঠতে পারতাম। কিন্তু ইস্টিমার দাঁড়াইল না।'

—তারপরে?

—তারপরে পরের স্টীমারে আবার ফিরে এলাম। ভাবতে ভাবতে আসছি, কলকাতা সহর চিনি না, আপনারা কোথায় গিয়ে উঠলেন জানি না, কি করে আপনাদের খুঁজে পাব?

বটেই তো। খোঁজা কি সোজা কথা!

—মাঝখানে আমাদের সব নামিয়ে দিলে। বললে, এইখানে থাকবার খাবার জায়গা হয়েছে। কলকাতায় আর পা ফেলবার জায়গা নেই।

—তা আসতে এত দেরি কবলে কেন? যত গাড়ি আসে, আমরা সব গাড়ি দেখি, তোমরা আসছ কি না। কত ভাবনা যে হয়েছিল তা আর বলবার নয়।

—ভাবনার তো কথাই। কিন্তু করব কি? ওই যে ভয়, সেই ভয়েব ধাক্কা কাটাতে এতদিন লাগল।

—কেন?

—কি জানি। বাবা কি বকম মুষড়ে গেছেন। এখন কিছুটা ভালো। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। তবু আপনাদেব জন্যে মনটা খুব অস্থির হয়ে উঠেছিল। ভাবলাম, দেখি খোঁজ পাওয়া যায় কি না।

—তা পাইলা তো?

বরুণদা হেসে বললে, খুঁজতে হল না। গেটের মুখেই কাকাবাবু দাঁড়িয়ে।

বাবা বললেন, প্রত্যহ প্রত্যে ক ট্রেনের সময় তোমার জন্যে দাঁড়াই যে! আমি আর খঞ্জনা। কোনোদিন দেখা পাই-না, আইজ পাইয়া গেলাম।

মাকে বললেন, বরুণের জন্যে চা বানাও। আমি দুইখান বিস্কুট লইয়া আসি।

স্টেশনটাকে আমার বিষ মনে হত।

সব সময় হাজার হাজার লোক। স্টল। মনে হত যেন মেলা বসে গেছে। তাদেরই পায়ের তলায় ইঁটের ঘেরা দেওয়া আমাদের গৃহস্থালী। সেইখানে খাওয়া, সেইখানে বসা, সেইখানেই শোওয়া। আব্রুর বালাই নেই।

পা।

মানুষ নয়, শুধু লক্ষ লক্ষ পা আমাদের চারিদিকে কিলবিল করছে। উপর দিকে চাইতে ভুলে গেলাম। গোটা মানুষটাকে দেখিনা। শুধু অসংখ্য পা চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

শেষে আর তাও দেখতাম না। শুধু অনুভব করতাম, সরু সরু থামের মতো কালো কালো চঞ্চল ছায়া আমাদের সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে।

ছুটো জিনিস শুধু আমাকে আকর্ষণ করত ঃ ইঞ্জিন আর অঞ্জনা।

রেলগাড়ির দেশে বাড়ি নয়। চড়া দূরে থাক, রেলগাড়ি চোখেও কখনও দেখিনি।

সেই আশ্চর্য যানের ইঞ্জিনখানা।

কি বিরাট দেহ, কি প্রকাণ্ড চাকা, কত বড় শক্তি আর কি প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ আওয়াজ! অত বড় ট্রেনখানাকে যেন ফুৎকার দিতে দিতে উড়িয়ে নিয়ে চলে! অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। চেয়ে চেয়ে ক্লান্তি আসে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যাই।

—আর দেখি অঞ্জনাকে।

নিতান্ত সাধারণ একটি উদবাস্তু মেয়ে। আমারই মতো দুঃস্থ। আমারই মতো ইটের ঘের-দেওয়া গৃহস্থালী। চুলে তেল নেই। শাড়ি মলিন, চিমটি দিলে ময়লা ওঠে। তাও জীর্ণ হয়ে এসেছে। অথচ যেন আমার মতো নয়। এই স্টেশনের নরককুণ্ডে আমাদের সমবয়সী যত মেয়ে আছে, তাদের কারও মতো নয়। আমাদের মধ্যে থেকেও আমাদের থেকে স্বতন্ত্র।

কাছে গিয়ে আলাপ করতে সাহস হয় না। কতটুকুই বা দূরে থাকে। দূর থেকে চাই। চেয়ে চেয়ে দেখি। তাও সোজা চোখে নয়, কটাক্ষে। কি জানি কি ভাবে।

ইঞ্জিন আর অঞ্জনা।

নামের মধ্যেও মিল রয়েছে।

এই খাটালের মধ্যে থেকে যখনই হাঁফিয়ে উঠি ছুটে যাই ইঞ্জিনের কাছে। ওর আসা যাওয়া দেখতে দেখতে মনে হত, ইঞ্জিনটা কলের নয়, ওর প্রাণ আছে। প্রকাণ্ড বড় শক্তিমান একটা জন্তু। মানুষের কাছে পোষ মেনেছে।

তার প্রকাণ্ড শক্তির খেলা দেখতে দেখতে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব ভুল হয়ে যেত।

ইতিমধ্যে বরুণদাকে পাওয়া গেল।

দুজনে গল্প হত স্টেশনের জনতা এবং জঞ্জাল থেকে দূরে একপ্রান্তে নির্জন একটুখানি জায়গায়।

আমি গাঁয়ের মেয়ে। নির্জন জায়গা কাকে বলে জানি। কলকাতায় নির্জনতা বলে কিছু নেই। সর্বত্রই ভিড়। সর্বত্রই কোলাহল। ওরই মধ্যে যেখানে একটু কম ভিড়, একটু কম কোলাহল, সেখানটাই নির্জন বলে মনে হত।

জিগ্যেস করতাম, এই খোঁয়াড়ে আর কতদিন কাটাতে হবে? আর তো পারি না।

বলত, আর একটু সুস্থ না হলে চাকরীর চেষ্টাও করতে পারছি না। বাবাকে নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়েছি।

—আমাদেরও তো সেই অবস্থা। বাবা রোজ বেরুচ্ছেন ঘর খুঁজতে। কোথায় ঘর? একটা আস্তাবল পর্যন্ত কোথাও খালি নেই। যা পাওয়া যাচ্ছে তার অসম্ভব ভাড়া। অত টাকা বাবার দেবার সাধ্যি নেই। কোনোটা যদি বা সাধ্যির কাছাকাছি আসছে, তারা উদ্‌বাস্তুকে ভাড়া দেবে না।

চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বরুনদা বললে, এখানে তো তবু ভালো আছ। ছায়া আছে, একটু হাওয়াও আছে। ওখানে চনচনে রোদে মাঠ ফেটে যাচ্ছে। সেই মাঠে, সেই রোদে ছোট ছোট কুঁড়ে। হাত তিনেক উঁচু দেওয়ালের উপর টিনের চাল। হামা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। পা মুড়ে শুতে হয়।

সে যে কি কষ্ট ভাবতে পার না। বাবা সেইজন্যেও আরও সারছেন না।

কিন্তু এই ভিড়, এই নোংরা তো নেই।

—তা নেই।

—আর এই বে-আব্রু অবস্থাও নয়।

তা নয়। তবে কি জান, দু'জায়গাই কষ্টকর। সেখানে এক রকমের কষ্ট, এখানে আর এক রকমেব। দুটো জায়গার মধ্যেই পছন্দ করার কিছু নেই।

—তা তো বুঝি। কিন্তু আর যে পারি না।

অঞ্জনা যাচ্ছিল পাশ দিয়ে কোথায়।

জিগ্যেস করলাম, ওই মেয়েটিকে দেখলে?

—দেখলাম। ভালো করে দেখিনি যদিও। কেন? কি হয়েছে?

বললাম, হয়নি কিছুই। খুব আশ্চর্য মেয়ে নয়?

—মেয়ে মাত্রই আশ্চর্য। বিশেষ করে ওই বয়সের। তার চেয়ে বিশেষ কিছু আশ্চর্য বলে তো বোধ হল না।

—ভালো করে দেখনি তাই।

—তা হবে।

—এখানকার একঘেয়ে জীবনে দুটো আশ্চর্য জিনিষ আছে, একটি ইঞ্জিন আর একটি ও।

—তাই নাকি?

ও হেসে উঠল। বললে, ইঞ্জিনের মধ্যে দেখবার থাকতে পারে। কিন্তু ওই মেয়েটির মধ্যে কি পেয়েছ জানি না।

আমিও হাসলাম: তোমাদের চোখ নেই। তোমরা মেয়েদের বাইরেটা দেখ, আমরা ভিতরটা।

—তার মানে উভয়েই আধখানা করে দেখি।

—আমরা যে বাইরেটা দেখি না তা তো নয়। বাইরেটা দেখি,

সেই সঙ্গে ভিতরটাও। তোমরা শুধু বাইরেটা দেখ, ভিতরটা দেখই না।

ও হেসে বললে, তোমরা ভুল কর।

—কেন?

—আমরা আধখানা দেখি, বাকি আধখানা কল্পনা করে নিই। তাই মেয়েরা আমাদের চোখে সুন্দর। তোমরা পুরোটা দেখ। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে তোমাদের কোন মোহ নেই।

বললাম, মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের আর মোহ থাকবে কি? মেয়েরা তো মেয়েদের কাছে জানা। যেমন পুরুষেরা পুরুষদের কাছে জানা।

ও হেরে গেল।

বললে, ওই মেয়েটির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?

—না। নাম শুনেছি, অঞ্জনা।

—আলাপ করনা কেন?

—পারি না। লজ্জা করে।

বললে, মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবে, তার আর লজ্জা কি?

অঞ্জনা আবার ফিরে এল। আমাদের দিকে একবার আড় চোখে চেয়েই চলে গেল।

ও বললে, আশ্চর্যের কিছুই তো দেখলাম না। দুঃখে-দারিদ্র্যে ভেঙে পড়া আর পাঁচটা মেয়ের মতোই তো।

—না। অন্যরকম। থাকগে, তোমাদের শিবিরে আমাকে নিয়ে যাচ্ছ কবে বল।

—যেদিন খুশি।

—তাহলে কালকে?

—বেশ।

হেসে বললাম, আসল কথা একটু বাইরে বেরুতে ইচ্ছা করছে। প্ল্যাটফর্মটা একঘেয়ে হয়ে গেছে।

তাই হবে। বলে ও সেদিনকার মতো চলে গেল।

ট্রেনে করে বেশ খানিকটা যেতে হয়। ঘণ্টা দেড়েকের উপর। স্টেশনে পৌঁছুবার আগেই দেখা গেল লাইনের পাশে এক গোছা কুঁড়ে ঘর। অত্যন্ত নিচু নিচু।

হেসে বললে, ওইটে আমাদের শিবির।

—তাই নাকি ?

শিউরে উঠলাম। আমাদের প্ল্যাটফর্মের মতো নোংরা নয় বটে, কিন্তু ছায়া একেবারে নেই। আর ধুলোয় ভরা। সেই ধুলোয় এখানে-সেখানে কয়েকটি উলঙ্গ শিশু খেলা করছে। সর্বাঙ্গ ধূলায় ধূসর।

ঘরের সামনে দরজার গোড়ায় বসে তামাক খাচ্ছে কয়েকটি বুড়ো মানুষ। মনে হচ্ছে জীবন্ত নয়। চোখ বন্ধ, আলগা আলগা টান। যেন দেহটা কুঁড়ের সামনে বসে রয়েছে বটে, কিন্তু মানুষটা অন্যত্র চলে গেছে।

শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করলাম।

শ্বশুর ও অন্যান্য বুড়োদের মতো রোদ বাঁচিয়ে কুঁড়ের ছোট্ট ছায়ায় বসে চোখ বন্ধ করে নির্জীবের মতো তামাক টানছিলেন। হয়তো অন্য কিছু ভাবছিলেন। আমি আচমকা গিয়ে প্রণাম করতেই চমকে উঠলেন ঃ

—কে ?

শাশুড়ী বললেন, চিনতে পারছ না ? খঞ্জনা।

—বৌমা! তোমরাও এসেছ তাহলে ? চেনবার কথা তো নয়। চেহারা দেখে চেনা কঠিন। কোথায় আছ তোমরা ? তোমার বাবা-মা ভাল আছেন ? তাঁদেরও আনলে না কেন ? গাঁয়ের লোকদের দেখতে ইচ্ছে করছে।

ও বললে, তাঁদেরও তো তোমাদেরই মতো অবস্থা। একটু

সুস্থ হলে তাঁদেরও আনব একদিন, তোমাদেরও নিয়ে যাব একদিন।

বৃদ্ধ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন: যাবি? সবাইকে দেখতে ভারি ইচ্ছে করছে। কি কষ্টে যে আছি, নিজের চোখেই দেখ বৌমা! থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্ট, শোয়ার কষ্ট। কষ্টের আর শেষ নেই।

বৃদ্ধ কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলেন।

বললেন, এক এক সময় মনে হয়, বেশ ছিলাম গাঁয়ে। মারত, সেইখানেই একসঙ্গে মরতাম সব।

শাশুড়ী বললেন, তবে রাত্রে ভয় পেয়ে চেঁচাও কেন?

—কি রকম সব খারাপ স্বপ্ন দেখি। দিনের বেলা মন্দ থাকি না। সন্ধে হলেই বুকটা দুর্বল বোধ হয়। জোর পাই না। রাত্রে ঘুম ভালো হয় না। যত খারাপ স্বপ্ন দেখি।

ও সাহস দিলে, ভয়টা কিসের? এটা তো পাকিস্তান নয়, হিন্দুস্থান।

—তা জানি। কিন্তু আলো কমে গেলেই বুকটা দুর্বল হয়। হলেই ভয় পাই।

ও আবার সাহস দিলে, ভয়ের কিচ্ছু নেই। দেখ তো, এই-খানেই আবার আমরা চাঁদাই গাঁ গড়ে তুলব।

উনি হাসলেন: তা কি হয় রে বোকা! চাঁদাই চাঁদাই, তা আর নতুন করে গড়া যায় না।

—কেন হয় না? আমরা যেখানে থাকব সেই তো চাঁদাই।

—না। যদি আমাদের গাঁয়ের সব লোক ওখানে যেমন করে ঘর বেঁধেছিলাম তেমনি করে ঘর বাঁধি, তেমনি রাস্তা, তেমনি পুকুর-বাগান, তেমনি সব, তবু চাঁদাই হবে না।

—কেন?

—সেই মাটি কোথায় পাবি? শুধু মানুষ নিয়েই কি গাঁ? মাটি চাই না?

কিন্তু এ প্রসঙ্গ বোধ হয় ভালো লাগছিল না। জিগ্যেস করলেন, তোমার বাবা কি করছেন?

বললাম, কি আর করছেন? সমস্ত দিন ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যদি কোথাও একটু প্র্যাকটিসে বসতে পারেন।

বৃদ্ধ হাসলেন। খুব তিক্ত একটি হাসি।

বললেন, সেখানে বাঁধা ঘর ছেড়ে এসে এখানে ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছেন! হায় হায় হায়! পেলেন?

—কোথা পাবেন?

—পাবেন না। আর আমরা ঘর পাবনা।

ও বললে, কেন পাবেন না। কলকাতার মতো সহরে কি ঘরের অভাব। খুঁজে দেখতে হবে।

—দেখুন।

বলে বৃদ্ধ বিরক্তভাবে হুঁকোয় টান দিলেন।

জিগ্যেস করলাম, আমাদের গাঁয়ের আর কেউ কি এখানে থাকে?

বৃদ্ধ আবার হেসে উঠলেন: কোথা পাবে? কালবোশেখীর ঝড়ে তা ওড়ে, ডাল ভাঙ্গে। তখন কে কোথায় ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে তার ঠিকানা থাকে? তেমনি হয়েছে। বেরিয়েছিলাম সব একসঙ্গে। এখন কে যে কোথায়, কেউ জানে না।

—সত্যি।

—জিজ্ঞেস করলাম, হাবল কোথায়?

বৃদ্ধ বললেন, নেই।

হাবলের বাড়ির সব আমাদের সঙ্গেই শিয়ালদা'য় নেমেছিল। নামতেই কে যেন আত্মীয় এসে ওদের ছো মেরে নিয়ে চলে গেল। কে আত্মীয়, কোথায় চলল, কিছুই জানিয়ে যাবার সময় পেলেনা।

বৃদ্ধ বললেন, হাবল বোধ হয় জানে না। সেও সেইখানেই গেছে। কিংবা হয় তো পথে পথে খুঁজছে!

বৃদ্ধ আবার হা হা করে হেসে উঠলেন।

ও বললে, গাঁয়ের লোকদের খবর নিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কোথায় খবর নেবে? তার পরে, আমারই বা সময় কই? একটু সুস্থ না হলে কিছুই করতে পারছি না।

বৃদ্ধ বললেন, এখানে যারা আছে তাদের কাউকে চিনি না। কোথায় ময়মনসিং, কোথায় পাবনা। কোথায় বগুড়া, এই সব। কথাই ভালো করে বুঝি না, আর আলাপ করব কি?

বললাম, আমাদের শেয়ালদা স্টেশনের মতোই।

সেও তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

এক ঠোঙাতে সাড়ে বত্রিশ ভাজার মতো। হইছে ভালো!

বৃদ্ধ আবার হা হা করে হাসতে লাগল।

বললেন, আমাদের চাঁদাই গ্রামের কথা বলছ, অমন গ্রাম আর হয় না। আর হবে না। আইজ যদি চাঁদাই যাও, দেখবে সে চাঁদাই নাই। কার বাড়ি কেডা দখল করছে। গ্রাম একেবারে বইদলা গেছে গিয়া।

বললেন, তোমরা জান না, আমরাই তখন ছোট। গ্রামে একবার বান আইছিল। ভয়ঙ্কর বান। একখানা ঘর আস্ত ছিল না। সারারাত সবাই এক একটা উঁচুপাড়ে বইস্যা। সকালে ফিরে এসে আর নিজের নিজের ঘর চিনতে পারি না। তারপরে বাড়ি-ঘর আবার সব হল। কিন্তু বাবা বললেন, সে চাঁদাই আর হল না।

বৃদ্ধ আপন মনে তামাক টানতে লাগলেন।

॥ তিন ॥

সন্ধ্যাবেলায় বাবা ফিরলেন চিন্তিত মুখে। একটা ঘরের সন্ধান পেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন।

বললেন, ঘর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাবছি।

মা বললেন, পাওয়া যদি যেতে পারে, তাহলে ভাবনার কি আছে? কি রকম ঘর?

বাবা বললেন, একখানা ঘর। সেইটেকে টিনের পার্টিশন দিয়ে দু'খানা করতে হবে। একখানা ছোট, সেইটেতে ডিসপেন্সারী অন্যটায় সকলের শোয়া। ভেতর দিকে একটা বারান্দা। তারই একটা কোণ ঘিরে নিয়ে রান্নাঘর হবে।

—খাওয়া?

—বারান্দাতেও হতে পারে, শোবার ঘরেও হতে পারে। একটি কল, একটি পায়খানা, সকলের সঙ্গে।

—আরও ভাড়াটে আছে?

—আছে বই কি। প্রতিঘরে একটি করে পরিবার।

ঘর পাওয়া গেছে শুনে মায়ের মুখে যেটুকু আলো জ্বলে উঠেছিল, তা ধীরে ধীরে নিভে আসছিল।

—জিগ্যেস করলেন, ঘরখানা কি রকম?

বাবা ইতস্তত করতে লাগলেন। বললেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। জানালা-টানালা আছে মনে হল। কিন্তু তা দিয়ে আলো হাওয়া আসে কি না জানিনা।

—ভালো করে দেখে এলে না?

—দেখব কি? আমি যখন গেলাম তখন উনুনে ধোঁয়া দিয়েছে। বোধ হয় দশ-পনেরোটা উনুনের ধোঁয়া। গোটা বাড়ি অন্ধকার, দেখবার উপায় ছিল না।

মায়ের মুখ আরও অন্ধকার হল : বাবা!

বাবা বললেন, কাল সকালে আর একবার যাব ভাবছি। আবার ভাবছি গিয়ে লাভ কি ?

—কেন ?

—দেড়শো টাকা ভাড়া। তিনশো টাকা সেলামি।

—বাবা!

—কইলাম, মশায় আমরা পাকিস্তানের উদবাস্তু। অত টাকা কোথায় পাব। একটু ক্ষমা ঘেন্না করুন, ভাড়ার দিক দিয়েও, সেলামীর দিক দিয়েও। শুনে ভদ্রলোক চমকে উঠলেন : পাকিস্তানের উদবাস্তু। সেটা তো বলেন নি। কইলাম, সেটা আমার চেহারায় মালুম পাচ্ছেন না? কইলেন, না। তাহলে সেলামি আরও দু'শো বেশি লাগবে। কইলাম কন কি মশয় ? কইলেন, হ্যাঁ। পাঁচশো লাগবে।

আমরা চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন, তাও দিতে পারি। কিন্তু দিলে খাব কি ?

আমি বললাম, এখানে বসে কাজ নেই বাবা। ঘর নিয়ে বসলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু আয় হবে না।

—তা তো হবেই না। সরকারী যে সাহায্যটুকু এখানে পাচ্ছি, তাও পাবনা।

—আমি বলছি, একটুদূরে গাঁয়ের দিকে খবর নাও। সস্তায় বাড়ি পাওয়া যেতে পারে।

বরুণদা এই সময় এসে গিয়েছিল। বললে, গাঁয়ে কি পয়সা আছে ? রোগী মিলবে অনেক। পয়সা মিলবে না।

বললাম, তেমনি করেই তো এতদিন দেশে চলে এসেছে।

বরুণদা বললে, তার সঙ্গে জোত-জমা ছিল।

—গ্রামে জিনিস পত্রও সস্তা।

—কিচ্ছু সস্তা নয়। আমি তো দেখছি, বরঞ্চ অনেক জিনিস

কলকাতার চেয়েও আক্রা। কাকাবাবু, আপনি খুঁজুন, দেখুন, কিন্তু এখনই তাড়াতাড়ি কিছু করবেন না।

বাবা ঘুরছেন, দেখছেন, খুঁজছেন। বরুণদার কথাটা তাঁর মনে লাগল। বললেন, তুমি ঠিক কইছ বরুণ। তাড়াহুড়া করে কিছু করা ঠিক হবে না। রয়ে বসে দেখতে হবে।

বলেই, সমস্যাটার যেন সমাধান হয়ে গেল এমনি নিশ্চিন্তভাবে কান থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরালেন। গায়ে জামা না থাকলে বাবা বিড়ি কানে গুঁজে রাখেন।

বললেন, একটু পেট্রল যোগাড় করে দিতে পার বরুণ?

—পেট্রল!

বরুণ আকাশ থেকে পড়ল। শেয়ালদা স্টেশনের উদবাস্তু শিবির জ্বালিয়ে দেওয়া ছাড়া পেট্রোল কোন কাজে লাগতে পারে!

—পেট্রোল কি করবেন?

—আমার লাইটটা বেকার হয়ে গেছে হে, পেট্রলের অভাবে। বড় বেশি দেশলাই খরচ হচ্ছে। তোমার কাকিমা বড় খিচখিচ করেন।

বলে মায়ের দিকে চেয়ে হা-হা করে হাসতে লাগলেন। অনেকদিন পরে বাবার মুখে এমন সাদা হাসি দেখলাম। এখানে আসা পর্যন্ত তাঁকে এমন করে হাসতে দেখিনি। আশ্চর্য রকম মিষ্টি লাগল হাসিটা।

বোঝা গেল, বাড়ি ভাড়া নেওয়া সম্বন্ধে উনি মনঃস্থির করে ফেলেছেন।

বরুণ উঠছিল।

বাবা জিগ্যেস করলেন: উঠছ?

—উঠি এইবার।

—একটু চা খাইবা না?

মা হাসলেন। আমিও। সেই পুরোনো কৌশল!

দেশে থাকতে বাবা চা'টা বড় বেশি খেতেন। মা সেটা পছন্দ করতেন না। বারে বারে ওঁকে চা দিতে আপত্তি করতেন। বাবা করতেন কি, বন্ধু বান্ধব কেউ এলে তাঁর নাম করে চা চাইতেন। আপত্তি করার যো থাকত না। তাঁকে চা দিলে তার সঙ্গে বাবাকেও দিতে হত। কিন্তু মাও কম যেতেন না। তিনি বাবাকে আধ পেয়ালা চা দিতেন।

সেই কথা মায়েরও মনে পড়ল। আমারও।

কিন্তু আজ আর মা আপত্তি করলেন না। বরং যেন একটু খুশিই হলেন মনে হল। বরুণের সঙ্গে বাবাকে পুরো এক পেয়ালা চা-ই দিলেন।

বরুণের মনে বরাবরই খুব ভরসা আছে।

আমাকে বললে, তুমি কিছু ভেবনা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বললাম, কি করে?

—তা জানি না।

বললাম, আর ঘর খুঁজতে হবে না শুনে বাবার মনটা তো হালকা হয়ে গেল। তোমার মনেও ভরসা আছে, বলছ সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তো ভরসা পাইনা।

বললে, পাবে, পাবে, তুমিও ভরসা পাবে। আবার আমরা ভদ্রলোকের মতো থাকব। এমনি ভাবে বেশিদিন থাকতে হবে, এ আমি ভাবতেই পারিনা।

—ভাবতে আমিও পারিনা। ভাবতে গেলে মাথা ঝিম ঝিম করে। আবার দেখ, এখানে শুই-বসি, ঘোরা ঘুরি করি, ভাবতে পারি না যে কখনও ভদ্রভাবে ছিলাম। মনে হয়, চিরজীবন এইখানেই কাটালাম বুঝি।

হাসলাম।

বরুণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চায়। ব্যথায় ভারি হয়ে যায় তার চোখ।

বললে, দেশের কথা তোমার মনেই পড়ে না?

—কেন পড়বে না? কখনও কখনও পড়ে। কিন্তু আবছা আবছা, স্বপ্নের মতো। মনে হয় ওটা স্বপ্ন, এই যে জীবন এইটেই সত্যি।

বরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল যেন। মুখে কিছু বললে না।

জিগ্যেস করলাম, আবার কবে আসছ?

—রোজই তো আসছি।

তুমি এলে যেন দেশের স্বাদ পাই। কিছুক্ষণের জন্যেও মনে হয় দেশেই আছি বুঝি। এদের দিকে চাইলে আবার যেন হারিয়ে যাই।

হাসলাম।

বরুণও হাসলে: হারিয়ে যাওয়ার মতোই ব্যাপার। জানা শোনা হয়েছে এদের সঙ্গে?

—না। চেনা শোনা করার আগ্রহও নেই।

—কেন? একই দেশের লোক।

—সত্যি। কিন্তু মনেই হয় না তা।

না। পূর্ববঙ্গ থেকে সবাই এসেছি। সকলের দুঃখ এবং দুর্দশা একই। অথচ কেমন মনে হত যেন বিদেশে কোনো মুসাফির খানায় দৈবাৎ এক সঙ্গে জুটে গেছি অনেক লোক। অপেক্ষা করছি নিজের নিজের গাড়ির। গাড়ি এলেই যে যার নিজের নিজের গন্তব্যস্থলে চলে যাব। কারও সঙ্গে তাই আলাপ করতে ইচ্ছা হয় না।

শুধু একজনের সঙ্গে আলাপের লোভ আছে: অঞ্জনার সঙ্গে। আর সে সুযোগও সেইদিনই জুটে গেল।

বরুণকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে ফিরছি, গেটের ধারেই তার সঙ্গে দেখা।

কোথায় যেন যাচ্ছিল সে। অথবা কোথাও যাচ্ছিল না, সব সময় অকারণে যেমন ব্যস্তভাবে ঘোরা ঘুরি করে থাকে তাই করছিল।

চোখে চোখ পড়তেই হাসলে।

সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল।

প্রত্যুত্তরে আমিও হেসেছিলাম কি না মনে নেই। যদি হেসে থাকি অজ্ঞাতসারেই হেসে থাকব।

ও চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে এল।

জিগ্যেস করলে, তোমার নাম কি?

বললাম।

—দেশ কোথায়?

বললাম।

—কিছু ব্যবস্থা হল?

—কিসের?

—চাল-ডালের, কাজ কর্মের, বাড়ি ঘরের?

—না। তোমাদের?

—চেষ্টা হচ্ছে।

—আমাদেরও।

—নিজের লোকজন আছে? সুপারিশ করবার?

—কোথা পাব?

—তাহলেই তো মুস্কিল।

অঞ্জনা ঠোঁট বেঁকালে: আমাদেরও তো সেই অবস্থা। মুরুব্বি নেই। বাবা সারাদিন পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। কাজ কিছুই হচ্ছে না।

জিগ্যেস করলে, জায়গাটা কেমন লাগছে?

—বিশ্রী।

—নরককুণ্ড বল। সেখানেও হয়তো পা বাড়াবার জায়গা আছে। এখানে তাও নেই।

অঞ্জনা হাসলে।

বললে, কবে যে নরক থেকে মুক্তি পাব জানি না।

বললাম, কোনো দিনই পাব না বোধ হয়। এ একেবারে নাগপাশের মতো জাপটে ধরেছে। এই খানেই পচে-পচে মরতে হবে।

—আশ্চর্য নয়।

অঞ্জনা বিরক্তভাবে আপন মনেই কি যেন বিড় বিড় করলে। মুখের ভাব বদলে গেছে। সেই হাসি-হাসি ভাব আর নেই। চোখ যেন সাপের মতো চিকচিক করছে।

হঠাৎ প্লাটফর্মের ওদিকে একটা সোরগোল উঠল। কে যেন কেঁদে উঠল। স্ত্রীলোকের কণ্ঠ। তার সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠের কলরবও।

পারিবারিক গোলমাল বোধ হয়।

দুজনেই চমকে উঠলাম।

—কি ব্যাপার ?

সহানুভূতির জন্যে নয়। অনেকটা কৌতুহলের জন্যই দুজনে সেদিকে ছুটলাম।

গিয়ে দেখি, ইতিমধ্যেই বহুলোক সেখানে জুটে গেছে। বহু নারী ও পুরুষ।

কেউ বললে, এখনই হাসপাতালে পাঠাও। অ্যাম্বুলেন্স ডাকো, ডাক্তারকে খবর দাও।

—কলেরা।

ওই পরিবারে একটি ছোট ছেলের কলেরা। খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম নেই কোনো ছেলেরই। পেটের দায়ে যা পাচ্ছে খাচ্ছে।

এতগুলি লোক একটি ছাউনির মধ্যে। প্লাটফর্মে সব সময়ই একটা ভ্যাবসা দুর্গন্ধ। কলেরা হওয়ার আশ্চর্য কিছুই নেই। বরং আরও আগে হয়নি কেন সেইটেই আশ্চর্য।

উদবাস্তু সমস্ত বাপমায়ের মুখ দুশ্চিন্তায় অন্ধকার। একটার হয়েছে, বাকিগুলোর হতে কতক্ষণ!

এই রকম নানা আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ঃ সরুন, সরুন। আমাকে একবার দেখতে দিন। ভেতরে যেতে দিন একবার।

ঠিক আমারই পিছনে।

চেয়ে দেখি বাবা। তার হাতে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্স। আশ্চর্য -হলাম, আসবার সময় কত জিনিস ফেলে আসতে হয়েছে। কাপড়-জামার বাক্স-পেঁটরা থেকে লেপ-তোষক, চেয়ার টেবিল কত কি! তার মধ্যে ওষুধের বাক্সটা বাবা মনে করে নিয়ে এসেছেন তো!

সবাই রাস্তা ছেড়ে দিলে।

বাবা গিয়ে নাড়ি দেখলেন। নানাভাবে রোগীকে পরীক্ষা করে ওষুধের বাক্সটা খুললেন। কি যেন একটু ভাবলেন। তারপর একটি ওষুধ বের করে রোগীর মুখে দিয়ে দিলেন।

সমাগত জনতার দিকে চে৷ বললেন, আপনারা একটু ভিড় ছাড়ুন। হাওয়া আসতে দিন। ভয় পাবার কিছু নেই। এখনি সেরে যাবে।

বাবার কণ্ঠে আদেশের সুর! সে সুর অমান্য করা যায়না। সবাই পিছু হঠে ভিড় ছেড়ে দিলে:

আমি তো অবাক।

এসে পর্যন্ত বাবাকে সব সময় কুণ্ঠিতই দেখেছি সকলের কাছে। হঠাৎ কি তিনি গ্রামে ফিরে এলেন? তাঁর কণ্ঠে পুরোনো আদেশের ভঙ্গী এসে গেল কি করে?

হাঁটুর উপর দুই হাত ছড়িয়ে বাবা উবু হয়ে বসে। সামনে রোগী জীবিত কি মৃত বোঝবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে ছটফট করছে। মাঝে মাঝে স্থির হয়ে যাচ্ছে। দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে। তার দুপাশে বসে আছে তার বাবা আর মা। নিঃস্পন্দ, নিঃশব্দ। বোঝা যাচ্ছে না তারাও জীবিত কি মৃত।

ভিড়ও সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ হয়ে গেল।

অঞ্জনা ফিস ফিস করে বললে, তোমার বাবা না?

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালাম,—হ্যাঁ।

উনি কি ডাক্তার?

—হ্যাঁ।

কি ভেবে জানিনা, অঞ্জনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

সকলের চোখে শ্রদ্ধা।

অথচ বাবার পরণের কাপড় ছিন্ন,খালি গা, কাঁধে একটা মলিন গামছা।

কতক্ষণ জানিনা, কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল।

. কাঠের পুতুলের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে জনতা। ক্রমাগতই চলতি পথে যাত্রীরা উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা কি। তাদের দাঁড়াবার সময় নেই। কারো অফিস, কারও ট্রেন দাঁড়িয়ে।

দেখতে দেখতে একটি কনস্টেবলও, কার হুকুমে জানি না, ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়াল।

জিগ্যেস করলে, এ্যাম্বুলেন্সকে খবর দেওয়া হয়েছে?

কে একজন উত্তর দিলে, হয়েছে

—কখন?

—অনেকক্ষণ।

—এখনও আসেনি?

—না।

কনস্টেবলটি হাসলে ঃ ওই রকমই অবস্থা।

জিগ্যেস করলে, উ কৌন হ্যায় ? ভগদর ?

—হ্যাঁ।

কনস্টেবলটি বোধ হয় ডাক্তারের শ্রী দেখে আবার হাসলে।

ডাক্তার কিন্তু এক দৃষ্টে রোগীর মুখের দিকে চেয়ে। বাইরের কোনো কথা তাঁর কানে যাচ্ছিল বলে বোধ হচ্ছিল না।

রোগী আর একবার ছটফট করে উঠল।

বাবা তাঁর বাক্সটি খুলে আবার একটা ওষুধ বের করলেন। কয়েকটি বিন্দুপ্রমাণ বড়ি রোগীর মুখে দিয়ে দিলেন। মনে হয় রোগী তা চুষতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে বাবা উঠে দাঁড়ালেন।

রোগীর বাপ-মা'র দিকে চেয়ে বললেন, আর ভয় নেই। এযাত্রা রোগী বেঁচে গেল।

আমরাও দেখলাম, রোগের লক্ষণ চলে গেছে।

বললেন, আমাকে না জিগ্যেস করে কিচ্ছু খেতে দেবেন না। আমি একটু পরেই আসছি।

তিনি ওঠবার আগেই অ্যাম্বুলেন্স এল। একেবারে তাদের ষ্ট্রেচার নিয়ে।

রোগীর বাপ-মা বললে, আবার কেন ? সেরে গেছে।

এতক্ষণ পরে এসেছে। রোগী মরে গেলে চলে যেত। কিন্তু বেঁচে যখন আছে তখন না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না।

বাবা বললেন, যাক না নিয়ে। হাসপাতালে গেলে যত্ন হবে, খাওয়া দাওয়া নিয়মমত হবে। নিয়ে যেতে দাও।

ওরা তখন ষ্ট্রেচারে করে ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলল। চিন্তিত মুখে বাপ চলল সঙ্গে।

তারপরেই এল একদল লোক।

হঠো, হঠো, হঠো।

ওরা প্ল্যাটফর্মকে রোগের বীজাণুমুক্ত করবে। অপেক্ষা করবার সময় নেই। বহু পরিবার। বহু লোক। বহু জিনিস পত্র। কেউ সরাতে পারলে, কেউ পারলে না। কেউ খবরটা বোঝবার আগেই ওষুধ মেশান জলের স্রোতে জিনিসপত্র সব ভেসে গেল।

তারা চলে যেতে আবার নতুন করে সংসার পাতবার আয়োজন সুরু হল।

॥ চার ॥

শিয়ালদা স্টেশনে বাবার মর্যাদা বেড়ে গেল। উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে রোগ লেগেই আছে। বাবা তাদের বিনা পয়সার চিকিৎসক। কিছু একটা হলেই তারা বাবার কাছে ছুটে আসে। বাবা ওষুধ দেন। কেউ তখনই সেরে ওঠে। কেউ বা ক'দিন ভোগে।

বাবা দুঃখ করেন, সেই মোটা বইটা ফেলে এসে ভালো করেন নি। এটা পাতলা বই। সব রোগের ওষুধ নেই।

মা বলেন, এরই দাম পাচ্ছ না। সেই মোটা বইএর ওষুধের দাম দিত কে? এইবার ফি নাও। নইলে আমাদেরই বা চলবে কি করে?

বাবা হাসলেন: ফিটা দেবে কেডা? ফি নয় গো, তবু পাঁচজনের উপকারে তো আসছি। ভগবানের ইচ্ছায় একটু নামও হচ্ছে।

—তা হচ্ছে।

আর নাম যখন হয় তখন বাড়াবাড়ি করেই হয়। স্টেশনময় রটে গেল, উদ্‌বাস্তু-দের মধ্যে এক জন বড় ডাক্তার আছেন। একেবারে ধন্বন্তরী। একটি ওষুধেই রোগ শেষ।

স্টেশনের খালাসীর বৌ এল তার ছেলেটিকে নিয়ে। পুয়ে পাওয়া ছেলে। গলা ছাড়া শরীরের সব যন্ত্রই বিকল। হাত-পা নাড়তে পারে না, অথচ চিলের মত চেঁচায়।

বললে, হাসপাতালে দেখিয়েছে। তা ছাড়া আরও ভারী ভারী অনেক ডগ্‌দর। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারেনি।

বাবা সারিয়ে দিলেন।

খালাসীর বৌ প্রণাম করে চলে গেল, প্রণামী দিলে না। দিন

গেলে তিন-চার টাকা কামায়। বললে, গরীব মানুষ। রুপেয়া কোথায় পাবে ?

তারপরে একটা ডাক এল রেলের কোয়ার্টার্স থেকে। খালাসীর ওই বৌটাই এনে দিলে। তার মেয়ের আপেণ্ডি-সাইটিস। ডাক্তার বলেছেন, অপারেশন করাতে হবে।

ইতিমধ্যে খালাসীর বৌ তাকে খবর দিলে, উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে একজন ভারী ডগ্‌দর আছেন। তাঁকে দিয়ে দেখাও।

যে ডুবতে বসেছে, সে কুটোগাছটাও ধরে। রেলের বাবুর অনেকটা সেই রকম অবস্থা। অপারেশনের নামে সবাই ভয় পায়। কি হবে না হবে কেউ বলতে পারে না! বেশ তো, অপারেশন তো হাতের পাঁচ, রইলই। ইতিমধ্যে হোমিওপ্যাথি একটু করালে দোষ কি? সেরে যেতেও তো পারে। তাহলে আর অপারেশনের ঝক্কি পোহাতে হয় না।

বাবাকে নিজে এসে নিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

'কলে' যাবার পোশাক নেই। ছ'টি পাঞ্জাবী এনেছিলেন। একটি ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। মায়ের রান্নাঘরের ন্যাতা হয়েছে। আর একটি, তারও অবস্থা জীর্ণ, মা সেইটি জড় পুঁটুলি অবস্থায় বের করে দিলেন। তাই প'রে বাবা 'কলে' গেলেন।

উদ্‌বাস্তু জীবনে বাবার প্রথম বাইরের 'কল'।

রোগী দেখে এসে সেই মোটা বইটার জন্যে দুঃখ করতে লাগলেন।

ছুটি টাকা ফি পেয়েছিলেন। উদ্‌বাস্তু-জীবনের প্রথম উপার্জন। রেলের বাবু সঙ্গে এসেছিলেন ওষুধ নিতে।

তাঁর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বাবা বললেন, আপনার মেয়েকে ভগবানের ইচ্ছায় আমি সারিয়ে দেব। কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।

—কি কাজ ?

পকেট থেকে টাকা দুটি বের করে বাবা বললেন, আমাকে ফি দিতে হবে না। টাকা নিন, একখানা বই আনিয়ে দিন। আমি সমস্ত বই দেশে ফেলে এসেছি।

ভদ্রলোক অবাক: কি বই?

—আমি নাম লিখে দিচ্ছি। দাম একটু বেশি। দশ-বারো টাকা হবে। এখনই নিয়ে আসুন। বইটা একবার দেখে আমি ওষুধ দোব।

টাকা দুটো তাঁর হাতে বাবা গুঁজে দিলেন। বিনা আপত্তিতে টাকা নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

মায়ের হাতে সেদিন একটিও পয়সা নেই। মা ভীষণ রেগে গেলেন।

বই আনতে দিলা অই ভালো। টাকা ফেরৎ দিলা ক্যান?

অবাক হয়ে বাবা বললেন, বা রে! বারো টাকার বই কিনে দিচ্ছে ভদ্রলোক। আবার ফি দেবে?

দেবে না? ওর মেয়ে যদি সেরে যায় দেবে না?

—সারুক, তবে তো।

বাবা সেই ছোট বইটাই ঘাঁটতে লাগলেন। কিন্তু তৃপ্তি হয় না। একবার করে পাতা ওলটান আর পথের দিকে চান। বাবুর ফিরতে কত দেরি?

দশটা বাজে। এগারোটা।

মা বললেন, খেতে হবে না? চান করে এস।

—এই যে, যাই।

বলেন আর পথের দিকে চা॰৲।

কি হল? বইটা কি পাওয়া যাচ্ছে না? না পাওয়া বিচিত্র নয়। অল্পদিন হল বইটা বেরিয়েছে। সব দোকানে আসেই নি হয় তো। নানা দোকান ঘুরতে হবে হয় তো।

বারোটা বাজতে মা আবার তাগাদা দিলেন।

সকাল থেকে একটি কাপ চায়ের উপর চলছে। বাবারও ক্ষুধা পেয়েছিল। মাথায় এক খাবলা তেল নিয়ে কাপড়-গামছা কাঁধে ফেলে কলের দিকে ছুটলেন। আমাকে বলে গেলেন, ভদ্রলোক বই নিয়ে ফিরলে দাঁড় করিয়ে রাখতে।

বাবা ছুটতে ছুটতে গেলেন আর ফিরলেন। পাছে ভদ্রলোককে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

—আসেন নি ?

—না ?

মাকে তাড়া দিলেন, দাও, দাও তাড়াতাড়ি দাও। ভদ্রলোক এসে পড়লে ভারী লজ্জা পাব।

মা ভাত বেড়ে দিতেই বাবা গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন।

আমাকে বললেন, এইভাবে থাকা, এইরকম খাওয়া, এতে ডাক্তারের প্রেষ্টিজ থাকে না। বুঝলি ?

বুঝলাম কিন্তু করাই বা যাবে কি ?

এইজন্যেই ঘর খুঁজছিলাম। বুঝলি ?

বললাম, তোমার প্র্যাকটিস জমছে বাবা। আর একটু জমলেই চেম্বার খুলবে।

এক গাল হেসে বললেন, আমিও তাই স্থির করেছি, জানিস ? এই চকের মধ্যে রোগী। এখন এইখানেই কাটাতে হবে। তারপর একটু পসার জমলে নাও না কেন বড় রাস্তার ওপরে চেম্বার।

ছ'মিনিটের মধ্যে বাবা খেয়ে উঠে পড়লেন। আমাদের তাড়া দিলেন : তোরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। ভদ্রলোক আসবার আগে। প্রেষ্টিজ তো রাখতে হবে।

আমরাও তাড়াতাড়ি খেয়ে বাসন মেজে ভদ্রলোক সেজে বসে রইলাম। কিন্তু ভদ্রলোক এলেন না।

জিগ্যেস করলাম, কি হল বাবা ?

বাবা রেগে গেলেনঃ দাঁড়া। তোদের সবেতেই তাড়া। মেয়ের অসুখ বলে তো আর কেউ আহার-নিদ্রা বাদ দেয় না। খেয়ে-দেয়ে আসবে অখন।

তিনটে বেজে গেল। চারটেও।

এবারে বাবা চঞ্চলতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

এইরকম, অবিকল এইরকম একটা কেস সারিয়েছি। রেমিডিটাও মনে আছে। ভাবলাম, অনেকদিনের কথা, বইটা দেখা ভালো, তাছাড়া বইখানা দরকারও পড়ছে। রোগীপত্তর দু'চার করে তো জুটছে। তারপর বললেন,

—বুঝলি রে, পালালো লোকটা। ফি'এর টাকা ফেরত পেয়ে গিয়েছে। অন্য ডাক্তারও ওৎ পেতে রয়েছে।

মা বলেন, ফি'এর টাকা ফেরৎ দিতে গেলে কেন? তোমার যে সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

ফেরৎ দিতে যাইনি গো, ফেরৎ দিতে যাইনি। অত দামের বই বলেই ফেরৎ দিলাম। আসল কথা কি জান?

বাবা একটা বিড়ি ধরালেন।

—পেছনে লোক লেগেছে' ডাক্তারের না জামা, না জুতো। কি রকম ডাক্তার। বললেই হল। দ্যাসের বাড়িতে কত জামা-জুতো ফেলে এসেছি, কেউ তো দেখতে যাবে না!

বাবা খুব বিচলিত হলেন।

—একটা ফর্সা জামা আর ভালো জুতো রাখতে হবে। নইলে প্র্যাকটিশ জমানো কঠিন হবে।

বললাম, বেশতো। তাই কেন না।

বাবা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, কিনব কোত্থেকে? কলসীর জল গড়াতে গড়াতে তলায় ঠেকেছে, ও থেকে আর কিছু করবার যো আছে?

আমরা ভয়ে চুপ করে রইলাম।

—একটা ভালো রোগী হাতছাড়া হয়ে গেল। একে আমি বাঁচাতে পারতাম। তাতে পয়সা তো আসতই, রেলের বাবু, কাঁচা পয়সা, পসারও বাড়ত।

মা বললেন, কাঁচা পয়সা তো বই কিনে দিতে পারলেন না কেন? উল্‌টে ফি'এর টাকা নিয়ে পালাল!

—আহা, বোঝনা কেন? পেছুনে লোক লেগেছে। নইলে পালাবার লোক নয়।

আমি মাকে চোখ টিপলাম ও নিয়ে মিছি মিছি তর্ক করে লাভ নেই। যা হবার হয়ে গেছে।

মা চুপ করে গেলেন।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হল। প্লাটফর্মের আলোগুলো জ্বলে উঠল।

দিনের বেলা প্ল্যাটফর্মটা ম্যাড়ম্যাড় করে। কেমন অন্ধকার বোধ হয়। লোকের ভিড়ে আর অন্ধকারে বিশ্রী লাগে। রাত্রে অতগুলো আলো জ্বললে রোশনাই হয়। অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম নানান উৎসবের পোশাক পরে। তখন প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই সেজে-গুজে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে।

কিন্তু সাজ-গোজ আর কোথায় পাব? এমনিই ঘুরি। সেই উদ্দেশ্যে উঠতে যাব এমন সময় সেই খালাসীর বৌটিকে সঙ্গে করে একটি ভদ্রমহিলা আপাদমস্তক একখানা মটকার চাদরে জড়িয়ে কুণ্ঠিতপদে উপস্থিত হলেন।

--ডাক্তারবাবু আছেন?

ভদ্রমহিলা একেবারে সামনে—তাড়াতাড়ি যে গায়ে একটা পাঞ্জাবী চড়াবেন তারও সময় নেই। গামছাটাই গায়ে জড়িয়ে এক পা এগিয়ে এলেন।

কি ব্যাপার? আমিই ডাক্তারবাবু।

ভদ্র মহিলা বললেন, সকালে আমার মেয়েকে আপনি দেখে এসেছেন। তারপর—

—তারপর আপনার স্বামী এলেন ওষুধ নিতে। তাড়াহুড়ো করে আসতে হয়েছিল, বই-টই কিছুই আনতে পারিনি। রোগটিতো সামান্য নয়। ফি'এর টাকা ফেরৎ দিয়ে তাঁকে বললাম একখানা বই কিনে আনতে। তিনি সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। ভাবলাম,

—ভাববার কিছুই নেই। উনি ওই রকমেরই মানুষ। এখনও পর্যন্ত বাড়ীও ফেরেননি।

বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: সে আবার কি! সমস্ত দিন কোথায় রইলেন ?

ভদ্র মহিলা এ প্রশ্নের আর জবাব দিলেন না।

জিগ্যেস করলেন, বইটার দাম কত ?

—ঠিক কত, তা বলতে পারব না। এখন তো সব জিনিসেরই দাম বেড়েছে। দশ-বারো টাকা হবে বোধ হয়।

ভদ্র মহিলা আঁচলের খুঁট থেকে দু'খানা দশটাকার নোট বের করলেন।

বললেন, এইটে রাখুন। বইটা কিনে আনুন আর আমাকে ভালো ওষুধ দিন।

হারানিধি ফিরে পেয়েছেন। বাবা পুলকিত হয়ে উঠলেন।

বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না মা। আপনার বাসা তো চিনি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি যাচ্ছি। ইতিমধ্যে এই ওষুধটা এক ডোজ খাইয়ে দিন। নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার মেয়েকে আমি সারিয়ে দোব।

ওষুধ দিয়ে ভদ্র মহিলাকে বিদায় করে বাবা মলিন পাঞ্জাবীটা গায়ে দিলেন। ওষুধের বাক্সটা বগলে নিলেন।

বিড় বিড় করতে করতে বলতে লাগলেন, ওষুধগুলো পুরোনো

হয়ে গেছে। নতুন ওষুধও কেনা দরকার। দেখি, দেখি, ছাতা। ছাতা নিয়ে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন।

ঘড়ির দিকে না চাইলে প্ল্যাটফর্মে বোঝাই যায় না রাত কতখানি হ'ল। সব সময় মনে হয় মাঝ রাত।

বাবা ফিরলেন তখন ন'টা বেজে গেছে।

বাঁ বগলে একখানা মোটা বই আর ছাতা। ডান বগলে ওষুধের বাক্স বেশ ব্যস্ত-সমস্ত হাসি খুসি ভাব।

বইটা কি পাই? কোনো দোকানে নাই। শেষকালে—, বাবা পাঞ্জাবীটা খুলে ফেললেন। তার নিচের গেঞ্জিটাও।

এখানে আসার পর থেকে বেশিক্ষণ জামা গায়ে রাখার অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গেছে।

ভিজে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বাক্যটা শেষ করলেনঃ শেষকালে একখানা পুরোনো বইএর দোকানে দেখি দড়িতে ঝুলছে।

বাবা হাসতে লাগলেন।

—বানরে কী বোঝে রসগোল্লার মর্ম!

নইলে এমন বই দড়িতে ঝোলে! অর্ধেক দামে পেয়ে গেলাম। বাকি টাকা আর গিন্নিকে ফেরৎ দিলাম না।

বাবা আবার হাসতে লাগলেন।

জিগ্যেস করলাম, রোগী কেমন দেখলে?

এর মধ্যে আর দেখা দেখি কি! রেমিডিটা আমার ঠিকই মনে ছিল। তবু একবার 'কনসাল্ট' করা। নতুন ওষুধ কিনলাম। তাই এক ডোজ দিয়ে এলাম। বলে এলাম, কাল সকালে খবর দিতে।

পকেটমারের ভয়ে বাবা টাকা-পয়সা পকেটে রাখেন না, ট্যাঁকে

গোঁজেন। সেখান থেকে কয়েকখানা নোট বার করে মায়ের দিকে চাইলেন।

কও তো একটা ইলিশ মাছ লইয়া আসি। অনেক দিন খাই নাই।

মাও হাসলেন ঃ এত রাত্রে পাইবা ?

—দেখি তো।

কয়েকখানা নোট মায়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দু'খানা নোট মুঠোয় করে বাবা ছুটলেন বৈঠকখানা বাজারে।

মা হাসলেন ঃ হায়রে পোড়া কপাল। যে দেশে মাছ বলতে গেলে কিনতে হয় না, সেই দেশের লোক মাছ খায় নাই কত দিন! দুটো পয়সা হাতে পেয়ে ঘুরছে মাছের জন্যে !

মা কপালে হাত দিলেন।

বললাম, ছুটলেন তো। এখন পাওয়া গেলে হয়।

কিন্তু, অদৃষ্টের জোর বলতে হবে। পাওয়া গেল। রূপোর মতো ঝক ঝকে চওড়া পেট একটা ইলিশ।

সেটা দুম করে নামিয়ে আমাকে বললেন, দেখ দেখি। ভালোই তো হইব মনে হয়।

আমাদের আর হাত দিতে হল না। চিলের মতো ছোঁ মেরে মা মাছটা হাতে তুলে নিলেন। উলটে-পালটে দেখে বললেন, ভালোই হইব। কিন্তু এ আমাদের পদ্মার ইলিশ নয়।

—তবে ?

—গঙ্গার।

—ক্যামনে বোঝলা ?

—গড়ন দেইখ্যা।

মা গড়নের দিক দিয়ে পদ্মার ইলিশ আর গঙ্গার ইলিশের পার্থক্যের বিবরণ দিলেন। সেই মনোজ্ঞ বিবরণ শুনতে আমরা সতৃষ্ণ নয়নে মাছ কোটা দেখছি, এমন সময় বরুণ এল।

এমন চমৎকার দিনে বরুণকে পেয়ে সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল : এস, এস, বরুণ এস।

কিন্তু বরুণের মুখ শুকনো। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। মুখ তামাটে। পাঞ্জাবীটা গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। সে আড়চোখে একবার ইলিস মাছের দিকে, তারপর আমাদের দিকে চাইলে।

বাবা জিগ্যেস করলেন, তোমার খবর কি বরুণ ? ক'দিনই যেন আসনি মনে হচ্ছে।

—আর বলেন কেনে ? ঝামেলার ঠেলায় অস্থির।

—আবার কি ঝামেলা ?

অর্থাৎ ইলিশমাছটা আনার পর থেকে পৃথিবীতে কোথাও আর ঝামেলা আছে, বাবা বিশ্বাস করতে নারাজ।

বরুণ বললে, ঝামেলার কি অন্ত আছে ? দু'দিন রিলিফ অফিসে ঘুরে আজ একটা হিল্লে হল।

—কিসের হিল্লে ?

—নামের গোলমালে 'ডোল' বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

—নামের আবার গোলমাল কি ? নাম পালটেছে নাকি ?

বরুণ হেসে ফেললে : আমরা পালটাইনি। যে লিখে নিয়ে গিয়েছিল সেই গোলমাল করেছে। ভুগতে হল আমাকে।

তা হোক। ইসে, তুমি এইখানে দুটি খেয়ে যাও। সারা দিন তোমার খাওয়া হয়নি বোধ হয়।

বরুণ স্বীকার করলে না বটে, কিন্তু বাবা ঠিকই ধরেছেন। আমাদেরও তাই বোধ হচ্ছিল।

দেশে থাকলে বরুণ এই নিমন্ত্রণ কখনই গ্রহণ করত না। কিন্তু বোধ হয় সে খুবই ক্ষুধার্ত ছিল। তার উপর ইলিস মাছের গন্ধ। একটু জেদা-জেদি করতেই সে রাজি হয়ে গেল।

এই সময় অঞ্জনা দূর থেকে ইসারায় আমাকে ডাকলে।

কাছে যেতে জিগ্যেস করলে, ইলিশ মাছ হচ্ছে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—দুটো লোক কি বলতে বলতে গেল শুনলে না ?

—না ?

—বললে, দেখ। এদের বলে উদ্‌বাস্তু! গোটা গোটা ইলিশ খাওয়ার ধূম দেখ। আমি তো অবাক!

॥ পাঁচ ॥

বরুণকে খুব বিমর্ষ বোধ হল।

সেদিন রাত্রে যখন এসেছিল, অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হয়েছিল। ভেবেছিলাম ওটা দেহের ক্লান্তি। সমস্ত দিন রিলিফ অপিসে ঘোরা-ঘুরি করায় ক্লান্ত। আজ মনে হল, ক্লান্তি শুধু দেহেরই নয়, মনের উপরও তার ছায়া পড়েছে।

হাতে ছিল একগাদা লজেন্‌স্‌ের প্যাকেট। ভেবেছিলাম আমার জন্যে এনেছে বুঝি। কিন্তু অত কেন?

গোটা কয়েক আমার হাতে দিয়ে বললে, এই করছি আজকাল।

—কি করছ?

—ট্রেনে লজেন্‌স্‌ ফেরি। খেতে তো হবে। বাবার মেজাজ খুব খারাপ। দিন রাত বকাবকি করছেন। হাতে যা ছিল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তা থেকে আর একটি পয়সা বার করবেন না। বলছেন, ওটা আমাদের সৎকারের খরচের জন্যে থাক। শেষে মাঠে ফেলে দিয়ে আসবি তো?

বরুণের মুখখানা কাঁদ-কাঁদ। বললে, মরণের কথা ভাবছেন শুধু। বোধ হয় আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

ওকে সান্ত্বনা দিলাম: ওসব কথা ভাবছ কেন? মরা কি কারও হাত-ধরা? মরব বললেই মরা যায়?

স্বীকার করলে: তা যায় না। কিন্তু ওঁর কষ্ট আর দেখতে পারছি না। মনে হচ্ছে, যেতে পারলে উনিও বাঁচেন, আমিও।

ফেরি করে কিছু হচ্ছে?

বরুণ হাসলে: কি আর হবে! রোজকার বাজার-খরচটা

কোনক্রমে হয়। বসে না থাকি বেগার খাটি। কিছু হলনা খণ্ডনা। সব মিথ্যে হয়ে গেল।

—কেন ?

—বাবা বলেন, মবতে আমার দুঃখ নেই। এ কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না। কেবল দুঃখু এই যে তোদের বিয়েটা দেখে যেতে পারলাম না।

চুপ করে রইলাম।

পরে বললাম, বেশ তো। বাবাকে বল না।

—তিনি যখন জিগ্যেস কববেন, খাওয়াইবা কি ?

—সে দায় তোমার। উনি সেকথা জিগ্যেস করতে যাবেন কেন ?

—বেশ, তিনি না হয় জিগ্যেস করলেন না। কিন্তু আমার তো একটা বিবেক আছে ?

—বিবেক কি বলে ? বাগদত্তা বৌকে বাপের বাড়ি ফেলে রাখা ?

ও থতমত খেয়ে গেল। এ রকম একটা প্রশ্ন যে আমার তরফ থেকে আসতে পারে, সেজন্যে তৈরি ছিল না।

বললে, না। তা ঠিক নয়। কিন্তু বুড়ো বাপ-মাকে খেতে দিতে পারছি না, তোমাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াব কি ? নিয়ে গিয়ে রাখবই বা কোথায় ?

—তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও খাটব।

—কি খাটবে ? জন মজুর ?

—তা কেন ? আমিও ট্রেনে ফেরি করতে পারি।

পাগল ! বাবা মত দেবেন কেন ?

—কেন দেবেন না ? অনেক মেয়েই তো করছে।

বললে, যারা কবছে তারা করছে। কিন্তু বাবা কখনই মত দেবেন না। ওখানে আমাদের বাড়ি যেতে হবে না। এখানে তোমার বাবাকেই জিগ্যেস করে দেখ, তিনি মত দেবেন কি না।

চুপ করে রইলাম।

জানি বাবাও মত দেবেন না। সংস্কারে বাধবে। সংস্কার সহজে ভাঙ্গে না।

জিগ্যেস করলাম, তাহলে কি করবে ঠিক করছ?

—কি আর? বিয়ের?

—সব কিছুই।

—একটু ভেবে বললে, দেখ ঠিক কিছুই করিনি। কি ঠিক করব? কিছুই তো আমার হাতে নয়। মাস্টাবীব চেষ্টা করছি, পাচ্ছি না। সরকারী কি সওদাগরী কোনো অফিসে যে কোনো একটা চাকরী পেলে বেঁচে যাই। পাচ্ছি না।

—কেন? শুনছি উদ্‌বাস্তুদের আগে চাকরী দেওয়া হচ্ছে?

—ঠিক। কিন্তু চাকরী গোটা কয়েক আর উদ্‌বাস্তু অসংখ্য। কিন্তু ভাগ্যবান উদ্‌বাস্তু পাচ্ছে যাদের সুপারিসের জোব আছে। অন্য অনেকেই পাচ্ছে না। তাদেব মধ্যে আমি আছি।

ও হাসতে লাগল।

বললাম, তাহলে :

—তাহলে আর কি, অন্ধকার। অন্ধকাবে হাতড়াচ্ছি, আমি, আরও হাজার হাজাব ছেলে। সেই অন্ধকারেই স্বপ্ন দেখছি রোজগার করব, বাড়ি করব, বিয়ে কবব, সংসাব পাতব আবও কত কি করব!

ও আবার হাসতে লাগল।

বললে, এ সব কথা শুনে ভরসা পাও?

পাই না। সুতরাং চুপ করে রইলাম।

জিগ্যেস করলাম, তুমি পাও?

আগে পেতাম। এখনও অল্প অল্প পাই। আর কিছুদিন এমনি গেলে আর হয়তো পাব না।

—তখন কি হবে?

—তখন? এদিক ওদিক একটুখানি চেয়ে নিয়ে বললে,

—ঈশ্বরে বিশ্বাস, সমাজে বিশ্বাস হারাব। গুণ্ডামি, রাহাজানি, চুরি, সব কিছুর পথ তখন খুলে যাবে। করবার আর কোনো ভাবনা থাকবে না।

ওর চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব কি রকম যেন হয়ে গেল। ভয় পেয়ে বললাম, থাম, থাম।

ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

মনটাও কি রকম খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

স্টেশনের ওদিকের একটা নিরি-বিলি প্রান্তে একটুখানি জায়গায় ঘাস জমেছে। সেইখানে আমরা বসি, আমি, অঞ্জনা আর রঞ্জনা। সেইখানে গিয়ে বসলাম।

ওর দেহ-মন বলিষ্ঠ, এই আমি জানতাম। এর মধ্যে কোনো দিন দুর্বলতার কোনো পরিচয় পাইনি। আমি ভরসা হারিয়েছি, নৈরাশ্যে ভেঙে পড়েছি, ওই আমাকে ভরসা জুগিয়েছে, বল জুগিয়েছে, সাহস দিয়েছে।

আজ ওই যদি ভেঙে পড়ে, কে ওকে বল দেবে?

আমি না। আমার সাধ্য কি?

অথচ কদিনই উদ্‌বাস্তু-জীবন আরম্ভ হয়েছে? কতটুকু আঘাতই বা পেয়েছে। আরও বড় আঘাতের জন্যে সমস্ত জীবনই পড়ে রয়েছে।

তখন কি হবে?

হয়তো বাপ থাকবে না যে, পরামর্শ দেবে। মা থাকবে না যে, সান্ত্বনা দেবে। আমি? আমি সেদিন ওর পাশে থাকব কি না তাই বা কে বলতে পারে?

মনটা খারাপ হয়ে গেল।

—কি রে, একলা বসে কি ভাবছিস?

—বরের কথা!

অঞ্জনা আর রঞ্জনার কণ্ঠস্বর। আমার সামনে দিয়েই এসেছে ওরা। টের পাইনি।

হেসে বললাম, বস।

বললাম, মনটা ভালো নেই।

অঞ্জনা বললে, কি হল?

রঞ্জনা বললে, বর বকেছে?

হেসে ফেললাম। বললাম, আর ভালো লাগছে না।

—কেন? বেশ তো আছি। রাজ বাড়ির অতিথি। মন্দ কি আছি? বরের সঙ্গে দেখা হয়নি?

—দেখা হবে না কেন?

—তাও হচ্ছে? তবে আর কি চাস বল?

হেসে বললাম, চাই? তার পরেও সবই চাইবার রয়ে গেছেঃ ঘর বাড়ি যেখানে ছেলেমেয়েরা থাকবে, টাকা-কড়ি যা দিয়ে তাদের মানুষ করতে হবে। কাপড়-জামা, গয়না-গাঁটি কি চাইনা বল?

—ওরে বাবা! এ যে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজছত্র। বরুণ কি বলে?

—বলে আর ভালো লাগছে না।

—সেই জন্যে তোর মন-খারাপ?

—হ্যাঁ।

ওরা ভাবলে পরিহাস। আমিও আর ভাঙলাম না যে, পরিহাস নয়, মন ভেঙে যাচ্ছে, আশা চলে যাচ্ছে, আলো নিভে আসছে; সত্যিই আর ভালো লাগছে না। বেঁচে থাকার মধ্যে আর কোনো আনন্দ পাচ্ছি না।

অঞ্জনা বললে, তোর বাবা তো এখন দু'চার টাকা পাচ্ছে।

—মাঝে মাঝে।

—ইলিশ মাছের গন্ধে টের পাই।

হেসে বললাম, ওটা বাবার শখ। বাবা কি বলেন জানিস

—কি ?

—বলেন, ইলিশ মাছের গন্ধে মনে দেশের স্মৃতি ভেসে আসে। বলি, কিন্তু লোকে বলছে, এরা উদ্‌বাস্তু নয়, উদ্‌বাস্তু সেজে সরকারী মচ্ছব মারছে!

অঞ্জনা বললে, সত্যি। আগে ছোট ছোট ছেলেরা হাত পাতলে যাত্রীরা দু'এক পয়সা দিত। এখন তাড়া দেয়। বলে, ভাগ্। পয়সা নিয়ে কি করবি ? ইলিশ মাছ খাবি ?

অঞ্জনা হাসতে লাগল।

বললাম, কিন্তু বাবাকে বোঝাতে পারিনা। বলেন, বলুক গে। আমাদের কথা ওরা কি জানবে ?

—তোরা নাকি এখান থেকে চলে যাচ্ছিস ?

—কোথায় ? কোন চুলোয় ?

—তোর বাবা নাকি বাড়ি দেখছে ? সেখানে না কি ডিসপেন্সারী খুলবে ?

হো হো করে হেসে উঠলাম: তাই নাকি? আমি তো শুনিনি কই।

—কিন্তু সবাই বলছে যে।

—তা হবে! যেতে পারলে তো বাঁচি। কিন্তু যাওয়া কি মুখের কথা! সেলামি চাইবে না ? মাস মাস ভাড়া দিতে হবে না ?

কিন্তু শুনছি পসার জমে আসছে। রোগী আসছে। কিছু কিছু পাচ্ছে।

আবার হা হা করে হেসে উঠলাম: লোকে কত কি বলে। কিন্তু কিছু কিছু যে কত, সে তো তারা জানেনা। রোগী আসে অঞ্জনা, মিথ্যে নয়। 'কলে'ও বেরোন মাঝে মাঝে। লোকে সেইটে দেখে। কিন্তু পয়সা কত আসে, সে তো দেখতে পায় না।

অঞ্জনা বললে, আসবে, আসবে। রোগী যখন আসতে আরম্ভ করেছে তখন পয়সাও আসবে।

বললাম, তোর মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক। পয়সা আসুক। এই নরক থেকে যেন উদ্ধার পাই। কিন্তু তোদের বলি, আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমার মনে হয়, এই নরক যেন একরাশ ময়লা, দুর্গন্ধ ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। মরার আগে এ থেকে মুক্তি নেই।

পিছন দিকে চলছে ট্রাম-বাস, জনতা। সে সব দেখতে পাচ্ছি না, শুধু শব্দে অনুভব করছি। সামনে প্ল্যাটফর্ম থেকে বার হচ্ছে ব্যস্ত যাত্রীর ভিড়। তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌঁছুবার তাগিদ।

আমরা বসে আছি। আমাদের কোনো গন্তব্যস্থান নেই। মনটা উদাস হয়ে গেল।

অঞ্জনা বললে, চল রাস্তা দিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।

--ন্‌না।

ওকে আমার খুবই আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু ওর সঙ্গে কোথাও, বিশেষ করে সন্ধ্যার পর বেরুতে ভয় করে। ওর পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, হাবভাব সন্দেহজনক।

বললাম, ন্‌না।

অঞ্জনা বললে, এই বৌবাজারের মোড় থেকে ক'টা জিনিস কিনব চল্ না, যাব আর আসব।

—না। বরং আমি এইখানে বসে থাকি। তোরা ঘুরে আয়।

ওরা দুজনে চলে গেল।

আবার বরুণের কথা মনে এল:

মুখ শুকনো। ট্রেনে লজেন্‌স্ ফেরি করছে। সামান্য কিছু হয়।

ওর সংস্কারে বাধছে। কিন্তু দুজনে যদি একই ট্রেনে ফেরি

করত, দু'জনেই যথেষ্ট উৎসাহ পেত। এখন যা লাভ হচ্ছে তার চেয়ে বেশি লাভ হত। অনেক বেশি।

তখন বরুণের আয়ও সবটা সংসারে খরচ হত না। কিছুটা বাঁচত। আর ওর আয়ের সবটাই।

কত আয় হয়? পাঁচ সিকে-দেড় টাকা তো নিশ্চয়ই। দু'টাকা আড়াই টাকাও হতে পারে। দু'জনে মিলে রোজ যদি সাড়ে তিন টাকাও বাঁচাতে পারত, মাসে একশো টাকা জমত।

তাহলে ক' মাস লাগত এক টুকরো জায়গা কিনতে?

ঘর দালান করতে হবে তার কোনো মানে নেই। চমৎকার ছাঁচি-বেড়ার ঘর হতে পারে। দু'কুঠুরী ঘর হলেই চলবে। কজনই বা লোক। শ্বশুর-শাশুড়ী একটা ঘরে, ওরা একটায়। পাশে অমনি ছাঁচি-বেড়ার আর একখানি ছোট্ট রান্নাঘর। সামনে উঠান। চারিদিকে বাঘ-ভেরেণ্ডার বেড়া, একটি পয়সা খরচ নেই।

বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায়। কেমন করে বাড়ি পরিষ্কার রাখতে হয়, সে জানে। তার হাতের ছোঁয়ায় ঘরের মেঝে, দাওয়া, উঠান, সব ঝকঝক করবে। উঠানে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যাবে, এমন।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি উলঙ্গ শিশু। টুকটুক করছে রং। কেনই বা হবে না? বরুণের রংও ফর্সা, তারও। সুন্দর ছেলে হওয়াই স্বাভাবিক।

সেই পরিচ্ছন্ন উঠানে খেলা করে বেড়াবে দামাল শিশু। তাকে সামলাতে বুড়ো-বুড়ী হিমসিম খেয়ে যাবেন। ওঁদের খারাপ মেজাজ আর থাকবে না। এক ফোঁটা শিশু এসে সব ওলট-পালট করে দেবে।

ওই তো তাঁদের কাজ। আর কি কাজ!

সকাল-সকাল রান্না সেরে সবাইকে খাইয়ে দেবে। (কি ওঁরা অত সকালে খেতে না চান, পরে নিজেরা বেড়ে নিয়েও খেতে

পারেন।) তারপরে ওরা দুজন বেরিয়ে যাবে ট্রেনে ট্রেনে ফেরি করতে।

কি, তখন যদি দু'পয়সা জমে, ট্রেনে ফেরি না করে একটা ছোট মুদিখানাও খুলতে পারে। চাল-ডাল, নুন-তেল, মশলা-পাতির দোকান।

নিশ্চয় ভালো চলবে। যেখানে ঘর বাঁধবে সেখানে বসতি হয়ে যাবে। চাল ডাল নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। সবাইকেই কিনতে হবে।

বরং, খঞ্জনার মনে হল, সেই ছোট দোকান দেখতে দেখতে একটা বড় গোলদারি দোকানে দাঁড়াতে পারে।

কিসের সওদাগরী আপিসের চাকরী।

ন'টা বাজতে না বাজতে ঊর্ধ্ব মুখে ছুটতে হবে ট্রেন ধরতে। আবার তেমনি করে বাদুড়ের মতো ঝুলতে ঝুলতে ফেরা। যেদিন বৃষ্টি নামবে, রাস্তায় জল জমে যাবে, ট্রাম-বাস বন্ধ, সে দিন তো কথাই নেই। বাড়ীর লোক বসে বসে ভাবতে থাকুক।

প্ল্যাটফর্মে বসে বসে দেখছি তো বাবুদের অবস্থা।

চাকরীতে সুখ নেই।' পয়সাও নেই। পয়সা ব্যবসায়।

প্রশ্ন হচ্ছে বরুণের ব্যবসা-বুদ্ধি কতখানি আছে।

তার অনেক বাতিক আছেঃ স্কুল করা, লাইব্রেরী করা, হাসপাতাল করা, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর যত বাতিক, সব ওর মধ্যে রয়েছে।

গ্রামে থাকতে এই তো ছিল ওর কাজ।

কিন্তু গ্রামে যা চলত, এখানে তা চলবে না। সেখানে মোটা ভাত কাপড়ের চিন্তা ছিল না। এখানে সেই চিন্তাই সব চেয়ে বড়।

দেশের বাতিক বরুণ যদি দেশে ফেলে না রেখে এসে থাকে, তাহলে ব্যবসা ডকে উঠবে।

তার দিকে সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

কে রাখবে সতর্ক দৃষ্টি ?

বুড়ো বাপ-মা নয়। আমারও দরকার হবে না। দৃষ্টি রাখবে খোকা। তার জন্যেই বরুণকে সামলে চলতে বাধ্য হতে হবে। আজকাল একটি ছেলেকে মানুষ করা কি সোজা কথা ?

তারপর একটি ছেলে কে বললে ?

'তারপরেতে পুত্রকন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা !'

বনের মোষ তাড়ানোর কত বাতিক বরুণ দেশ থেকে নিয়ে এসেছে দেখা যাবে।

সব বাতিক মাথায় উঠবে। বেচারা নিশ্বাস ফেলবার ফুরসুৎ পাবে না।

ভাবতে গিয়ে বোধ হয় হেসে ফেলেছিলাম।

অঞ্জনা-রঞ্জনা আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে ছোট ছোট ক'টা প্যাকেট।

—হাসছ কেন ? ওরা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে।

নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, ভবের কাণ্ড দেখে। তোদের বাজার করা হয়ে গেল ?

—হল কোনো মতে। যা জিনিসের দাম! কিছু কি কেনার উপায় আছে।

—তবু তো কিনছিস।

—কিনতে হচ্ছে। থাকতে গেলে কিনতে হবে। তোকে বাজার যেতে হয় না, না ?

—না। বাবা যান।

আমার বাবার অবস্থা তো দেখছিস! অঞ্জনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে, তবে কি জানিস, এই বদ্ধ জায়গায় যখন হাঁফিয়ে উঠি তখন এই সূত্রে একটু ঘুরে বেড়ান হয়। না রে ?

অঞ্জনা হেসে রঞ্জনার দিকে চাইলে।

—তুই কোথাও বেরুস না ?

[redacted]!

—হাঁপ ধরে না ?

হেসে বললাম, এখন এই অবধি আসি। এই ঘাসের টুকরোটার ওপর বসি।

—তোদের বিয়ে হচ্ছে কবে ?

—ভগবান জানেন।

—কেন ?

—একটা আস্তানা না করে তো আর বিয়ে করা যায় না।

—আস্তানা কত দূব ?

—অনেক দূর। এখনও নজরে পড়ছে না।

হাসলাম।

—বরুণবাবু কি বলেন ?

—কি আর বলবেন ? চেষ্টা করছেন। এই পর্যন্ত। বসো।

ওরা বসল। কিন্তু কারোরই আর কিছু বলবার ছিল না। ঘোলাটে আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। আবছা দেখা যাচ্ছে কলকাতায় চাঁদ কিন্তু মানুষের চোখে পড়ে না। মানুষের দৃষ্টিকে টানে না। বিদ্যুতের আলো এখানে মানুষের চোখ ধাঁধিয়েছে। চাঁদের দিকে পথ চলতে অন্যমনস্কভাবে কেউ হয়তো চায়, কেউ চায় না।

॥ ছয় ॥

বাবার পসার সত্যি সত্যি বাড়তে লাগল।

উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে রোগ লেগেই আছে। কিন্তু তারা পয়সা দিতে পারে না। বাবাও চান না। আসলে বাবার পসার বাড়তে লাগল রেলের বাবুদের মধ্যে। তাদের সংখ্যা তো কম নয়। তাদের মধ্যে প্রায়ই 'কল' থাকে। অনেক হাত ফেরত 'কল'। যে রোগ কেউ সারাতে পারেনি, কি অপারেশন না করলে সারবে না এমন কল। কে না ভয় পায় অপারেশনকে? সেই অপারেশন যদি নিতান্তই করাতে হয় তাহলে এক ফাঁকে হোমিও-প্যাথি করতে ক্ষতি কি? সারে ভালোই, না সারে অপারেশন তো আছেই।

সব রোগই যে বাবার কাছে সারে তা নয়। যেগুলো সারে না তার জন্যে লজ্জা পাবার কিছুই নেই। কলকাতার বড় বড় ডাক্তারে যা সারাতে পারেনি, আশ্রয়হীন হাতুড়ে উদ্বাস্তু যদি তা সারাতে না পারেন, কি এমন লজ্জা!

কিন্তু যেগুলো সারে তার পূর্ণ গৌরব বাবা ভোগ করেন।

কি আশ্চর্য! গাড়ী নেই, এমন কি সাধারণ জামা-জুতো পর্যন্ত নেই। প্ল্যাটফর্মে একখানা ইঁটের গণ্ডীর মধ্যে গামছা-কাঁধে বসে থাকে!

যাকে বলে গোবরে পদ্মফুল।

আমার মনে হয়, বাবার পসার যতখানি, হৈ চৈ তার চেয়ে বেশি। সে ওই কারণে গোবরে পদ্মফুল। যে জিনিস যেখানে থাকার কথা নয়, হঠাৎ সেই জিনিস সেখানে দেখলে চমক লাগে। বাবা যে ক'টা রোগী সারিয়েছেন তাতে লোকের চমক লেগেছে।

প্ল্যাটফর্মের উদ্বাস্তুদের মধ্যেও।

এখন সবাই সময় সুযোগ এবং প্রয়োজন মত একবার এসে কুশল

জিজ্ঞাসা করে যায়। গণ্ডীর বাইরে নমস্কার করে, সমীহ করে। প্ল্যাটফর্মের রেলের বাবুরাও খাতির করে।

বলাবলি করেঃ ভিটে-মাটি ছেড়ে আসতে হয়েছে, কিন্তু লোকটার মধ্যে বস্তু আছে হে।

দেহ এবং মনের দিক দিয়ে বাবারও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর জন্যে কাপড়, জামা, জুতো কেনা হয়েছে। মনটা সব সময় হাসি-খুশি।

চেম্বারের জন্যে ঘর খুঁজছেন। তাঁর বিশ্বাস, চেম্বার খুলে বসতে পারলে প্র্যাকটিস জমবে। অন্তত খরচ চলে যাবার মতো প্র্যাকটিস।

এখন আর গণ্ডীর মধ্যে বসেন না। খাওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময় বইএর ষ্টলের বাইরে একটা চেয়ারে বসে বসে হোমিওপ্যাথি বই, নয় তো খবরের কাগজ পড়েন। ষ্টল-ওয়ালাই খাতির করে এই ব্যবস্থা করেছে।

সকালে অন্ধকার থাকতে থাকতেই উঠে কল থেকে স্নান করে আসেন। তারপরে ফর্সা কাপড়-জামা পরতে পরতে মা চা করে দেন। চা খেয়েই স্টলে গিয়ে বসেন।

রোগী আসে সেইখানে। সেইখান থেকে 'কলে' বেরোন। আমাদের সঙ্গে বলতে গেলে, আজকাল দেখা কমই হয়।

বললাম, খাবার সময় না এলে নয় তাই আস। নইলে এখানে আসতে তোমার ইচ্ছে করে না, না?

হেসে বলেন, যা বলেছিস!

জায়গাটা এমন নোংরা,—যে, ঘেন্না করে, না?

—তা একটু করে। কি জানিস, এখন দু'পাঁচটা রোগী তো আসছে। একটু ভদ্রভাবে থাকা দরকার। নইলে ভালো ফি দিতে চায় না!

বাবা হাসেন।

—ঘর কি হল ?

—দেখা হচ্ছে। অনেককে বলেছিও। ঘর পাওয়া খুব কঠিন রে। তবে চেষ্টা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্র্যাকটিসটা আর একটু জমুক। বুঝলি না ?

মা বললেন, ঘর পেলেই মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে।

—সে আর বলতে বিয়ে তো কবে হয়ে যেত। এই ডামাডোলের জন্যেই না আটকেছে।

—এইবার তাড়া কর।

—হ্যাঁ। ঘরটা পাওয়া গেলেই লাগিয়ে দোব। মুস্কিল কি জান, দূরে ঘর হয়তো এখনই পাওয়া যায়। কিন্তু আমি এই কাছাকাছি অঞ্চলে খুঁজছি। আমার রোগী-পত্তর তো সব এই দিকেই কি না।

মধ্যে বাবা যেন কি রকম হয়ে গিয়ে-ছিলেন। কোল কুঁজো, দুর্বল। নিজের উপর যেন তাঁর ভরসা ছিল না। সবেতেই ভয় পেতেন। সব সময় স্তব্ধ-ভাবে বসে থাকতেন। কি ভাবতেন দিনরাত তিনিই জানেন।

এখন মনে হয় তাঁর নিজের উপর ভরসা জেগেছে। আবার দাঁড়াতে পারবেন। আবার ঘর বাঁধবেন এবং ভদ্র-ভাবে জীবন যাপন করতে পারবেন।

জামা-কাপড় পরে স্টলে বসে থাকেন। এইখান থেকে তাঁর পরিবর্তন স্পষ্ট বোঝা যায়। খবরের কাগজ পড়েন, কি গল্প করেন, মুখে ব্যক্তিত্বের ভাব পরিষ্কার ফুটে ওঠে। যেন গ্রামের সেই প্রভাবশালী মানুষটি। বেশ সপ্রতিভ ভাব। হাসি-খুশি মানুষটি।

দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখি।

মা বলেন, দ্যাখছস ?

—হু।

শুধু বাবার নয়, মায়েরও পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট। শুধু পরিচ্ছন্ন বেশ-বাসেই নয়, মুখের ভাবেও।

জোয়ার আসবার আগে নদীতে একটা চঞ্চলতা জাগে। আসছে, জোয়ার আসছে। তেমনি আমাদের সবারই মনে একটা চঞ্চলতা জেগেছে। জোয়ারের আভাস।

কখন যে জোয়ার আসবে কেউ জানি না। কিন্তু তার যে দেরি নেই এই প্রত্যয় আমাদের সকলের মনেই এসে গেছে।

সেই কথাটাই সেদিন বরুণকে বললাম।

বরুণ ক্রমশই যেন ভেঙে আসছে। শরীর এবং মন দুইই যেন শুকিয়ে যাচ্ছে।

বললাম, ভয় পেও না। জোয়াব আসছে।

—কিসের জোয়ার ?

—সুদিনের জোয়ার।

বরুণ হাসলে।

জিগ্যেস করলাম, বিশ্বাস হয় না ?

—না।

বললাম, আমার হয়।

—কি করে হয় জানি না।

বুক-স্টলে বাবা বসে ছিলেন। পবণে ধোপ দুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবী। তার উপর একখানা চাদর। পায়ে ঝকঝক করছে পালিশ-করা জুতো।

সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম।

বললাম, এবারে বিশ্বাস হয় ?

বরুণ অবাক হয়ে বাবার দিকে চেয়ে রইল।

—কাকাবাবু!

—হ্যাঁ। এখন প্রতিদিনই দুএকটা করে 'কল' পান। দৈনিক তিন-চার টাকা হয়। ঘর খোঁজা হচ্ছে। পেলেই উঠে যাব। তার পরে।

—তার পরে ?

হেসে বললাম, মা বলছিলেন খঞ্জনার বিয়ে দিতে আর দেরি করা হবে না। বাবারও তাই মত।

বরুণ আবার হাসলে।

—হাসছ যে!

—তুমি কি ভাব, আমাদের জীবন এতই মসৃণ ?

—নয় কেন ?

বরুণ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে, তাই যদি হবে তাহলে দেশ ছাড়তে হবে কেন? মসৃণ জীবন তো সেইখানেই ছিল। তা নয় খঞ্জনা। অনেক দুঃখ এখনও আমাদের অদৃষ্টে আছে। তাছাড়া—

—কি তাছাড়া ?

—তাছাড়া, ধর কাকাবাবুর পসার বাড়ল, তোমরা এই নরক ছেড়ে পরিচ্ছন্ন একটা বাসায় উঠে গেলে। স্বচ্ছল ভাবে দিন কাটতে লাগল! তাতেই বা কি ?

—নয় কেন ?

বরুণ হাসলে: তুমি কি ভেবেছ অসহায় বুড়ো বাপ-মাকে ছেড়ে আমি তোমাদের বাড়ি ঘর-জামাই থাকব ?

চমকে উঠলাম। ও কথাটা আমার মনে আসেনি। ওভাবে না, অন্য ভাবেও না।

বললে, যতদিন আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারছি ততদিন বিয়ের সম্ভাবনা আমি দেখছি না। এবং আমি যে কোনো দিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব, এ ভরসা দেখি না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বললে, সোমবার থেকে বাবার হাঁপানি আরম্ভ হয়েছে! সে কী যন্ত্রণা। মনে হয় এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। সারা রাত

তার কাছে জেগে। দিনে ট্রেনে ফেরি করি। ঘুম একেবারে নেই। এই জীবন চলছে।

—ডাক্তার দেখাচ্ছ?

—পয়সা কই?

—এস আমার সঙ্গে।

ওকে বাবার কাছে নিয়ে গেলাম। তাঁকে সব কথা বললাম। শুনে তখনই তিনি বললেন, চল। এখনই যাব। গাড়ি কখন?

—আধ ঘণ্টা পরেই একটা আছে।

বললাম, বেশ। তাহলে একটু চা খেয়ে নাও।

চা জলখাবার খেয়ে আমরা তিনজনেই বেরুলাম। বাবা আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন না। কিন্তু আমি ছাড়লাম না কিছুতেই। একটা ছোট কিট-ব্যাগে বাড়তি দু'একখানা জামা কাপড় নিয়ে ওদের সঙ্গে দাঁড়ালাম।

—ওটা আবার কি নিয়ে যাস?—মা জিগ্যেস করলেন।

চুপি চুপি বললাম, সমস্ত রাত কষ্ট পান। বাড়ির লোকের দিনেও ঘুম নেই, রাত্রেও ঘুম নেই। ভাবছি, যদি রাত্রে থাকতে হয়।

মা হাসলেন: দরকার হয় তো থাকিস।

আশ্বস্ত হলাম। বললাম, তোমার কাছে টাকা আছে মা?

—আছে। কেন?

—কাছে কিছু রাখতাম।

মা পাঁচটা টাকা দিলেন। 'কিট-ব্যাগে' সেটা রেখে ওদের সঙ্গে বার হলাম। বাবা অবাক হয়ে একবার আমার দিকে চাইলেন। বরুণও। কিন্তু কেউ কিছু বাধা দিলেন না।

বরুণের বাবাকে বাবা অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। জানা

রোগী। দেশে থাকতেও মাঝে মাঝেই ভদ্রলোক হাঁপানিতে ভুগেছেন এবং বাবা চিকিৎসা করেছেন।

বাবা হেসে বললেন, বেয়াই মশাই, বাড়ি-ঘর, জমি-জায়গা সব সেখানে ফেলে রেখে এসেছেন। এটাকে ফেলে রেখে আসতে পারেন নি?

ভদ্রলোক হাসলেন: কই আর পারলাম! হাঁপানি বোধ হয় আমার সঙ্গে যাবে। তবে একটা কাজ করেছি।

—কি?

—রোগের সঙ্গে ডাক্তারকেও এনেছি।

ছ'জনেই হাসতে লাগলেন।

ভদ্রলোক বললেন, রোগ তো সারবার নয় বেয়াই মশাই। যাতে সুস্থ হয়ে রাত্রে ঘুমোতে পারি, তার একটা ওষুধ দিন। রাত্রে এরা বড় কষ্ট পায়।

বরুণের মা এক পেয়ালা চা নিয়ে এলেন বাবার জন্যে!

বাবা চমকে তাঁর দিকে চাইলেন।

বললেন, বহু রোগীর বাড়ী গেছি! কিন্তু চা কোথাও পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না।

—ডাক্তারকে তো দিইনি, বেয়াইকে দিলাম।

আবার হাসির রোল উঠল।

বরুণের মা জিগ্যেস করলেন, বেয়ায়ের ডাক্তারী নাকি এখন ভালোই চলছে?

—মন্দ চলছে না বেয়ান, আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে।

—এইবার একটা বাড়ি দেখুন।

—চেষ্টা তো করছি। পাচ্ছি কই?

—কেন? অত বড় শহরে বাড়ি পাওয়া যায় না?

—কই যায়? যদি বা অনেক চেষ্টায় একটা কানামতন বাড়ি পাওয়া যায়, তো লম্বা সেলামি হাঁকে।

বাবা হাসতে লাগলেন।

বললেন, আমার যে আবার অনেক বায়নাক্কা। স্টেশনের কাছ বরাবর বাড়ি চাই।

—কেন ?

—রোগী যা, তা স্টেশনের বাবু ভাই। নামও যা হয়েছে, ওইটুকুর মধ্যে। ওর বাইরে গেলে চলবে না।

বাবা আবার হাসতে লাগলেন।

—তবে এর মধ্যে যেমন করে হোক, চেম্বারের জন্যে ঘর আমাকে একটা পেতেই হবে। নইলে যেটুকু পশার হয়েছে, তাও নষ্ট হয়ে যাবে। ওখানে থেকে বেশি দিন পশার রাখা যাবে না।

বরুণের মা বললেন, চ্যাম্বর নিয়ে কি হবে ? ডাক্তার নিয়ে কাম। ডাক্তার ভাল হলেই হল। রোগী সারান্ নিয়ে কথা।

—সে দেশে বেয়ান। এখানে আগে দর্শনধারী, পিছে গুণ বিচারি। ডাক্তার ডাকবাব আগে দেখে তার চেম্বার কি রকম সাজান। গাড়ি কত বড়। যে দেশে যা।

—তাহলে তো মুস্কিল।

—মুস্কিল তো বটেই বেয়ান। তবে চেম্বার বলুন, আর যাই বলুন, সব একটি কাজের জন্যে ?

—কি কাজের জন্যে।

—এদের বিয়ে দেওয়ার জন্যে। তারপরে ছুটি।

বাবা আবার হাসতে লাগলেন।

বরুণের মা বললেন, সে কি ! এর মধ্যে ছুটি কিসের ? নাতি-নাৎনী নিয়ে আনন্দ করবেন না ?

—সে হয় ভালো, না হলেও ক্ষতি নেই। আপনাকে সত্যি কথা বলি বেয়ান, আনন্দের আশা আর করি না।

—কেন ?

—অদৃষ্টে আনন্দই যদি থাকবে, তাহলে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আসতে হবে কেন ?

বরুণের বাবা নড়ে উঠলেন : আমার মনের কথাটি বলেছেন বেয়াই। বাঁচবার জন্যেও আগ্রহ নেই। কিন্তু মরণ তো আমার হাতে নয়।

ভদ্রলোককে দেখে খুব কষ্ট হয়। হাঁপানির টান যখন ওঠে, মনে হয় এক্ষুনি সব শেষ হয়ে গেল বুঝি। যিনি ভোগেন তাঁর তো কথাই নেই, যে দেখে তারও পক্ষে দুঃসহ হয়ে ওঠে।

অথচ মরণ তো মানুষের হাতে নয়।

আত্মহত্যার কথা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। ইচ্ছা করলেই মৃত্যুকে পাওয়া যায় না। আবার ইচ্ছা করলে মৃত্যুকে ঠেকানও যায় না।

আবার মানুষ মুখে যতই মৃত্যু কামনা করুক, ঠিক মুহূর্তে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করবার জন্যে কি চেষ্টাই যে করে, সে রাত্রি ওর শয্যাপার্শ্বে থেকে তাও চোখে দেখলাম।

এক একটা টান উঠছে, দেহ কাঠের মত শক্ত, চক্ষু স্থির হয়ে আসছে,—ভিতরে কি যে লড়াই চলছে,—দেখতে দেখতে আবার দেহ এবং চোখ স্বাভাবিক হয়ে এল।

বাবার ঔষধে কোনো ফল হয়েছে বলে আমার মনে হল না। কিন্তু উনি বললেন, কিছুটা হয়েছে। কাল নাকি আরও কষ্ট হয়েছিল।

হবে।

কিন্তু এই যদি কিছুটা ভালো অবস্থা হয়, তাহলে খারাপ অবস্থা যে কি রকম ভাবতেও বুক কাঁপে।

পরদিন কিছুটা সুস্থ হবার পর বৃদ্ধ প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন : রাজরাণী হও মা।. আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়ে এস।

এমন মিষ্টি সেবা কখনও পাইনি। মরবার আগে তোমার সেবা নিয়ে যেন মরি।

গৃহিণীকে ডেকে বললেন, আমার আর দেরি করার ইচ্ছে নেই। যে কোনো সময় চোখ বুঁজতে পারি। তার আগে তোমাকে ঘরের লক্ষ্মী করে আনতে চাই।

তিনি বললেন, আমারও তো সেই ইচ্ছে। কিন্তু বরুণ যে কিছুতে রাজি হচ্ছে না।

—কি বলছে ?

—বলছে, আর একটু না সামলালে বিয়ে করতে চাই না। একটা কাজকর্ম পাই, তার পরে।

ভদ্রলোক তিক্ত কণ্ঠে হাসলেন: তাহলে আমার আর দেখে যাওয়া হল না!

বলে পাশ ফিরে শুলেন।

বরুণকে বললাম সে কথা। বরুণ হেসে উড়িয়ে দিলে: উনি ওরকম কথা মাঝে মাঝে বলেন। কিন্তু তোমাকে এনে যে রাখি কোথায়, তা বোঝেন না।

—কেন, ওই তো পাশে আর একখানা ঘর রয়েছে। ওখানে যেমন আছি, তার চেয়ে তো ভালো থাকবো।

বরুণ হেসে বললে, এখানে আমি তোমাকে আনতে পারব না। আমার কতদিনের কত সাধ, সে আমি তোমাকে বলতে পারব না। তা নিয়ে আমাকে প্রশ্নও কোর না।

বললাম, কোন তাজমহলে আমাকে নিয়ে তুমি বসাতে চাও, তুমিই জান। তা নিয়ে কোনো প্রশ্নও করছি না। কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখলেই তো হবে না। বাস্তবের মধ্যে বাস করতে হবে তো।

বরুণ আবারও হাসলে: তাজমহলের উপমাটা ঠিক হল না। ওটা মরা প্রেয়সীকে বসাবার জন্যে।

—তা জানি। ইচ্ছে করেই বললাম।

আমি হাসতে লাগলাম। বললাম, বাস্তবের কথাটা ভুলছ কেন?

—ভুলিনি। চব্বিশ ঘণ্টাই তো বাস্তবের কামারশালায় হাতুড়ি পিটি। মাঝে মাঝে অবসর সময়ে একটু একটু স্বপ্ন দেখি। বুঝতে পারি না কোনটা আমার সত্যিকার জীবন: বাস্তবের কামাশালায়, না স্বপ্নের কুঞ্জবনে।

কাব্য আমার ভালো লাগছিল না। আমি বাস্তবে নামতে চাই। আমার আগ্রহ ঘর বাঁধায়। তা সে যেমন ঘরই হোক।

বললাম, বাবা চেম্বার খুঁজছেন। প্লাটফর্মের নরককুণ্ড থেকে শিগগির হয়তো চলে যাব। তোমার বাপ মা না থাকলে সেখানেই তোমার স্বপ্নকুঞ্জ বানিয়ে নিতে পারতে। কিন্তু তাও তো সম্ভব নয়।

—না।

—জানি। তাহলে কতদিন তুমি স্বপ্ন দেখবে আর কতদিনই বা আমি হা পিত্যেশ করে বসে থাকব?

—জানি না।

বরুণ গুম হয়ে বসে রইল। মনে হল তার বুকের ভিতরটা একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল বুঝি।

খুব কষ্ট হল। বললাম, বিয়ে করে আমাকে তুমি বাপের বাড়িতেই রেখে দেবে, অবশ্য যতদিন না তোমার সুবিধা হয়, তা আমি বলি না, কিন্তু বাবা বোধ হয় কিছু টাকা দিতে পারেন। তাতে তোমার সুবিধা হবে না?

—না।

—তাহলে থাক।

তার বেশি আর কিই বা আমি বলতে পারি?

বললাম, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে না?

বললে, নিশ্চয়। দুটি ভাত খেয়ে নাও। তারপরে এক সঙ্গেই দুজনে বেরুব। তোমার তো বাড়ি চেনার হাঙ্গামা নেই।

—না।

দুজনেই হাসলাম।

আসবার সময় শ্বশুরকে প্রণাম করলাম। পিঠে বালিশ দিয়ে উঠে বসেছেন। একটু ভালোই বোধ হল।

জিগ্যেস করলাম, এখন কেমন বোধ করছেন ?

—দিনের বেলা তো একটু ভালোই থাকি। রাত্রের দিকে টানটা বাড়ে।

মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেনঃ রাজরাণী হও মা। সুখী হও।

হায় সুখ ! রাজবাণী হওয়া তো অনেক দূরের কথা। সাধারণ যে সুখ, গৃহস্থ-বধূব যে সুখ, স্বামী পুত্র নিয়ে সুখেদুঃখে কোনো রকমে দিন কাটান, তাও এখন বহুদূব। সমস্ত আশীর্বাদটাই পরিহাসের মতো শোনাল।

হেসে বরুণেব দিকে চাইলাম।

যে কথাটা আমাব মনে উঠেছিল, তাব মনেও নিশ্চয় তাই উঠেছিল। কিন্তু সেটা সে চেপে গেল।

ট্রেনে রঞ্জনাব সঙ্গে দেখা।

রঞ্জনা, তার সঙ্গে আব দুটি ছেলে।

রঞ্জনা ছুটে আমার কাছে এল। বরুণের দিকে একবার অপাঙ্গে চাইলে। বরুণ তার চেনা।

জিগ্যেস করলে, কি রে ! এদিকে কোথায় এসেছিলি ?

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বললাম, মধুচন্দ্রিকায়।

—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ, তুই কোথায় চললি ?

—ওই একই জায়গায়।

—বাঃ ! কোনটির সঙ্গে ?

ছেলে ছুটির দিকে একবার চট করে চেয়ে নিয়ে রঞ্জনা বললে, না। এদের কারও সঙ্গে নয়। এরা পৌঁছে দিতে চলেছে।

—কোথায়?

ওই যে বললাম, সেইখানে।

—সেটা কোথায়?

—বলব পরে। আমি একটা স্কুল খুলেছি জানিস?

—তাই নাকি!—লাফিয়ে উঠলাম—আমাকে একটা মাষ্টারী দেনা।

—দাঁড়া। এখন গাছতলায় চলছে। যাচ্ছি, স্কুলের বাড়ির জন্যে কিছু মঞ্জুরী আদায় করতে। যদি স্কুলের বাড়ি হয়, তোকে নিশ্চয় নোব।

বললাম, সে তো অনেকেই বলে। তারপর কাজের সময় ভুলে যায়। ভুলবি না তো?

—নিশ্চয় না।

শেয়ালদা স্টেশন এসে গেল।

নামতে নামতে বল্লাম, ফেরবার সময় দেখা করে যাবি না?

—এদিক দিয়ে যদি ফিরি, নিশ্চয় যাব।

॥ সাত ॥

বাড়ির জন্যে একটি দালাল লাগান হয়েছিল।

কে যে একে বাবার সঙ্গে জুটিয়ে দিয়েছিল জানি না। লোকটা আসত-যেত, পান-বিড়ির জন্যে মাঝে মাঝে টাকাটা-সিকেটা নিত, কিন্তু বাড়ির কোনো ব্যবস্থাই করতে পারত না।

বাবাকে বলতাম, ওটিকে বিদেয় কর বাবা! ও তোমার একটি গ্রহ। কাজ কিছুই করবেনা, শুধু পয়সা শুষবে।

বাবা হাসতেন: গ্রহই বটে রে! গ্রহের যা ফের চলছে, এখন ওরাই জুটবে।

কিন্তু সেই লোক একদিন একটি বাড়ির খোঁজ নিয়ে এল। বর্ণনা থেকে মনে হল, ঠিক যেমনটি চাই, তেমনি।

বাবা তার সঙ্গে ছুটলেন বাড়ি দেখতে।

ফিরে এসে বললেন, বাড়িটা পুরোনো, নোনা ধরা। ছোট ছোট দুখানা ঘর। মেঝের সিমেণ্ট জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে।

—কিন্তু?

—কিন্তু অন্যদিক দিয়ে, মানে প্র্যাকটিসের দিক দিয়ে সুবিধাজনক জায়গা। আমার রোগী তো সব এই তল্লাটে। ঘর এই তল্লাটের মধ্যেই। চল না, দেখে আসবি।

বিকেলে মা আর আমিও গেলাম।

অন্ধকার ঘর।

আমরা থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দু'খানা ঘর দেখা কতক্ষণেরই বা মামলা! আমরা ঘর দেখে ফিরে এলাম। পল্লীগ্রামের লোক। খোলা-মেলায় থাকা অভ্যাস। কি করে যে দুখানি ছোট ছোট খুপরির মধ্যে দিন কাটাব ভেবে স্থির করতে পরলাম না।

প্লাটফর্মে আছি। সেখানে ঘর সেই, আব্রুও নেই। ঘিঞ্জি, তাও সত্যি। কিন্তু খোলা-মেলা রয়েছে। প্লাটফর্মের সীমানার মধ্যে ঘোরা ফেরা করা যায়। মা বিশেষ ঘোরেন না। একখানা ইঁটের ঘেরের মধ্যেই, বলতে গেলে, চব্বিশ ঘণ্টা কাটান। কিন্তু ওইখান থেকেই চারিদিকে চাইলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

এ বাড়িতে সে সুযোগ নেই।

চারিদিকে পাঁচিল তোলা। চোখদুটো থাকবে জেলখানার কয়েদীর মতো।

মায়ের জন্য আমার চিন্তা হল।

কিন্তু আশ্চর্য! ওখান থেকে প্লাটফর্মে ফিরতে যেটুকু সময় পাওয়া গেছে, মা তারই মধ্যে মনঃস্থির করে ফেলেছেন!

বললেন, বাড়ি ভালোই। মন্দ নয়।

আমরা অবাক হলাম। বুঝলাম, মায়ের যেটা আগ্রহ সে হচ্ছে আব্রুর জন্যে। এখানে চব্বিশ ঘণ্টাই লম্বা ঘোমটা দিয়ে থাকতে হয়। রাত্রে বিদ্যুতের আলোর নিচে সহস্র দৃষ্টির সামনে শুয়ে স্বস্তি পান না। ঘুম সহজে আসে না। যদি বা এক সময় এল, পরমুহূর্তেই চমকে উঠে একবার নিজের দিকে একবার আমার দিকে চান। বেশ-বাস অসম্বৃত থাকলে ঠিক করে দেন।

এই অবস্থার থেকে তিনি মুক্তি পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, ভাড়া কত চায়?

—তা বেশ লম্বা।

—কি রকম লম্বা?

মায়ের যেটুকু উৎসাহ এসেছিল, বাবার কথায় তা স্তিমিত হয়ে এল।

বাবা দালালের দিকে চাইলেন। ভদ্রলোক বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন।

বললেন, পাঁচশো টাকা সেলামি আর একশো পঁচিশ টাকা ভাড়া। ভাড়া দু'পাঁচ টাকা কমতে পারে, কিন্তু সেলামি নয়।

শুনে মা চমকে উঠলেন : অত টাকা দিতে পারবা? পারবা না।

বাবা চুপ করে রইলেন।

টাকাটা কোনোমতে হয়তো তিনি দিতে পারেন। কিন্তু তারপরে হাতে আর একটি পয়সাও থাকবে না। সেও এক দুঃসহ অবস্থা।

বাবা চিন্তিতভাবে বললেন, দেখি।

মা ঝংকার দিলেন, হাতে টাকা নাই তা দ্যাখবা কি?

বাবা বললেন, ভাবি।

দালালকে বললেন, আপনি আর একবার চেষ্টা করুন, সেলামি আরও কিছু কমে কি না। ভাড়াও। তারপর কাল সকালের দিকে খবর দেবেন।

দালাল চলে গেল।

মা বিরক্তভাবে বললেন, আসতে বলার মানে নাই।

এবারে বাবা বিরক্ত হলেন। বললেন, আরে বাপু, আসতে বললেই তো নিতে হবে না। দেখ না, কি হয়।

—দেখ।

বাবা রেগে জামাটা গায়ে দিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে বসলেন।

আমি বুঝতে পারছিলাম, বাবার মনের মধ্যে কি ঝড় বইছিল। বাড়ি দরকার। চেম্বার একটা খুলতেই হবে। নইলে যেটুকু প্র্যাকটিস জমেছে, তাও নষ্ট হয়ে যাবে। হাতে টাকা নেই ঠিক নয়। পাঁচশো টাকা সেলামি দিতে পারেন। এক মাসের ভাড়াও। কিন্তু তার পরে?

বরাবর দেখে আসছি, প্রয়োজনের সময় হাতে টাকা না থাকলে, কিংবা তাই নিয়ে কেউ কোনো খোঁচা দিলে তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বিরক্ত হলে চেঁচামেচি করা তাঁর স্বভাব নয়। তিনি

সরে যান। দেশে এমন বহুবার দেখেছি। এখানে এই প্রথম দেখলাম।

বাবা স্বভাবত শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অসম্ভব জেদী। সে রাত্রে কারও সঙ্গে কথা বললেন না। খেয়ে-দেয়ে বই-এর স্টলে গিয়ে বসলেন। তারপর কখন এসে শুয়ে পড়লেন জানতে পারলাম না।

সকালেই দালাল এল।

বললে, যা বলেছিলাম ডাক্তারবাবু, সেলামি একটি পয়সাও কমবে না। তবে ভাড়া পাঁচ টাকা কমাতে বহু কষ্টে রাজি হয়েছে। দালাল হি হি করে হাসতে লাগল।

বললে, আসল কথা কি জানেন, একটি মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। সুতরাং সেলামি পাঁচশো টাকা চাই-ই।

বাবা বললেন, ঠিক আছে। তাই দোব। কিন্তু বাড়ি মেরামত করে দেবে তো ?

—কি মেরামত ?

ঘরগুলো চুনকাম করে দেওয়া, মেঝের সিমেণ্ট যে সব জায়গায় উঠে গেছে, সেখানে পটি দেওয়া। এই আর কি।

—না। সে সব আপনাকে করে নিতে হবে। ও আর ওর পেছনে একটা পয়সাও খরচ করতে রাজি নয়।

—শুধু ভাড়া নেবে ?

—হ্যাঁ।

লোকটা আবার হি হি করে হাসতে লাগল। বললে, আসুন না আমার সঙ্গে। বলে-কয়ে যদি রাজি করাতে পারেন। চলুন, একবার ঘুরে আসি।

—চলুন।

বাবা হন হন করে তার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। আমরা কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে রইলাম।

অনেকক্ষণ পরে মা বললেন, ওই বাড়িই ও নেবে। জেদ চেপে গেছে।

সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। জেদ চেপে গেলে বাবার বিচার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। দেশে থাকতে একবার একখানা তুঁশো টাকার জমি চারশো টাকায় কিনেছিলেন। দেনা করে। হয়তো কিনতেন না। কিন্তু মা আপত্তি করায় জেদ চড়ে যায়। সে জমি সেইখানেই পড়ে রয়েছে। তার ফসল কে খাচ্ছে কে জানে। অবশ্য দেনাও সেইখানেই পড়ে রয়েছে। সেও আর শোধ দেবার প্রয়োজন রইল না।

মা কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে। আমি মায়ের দিকে চেয়ে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়।

অবশেষে বাবা ফিরলেন ব্যস্ত ভাবে একটু খুশি-খুশিই মনে হল। যেন একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ জয় করে ফিরলেন :

—ওঃ! চামার বটে বাবা! মেরামত করে দিতে কিছুতেই রাজি নয়। তোমার বাড়ি, আমি ভাড়া দিয়ে থাকব, মেরামত করে দেবে না? না।

আমরা নিঃশব্দ।

—আর তাও বলি, যা দেখে এলাম, তার দেবার অবস্থাও নেই। শেষমেশ,

ভনিতা নয়, এই শেষমেশটা শোনবার জন্যেই আমরা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। আমরা তুজনেই অধৈর্যভাবে বাবার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে। কথা বলবার সাহস নেই, পাছে তাঁর জেদ আরও চড়ে যায়!

বাবা বললেন, শেষমেশ এই ঠিক হল যে, বাড়ি আমিই মেরামত করিয়ে নোব। টাকাটা মাস-মাস কিছু কিছু করে ভাড়া থেকে কাটা যাবে।

বাবা খুশির সঙ্গে মায়ের আর আমার দিকে চাইতে লাগলেন।

আমরা সাড়া দিলাম না।

তখন দালালের দিকে চেয়ে বাবা বললেন, হাতে রাজমিস্ত্রি আছে তো? কবে থেকে কাজে লাগবে?

—যেদিন থেকে বলবেন।

হিসাব করে বাবা বললেন, এ মাসের আর দশদিন মোটে আছে। কাল থেকে কাজে লাগবে তার মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে তো?

—খুব, খুব।

—হ্যাঁ। আমরা পয়লা থেকে চলে যেতে চাই। পয়লা থেকেই ভাড়া চলবে। আপনি যান। কাল থেকে যাতে মিস্ত্রি লাগে সেই ব্যবস্থা করুন।

দালাল চলে যেতে বাবা হাসতে হাসতে আবার আমাদের দিকে চাইলেন।

বললেন, আর মোটে দশটা দিন। তার পরে ছোট হোক, ঘিঞ্জি হোক, বাড়ি তো বটে।

দেখি, মায়ের মুখেও হাসি ফুটেছে।

বললেন, দশটা দিনই কি কম। কও।

বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন: তবে যে আমার ওপর রাগ করেছিলে।

আমরা সবাই হাসতে লাগলাম।

আরম্ভ হল দশ দিন ধরে বিদায়ের পালা। উদ্বাস্তু উপনিবেশে নয়, রীতিমত কলকাতা শহরে বাড়ি ভাড়া করে উঠে যাওয়া। নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়।

এই প্ল্যাটফর্মে কত উদ্বাস্তু রয়েছে। কত জেলার লোক। কত রকমের ভাষা। এমন কি, আচার-ব্যবহারেও কত তফাৎ। গত কয়েক মাস ধরে রয়েছি এখানে। অধিকাংশের সঙ্গেই পরিচয় হয়নি। হয়তো কখনও মুখের কথাও হয়নি। পরিচয় হল, কথা হল আজ প্রথম, চলে যাবার মুখে।

মা ট্রেন থেকে নেমে সেই যে ইঁটের বেড়ার মধ্যে ঢুকেছিলেন, (মা বলতেন 'লক্ষ্মণের গণ্ডী'), দু'বেলা স্নান ছাড়া সেই বেড়ার বাইরে পা বাড়াননি। ওইখান থেকে বসে প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে কথা কইতেন, কিন্তু কারও ঘরে (ঘরই বলি, আর কি বলব।) কখনও যাননি। শুধু তাই নয়, রেল-হীন দেশের লোক, কোনদিন ইঞ্জিন দেখবার কৌতূহলও বোধ করেননি।

অতখানি না হলেও, আমারও অবস্থা প্রায় তাই। উদ্বাস্তুদের মধ্যে সমবয়সী মেয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু ওই অঞ্জনা রঞ্জনা। তার বাইরে আর কারও সঙ্গে ভাব হয়নি, পরিচয়ও হয়নি। পরিচয় করার ইচ্ছাও কোনদিন হয়নি।

বলে, সমদুঃখীদের মধ্যে একটা মিতালি হয়।

বাজে কথা।

প্ল্যাটফর্মে যারা ছিলাম, সবাই তো একই দুঃখের দুঃখী। সেখান থেকে ছিন্নমূল হয়ে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে সবাই জঞ্জালে পরিণত হয়েছি। সবাই গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন ভিক্ষুক। মনুষ্যত্ব থেকেও বিচ্যুত।

অথচ ওই দুটি মেয়ে ছাড়া কারও সঙ্গে আমার মনের দূরের কথা, কথার মিতালি হয়নি।

বলতে পারেন, এটা অহঙ্কার।

অহঙ্কারও আছে বই কি। কিন্তু শুধু অহঙ্কারই নয়। যে মন নিয়ে মানুষ বন্ধুত্ব করে, ফুর্তি করে, আনন্দ করে, সেই মনটাই হারিয়ে গিয়েছিল। বন্ধুত্ব করার উৎসাহেরও অভাব ছিল। সেই সঙ্গে অন্যদের ঠিক আমার সমপদস্থ ভাবতে পারতাম না, এও হয়তো সত্য।

বাবা প্রথম প্রথম কারও সঙ্গে গল্পগুজব বড় একটা করতেন না বটে, কিন্তু ডাক্তারীতে পসার পাওয়ার পর থেকে, করতেন। চায়ের দোকানে বসতেন, বইএর স্টলে বসতেন, এর-ওর ঘরে গিয়েও বসতেন। পাঁচটা সুখ-দুঃখের গল্পও করতেন।

আমি বলছি মায়ের আর আমার কথা।

চলে যাবার মুখে, এই প্রথম আমরা উভয়ে অনুভব করলাম, ওরা আমাদের আত্মীয়। অনন্ত দুঃখের মধ্যে একসঙ্গে কিছুকাল বাস করার ফলে, আমরা জানি বা না জানি, আমাদের সকলের মধ্যে একটা অদৃশ্য সুতোর বাঁধন পড়ে গেছে। সে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে বাজছে।

প্রতিবেশিনীদের ঘরে গিয়ে বসা, গল্প করা আরম্ভ হয়ে গেল।

দেখা গেল, আমরা বাসা ভাড়া করে চলে যাচ্ছি, এতে কেউ বিস্মিত হয় নি। এতদিন ওদেরই সঙ্গে, ওদেরই মতন করে একসঙ্গে ছিলাম। ইতিমধ্যে বাবার পসার বাড়তে লাগল। সে আয় যে কত, আমরাই শুধু জানি। কিন্তু পরের টাকা সবাই বেশি দেখে।

এক বুড়ি বললে, যাও মা, এখন ভাড়া বাড়িতেই যাও। তারপরে নিজের বাড়ি হতে আর কতদিন ?

নিজের বাড়ি!

তার স্বপ্নও আমরা দেখিনি কোনোদিন। শুনে মা আর আমি তো অবাক!

—কি বলছ বুড়িমা।

—ঠিকই বলছি। বাবুর রোজগার কত, আমরা কি তা জানি না ভেবেছ ?

বাবুর রোজগার কত, তা ওরা জানে। তা নিয়ে প্ল্যাটফর্মের উদ্বাস্তুদের মধ্যে আলোচনাও হয় বোঝা গেল।

বুড়ি বললে, তোমরা তো এখানকার বাসিন্দা নও মা। যতদিন গ্রহের ফের ছিল, ছিলে। এখন ফের কেটেছে, যাবে বই কি মা।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মা বললেন, তাই হোক বুড়িমা। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। গ্রহের ফের যেন কেটেই গিয়ে থাকে। সেখানে গিয়ে যেন ভালো থাকি।

—থাকবে বই কি মা। গ্রহের ফের কি আর চিরদিন থাকে! এই আমাদের অবস্থাই দেখ না? আমরাও এখানকার বাসিন্দা নই। দেশে জোত-জমা, পুকুর-বাগান সবই ছিল। এখনও আছে। পাঁচ ভূতে খাচ্ছে। আর আমরা এখানে ভিখ মাগছি!

বুড়ি ললাটে করাঘাত করতে লাগল।

মা বললেন, তোমাদেরও আবার সব হবে মা। আজ আমরা যেমন যাচ্ছি, তোমরাও একদিন তেমনি করে হাসতে হাসতে চলে যাবে।

—তাই বল মা, সেই আশীর্বাদ কর।

—করি বই কি মা। সবাইকে সেই আশীর্বাদ করি।—মায়ের ভাব এসে গিয়েছিল। বলতে লাগল,—এটা তো মুসাফিরখানা মা। সবাই নিজের নিজের গাড়ির জন্যে বসে। যার যখন গাড়ি আসছে, উঠে যাচ্ছে। এক আসছে, এক যাচ্ছে। না কি বল মা?

বুড়ির মুখ হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেল। মৃদু কণ্ঠে বললে, আগে তাই ভাবতাম মা! এখন আর পারি না। এখন মনে হয়, এখান থেকে আর বেরুতে পারব না। ওই কোণে এক খুন্‌খুনে বুড়ি মারা গেল, দেখেছিলে?

বললাম, দেখেছিলাম বই কি! এই তো সেদিনকার কথা!

—হ্যাঁ। বুড়ি জন্মেছিল কলকাতায়। বিয়ে হয়েছিল আমাদের দেশে। চিরদিন আমাদের শাসাতঃ এখানে আবার মানুষে থাকে! আমাদের কলকাতায়…। শেষ বয়সে কলকাতাতেই সে এল। রইল প্ল্যাটফর্মে, শহরে। রোজই আশা করত, তার মামা খবর পেলেই নিতে আসবে। আবার সে শহরে বাস করবে! কিন্তু মামাও এল না, তার শহরে বাস করাও হল না। মরল এইখানেই।

বুড়ি একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, আমারও অদৃষ্টে তাই হবে কি না, কে জানে।

বললাম, না, না। তা হবে কেন? বুড়ির বয়স হয়েছিল, মরে গেল। দেখবেন, তারও নাতি-নাতনীরা ঘর পাবে, সব পাবে।

—তাই পাক। আহা, কারও যেন কোনো দুঃখ না থাকে।

মা বললেন, তাই কও বুড়ি মা, কারও যেন কোনো দুঃখ না থাকে। যে দুঃখ পেলাম, পেলাম। এবার যেন শান্তি পাই।

মায়ের চোখে জল এসে গেল। কথায় কথায় মায়ের চোখে জল আসে। এখানে এসে বন্ধ ছিল। দেখা যাচ্ছে, আবার আসতে আরম্ভ করেছে।

॥ আট ॥

বাবা বললেন, রাজমিস্ত্রির কাজ হয়ে গেল। কাল বাদ দিয়ে পরশু আমরা যাব।

পরশু!

কি আশ্চর্য! যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কাল বাদ দিয়ে পরশু! কোনোদিন যে এই প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যেতে পারব, ভাবতেই পারিনি। অঞ্জনা বলত, একটা অতিকায় জন্তুর মতো এই প্ল্যাটফর্ম আমাদের আঁকড়ে ধরেছে। তার লালায় আমাদের জীর্ণ করে আনছে। যাব একদিন এখান থেকে যখন হাড় কখানা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। যাব শ্মশানে।

বুড়ির কথাতেও যেন সেই কথারই প্রতিধ্বনি। মৃত্যুর আগে এই পঙ্ককুণ্ড থেকে পরিত্রাণ নেই।

অথচ সত্যিই চলে যাচ্ছি এখান থেকে। কাল বাদে পরশু। উদ্বাস্তু উপনিবেশে নয়, ভাড়া করা বাসায়। সেখানে আবার আগের মতো মানুষের জীবনযাত্রা আরম্ভ করব। স্বাধীন মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবনযাত্রা।

এ যে কোনোদিন সম্ভব হবে, ভাবিনি। যা কাল-বাদে পরশু থেকে শুরু হবে, আজও তা যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে মানুষ বাস করে না, ঘরেই বাস করে, এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের আগে কেউই যে প্ল্যাটফর্মে বাস করত না, এত বড় সহজ কথাটা জানা থাকা সত্ত্বেও কেন যে বিশ্বাস করতে বাধছে, সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

তারও চেয়েও আশ্চর্য, এই প্ল্যাটফর্ম, যাকে আমরা নরককুণ্ড বলে এসেছি, তাকে ছেড়ে যাব ভাবতে কষ্ট হচ্ছে।

আশ্চর্য মানুষের মন। সে কি চায় আর কি চায় না এবং যা

যায় না তারও সঙ্গে মন কি করে বাঁধা পড়ে যায়, কেউ বলতে পারে না।

কাল বাদে পরশু।

আজকের দিন তো চলেই গেল। মাঝখানে আর একটি দিন। তাও না। কাল সন্ধের আহারাদির পরেই বাসন-কোসন যা দু'চারটে আছে বাঁধা হয়ে যাবে। মন বলতে গেলে তখনই এই ঝুলন্ত বাবুই-বাসা ছেড়ে চলে যাবে।

তার মানে এই প্ল্যাটফর্ম ও নতুন বাসার মধ্যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান।

বাবা কোথায় গিয়েছিলেন। দেখলাম, ফিরে চায়ের দোকানে গিয়ে বসেছেন।

দোকানী বেশ খাতির করে চা দিলে। হেসে কি যেন কথা বলছে।

আমি আর মা চুপ করেই বসে ছিলাম।

হঠাৎ মায়ের চোখ ছল্‌ছল করে উঠল ঃ খুব কষ্ট হইতে আছে।

—হুঁ।

আমারও চোখ বোধ হয় ছলছল করে উঠল।

ইঁটের বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে একটা নোংরা মেয়ে। মাথার চুল তেলের অভাবে কটা। আদুল গা। পরণে একটা ময়লা দুর্গন্ধ ন্যাকড়া বাঁধা। হাতে কলাই-ওঠা একটা বাটি।

কেন জানি না, এই মেয়েটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না। আজও ওকে দেখে মন যে প্রসন্ন হল তা নয়, কিন্তু মেজাজ রুক্ষ হল না।

জিজ্ঞেস করলাম, কি ?

উত্তরে মেয়েটি কুঁই কুঁই করে কি বললে বোঝা গেল না, কিন্তু তার বাটিটা এগিয়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে বোঝা গেল, ভিক্ষা চায়।

ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার নজির এর আগে পাইনি।

হেসে ফেললাম : ও মা !

মাও হেসে বললেন, অরে একটা ফুটা পয়সা দে।

হাসতে হাসতে তার বাটিতে একটা পয়সা দিতেই মেয়েটা সরে পড়ল।

বাবাকে দেখে আরও জনকয়েক সমবয়সী উদ্বাস্তু চায়ের দোকানে ছুটেছে। দূর থেকে মনে হল, বাবা খুব জমিয়েছেন। হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন একটা হাসির কথা বলছেন। সবাই খুব জোরে জোরে হাসছে।

দূর থেকে আমরা ঈর্ষাকাতর নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখছি। আমাদের সঙ্গী নেই। হাত নেড়ে নেড়ে জমাবার মতো কোনো হাস্যকর বিষয়ও নেই।

মা বললেন, ওকে ডাক।

বললাম, আমি কি কোনোদিন চায়ের দোকানে যাই যে, বাবাকে ডাকতে যাব ?

—আইজ আর দোষ নাই।

মায়ের দিকে অবাক হয়ে চাইলাম : দোষ নেই কেন ?

—না। আমরা তো চলে যাচ্ছি, আর যেতে দোষ নাই।

—এখনও তো যাইনি।

—ও যাওয়ারই মধ্যে।

বুঝলাম, কষ্টই হোক আর যাই হোক, মায়ের মন এখানকার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছেন। এখানকার সামাজিক রীতি-নীতি মানার আর প্রয়োজন বোধ করছেন না।

এমন সময় বাবা এলেন : ছাড়িয়া যাইতে মনও সরে না রে।

মায়ের চোখ আবার ছল্‌ছল করে উঠল : কষ্ট হয়।

—হ। যারে চেনতাম না, সেও দেখি আপন হইয়া গেছে। চলিয়া যাওয়ার নামে কাঁদে।

বাবার চোখও ছলছল করে উঠল।

বাবা বললেন, বাইস্তার ডোল তো নয়, রীতিমত গেরস্ত মানুষ। নতুন বাসার জন্যে কি কি জিনিস লাগবে তোর মাকে জিগ্যেস করে একটা ফর্দ কর। আজকেই কিনতে হবে।

—কিছুই তো নেই। বলতে গেলে সবই তো কিনতে হবে। সে অনেক জিনিস।

—নারে বোকা; অনেক জিনিসের ফর্দ নয়। সে সব একে একে রয়ে বসে কিনতে হবে। এখনই সদ্য সদ্য যা নইলেই নয়, তেমন জিনিসের ফর্দ কর। আমি আসছি।

বাবা বেরিয়ে গেলেন। আমরা ফর্দ করতে বসলাম। তাঁর কথামত সামান্য জিনিসের ফর্দ। যা না হলেই চলবে না। বেশ ভেবে ভেবে করতে হচ্ছে। তাঁর হাতে কি রকম টাকা আছে জানা তো নেই।

লিখছিলাম, কিন্তু ভাবছিলাম অন্য কথা।

প্রথমত বরুণের কথা। সে ক'দিন আসেনি। তার বাবা কেমন আছেন, কে জানে। আমরা উঠে যাচ্ছি জেনে গেছে। কিন্তু ঠিক কবে উঠে যাচ্ছি জানে না। আজ এলে ভালো হত।

আর ভাবছিলাম অঞ্জনা রঞ্জনার কথা।

অঞ্জনার সঙ্গে বহুকাল দেখা নেই। শুনেছিলাম, তার মায়ের খুব অসুখ। বুড়ি গেল না রইল, খবর পাইনি। শেয়ালদা দিয়ে সে বোধ হয় আসা-যাওয়াই করে না। করলে দেখা হত নিশ্চয়! আশ্চর্য, এই মেয়েটার কথা কিছুতে ভুলতে পারিনা!

আর রঞ্জনা।

তার সঙ্গে সেই যে ট্রেনে দেখা হয়েছিল, আর হয়নি। বলেছিল সম্ভব হলে ফেরবার পথে দেখা করে যাবে। সম্ভব হয়নি বোধহয়। তার স্কুলের কি হল কে জানে! বলেছিলাম, আমার জন্যে একটা মাষ্টারীর চেষ্টা করতে।

মেয়েটা লড়াই করতে পারে বটে। ওরা দুজনেই। উদ্বাস্তু উপনিবেশে জায়গা যোগাড় করা থেকে সব তো ওরাই করলে।

হয়তো স্কুলটাও করবে। কিন্তু এখন তো ভাড়া বাড়িতে উঠে যাচ্ছি। বাবা আমাকে মাষ্টারী করতে দেবেন কিনা সন্দেহ।

তা সে মাষ্টারীর কথা আমিও আর ভাবিনা। কিন্তু মেয়ে দুটোর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়, এটা চাই না। আর এখান থেকে চলে গেলে, কলকাতার জনারণ্যে তারা কি আমাকে খুঁজে বার করতে পারবে?

চায়ের দোকানী এবং বুক-ষ্টলের বাবুর কাছে বাবা হয়তো নতুন বাসার ঠিকানা রেখে যাবেন। তাঁর ব্যবসার জন্যে ঠিকানা রেখে যাওয়ার দরকারও হবে। এখন রোগীদের পক্ষ থেকে যারা আসে, ওখানেই আসে। আরও কিছুদিন, আমাদের নতুন ঠিকানার সঙ্গে পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত ওইখানেই আসবে। তাদের জন্যে ওই দুটি জায়গায় ঠিকানা রেখে যাওয়ারও দরকার হবে, ওখানে এসে একবার করে বসবারও দরকার হবে।

কিন্তু অঞ্জনা রঞ্জনা তো তা জানে না। তারা কি আর বুদ্ধি করে ওখানে গিয়ে জিগ্যেস করবে? প্ল্যাটফর্মের উদ্বাস্তুরা আমরা চলে যাচ্ছি তাই জানে। কোথায়, তা কি জানে?

ওদের সঙ্গে দেখা হলেও ভালো হত। ক'দিন প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে গিয়েও দাঁড়িয়েছি। কিন্তু দেখা হল না। সন্দেহ হয়, হয় ওরা কলকাতায় আসছেই না, নয় অন্য দিক দিয়ে, সম্ভবত বাসে আসছে।

বাবা কোথায় গিয়েছিলেন জানি না, ফিরলেন খুব ব্যস্তভাবে। ক'দিন থেকেই বাবা খুব ব্যস্ত। দু'চারটে রোগীও হয়তো আছে, কিন্তু বেশি ব্যস্ত নতুন বাড়িতে যাওয়া নিয়ে।

এসেই জিগ্যেস করলেন, ফর্দ হয়েছে?

ফর্দটা তাঁর হাতে দেওয়া হল। তার উপব একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, ওরে বাবা! এ আমি কিনতে পারব না। খঞ্জনা তুই সঙ্গে চল।

যেতে হল।

বাবার সঙ্গে কোনোদিন বাজারে যাইনি। এই প্রথম।

পথে বরুণের সঙ্গে দেখা। ভালোই হল। বাবার সঙ্গে কোথাও বেরুতে কেমন আড়ষ্ট বোধহয়। সম্ভবত অনভ্যাসের জন্যে।

বরুণ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় চলেছেন?

বাবা বললেন, বাজারে। তোমার সঙ্গে দেখা হল, ভালোই হল। আমরা বাড়ি পেয়েছি, শুনেছ বোধহয়।

—কবে উঠে যাচ্ছেন?

কাল। সংসারের কতকগুলো জিনিস কিনতে হবে। ওসব আমি বুঝি না, তাই একে সঙ্গে নিলাম।

বলে আমার দিকে চাইলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা হল, ভালোই হল। চল, আমাদের একটু সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে বাড়িটাও তোমাকে চিনিয়ে দেওয়া দরকার।

আমিও ইসারা করলাম আমাদের সঙ্গে যেতে।

বরুণের মনে হল অন্য কাজ ছিল। কিন্তু আপত্তি করলে না। আমাদের সঙ্গে চলতে লাগল। বাবা অনর্গল বকে চলেন। বাড়ির কথা, টাকাকড়ির অসুবিধার কথা, টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনার কথা, আবোল-তাবোল কত কি কথা। বরুণ শুনে যায় আর মাঝে মাঝে হুঁ দেয়। বরুণের বাবা কেমন আছেন, সেকথা জিগ্যেস করতে বাবার ভুল হয়ে গেল। বাড়ির হাঙ্গামা নিয়ে তাঁর বোধহয় সব ভুল হয়ে গেছে।

জিগ্যেস করলাম আমি। অনেক পরে। একটা নিরিবিলি মুহূর্তে। শুনলাম ভালো নেই।

সামান্য জিনিস পত্র। সে সব আগের রাত্রেই বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গিয়েছিল। সকালে দু'খানা রিক্সা করে সেগুলো নিয়ে নতুন বাসায় উঠে যাওয়া। এই আর কি।

ঘুম এখানে সকলেরই খুব সকালে ভাঙে। সূর্য ওঠার আগে

তো বটেই, প্ল্যাটফর্মের আলোগুলো নেভবার আগেও। তখনই প্ল্যাটফর্ম জাগে, কাজ আরম্ভ হয়, আমরাও জাগি।

জেগে ভাবলাম এইবার যেতে হবে।

পরিচিত প্ল্যাটফর্মের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। অদ্ভুত লাগল। আশ্চর্যও লাগল। এমনটি আর কোনোদিন লাগেনি।

প্রাতঃকৃত্যের ঝামেলা নেই। সে সব নতুন বাড়িতে গিয়ে হবে। শুধু কল থেকে মুখটা ধুয়ে এলাম। বসতে না বসতেই চায়ের দোকান থেকে চা এসে উপস্থিত।

চা!

বয় বললে, হ্যাঁ। বাবু পাঠিয়ে দিলেন।

বুঝলাম বিদায়-সম্বর্ধনা। বেশ খানিকটা গৌরব বোধ করলাম। চায়ের দোকানের বাবুর সঙ্গে ইদানিং বাবার বেশ খানিকটা খাতির জমেছে। সেই সূত্রেই এই সম্বর্ধনা।

চা খেয়ে বাবা চায়ের দোকানে গেলেন বিদায় নিতে।

সেখান থেকে বুকষ্টলে।

বিদায় আর কি। এখনও কিছুদিন তাঁকে নিয়মিতই ওখানে হাজিরা দিতে হবে। ও দুটো তাঁর কেন্দ্র।

এদিকে দেখতে দেখতে প্রতিবেশিনীরাও এসে জমতে লাগল আমাদের বিদায় দেবার জন্য।

প্ল্যাটফর্ম একটা মুসাফিরখানা। মানুষের আসারও বিরাম নেই, যাওয়ারও নেই। এক যাচ্ছে, আর আসছে। জায়গা শূন্য থাকতে পাচ্ছে না। ওদিকে ছিল অঞ্জনারা, তারও ওদিকে রঞ্জনারা, তারা চলে গেছে। অন্য পরিবার তাদের জায়গায় এসে বসে গেছে। বোঝবার উপায় নেই ওখানে অন্য লোক ছিল। লোক আসে, চলে যায়। কেউ কোনো চিহ্ন রেখে যায় না।

আমরাও তাই যাব।

বিকেলেই যদি বেড়াতে আসি, দেখব এখানে অন্য লোক এসে

গেছে। আমরা যে এখানে ছিলাম, তা আমরাই বুঝতে পারব অন্য বোঝবার মতো কোনো চিহ্ন থাকবে না।

জলের লিখন।

কিন্তু শুধুই জলের লিখনও নয় বোধ হয়। এখান থেকে কত লোক এসেছে, কত লোক গেছে। কই, কাকেও বিদায় দিতে এত লোক তো কখনও আসেনি।

আন্তরিকতার অভাবও বোধ হল না।

সকলেরই চোখ ছলছল। যত ওরা কাঁদে, তত আমরাও। ওদের ছেড়ে যেতে সত্যিই কষ্ট অনুভব করছিলাম! মনে হয়, এই অনাবৃত প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য অসুবিধার মধ্যে মন্দই বা কি ছিলাম!

প্রীতি ভালোবাসা নিয়ে সমাজ। এতদিন মনে হয়েছিল, সেই বস্তুটিরই এখানে অভাব। একই দুর্ভাগ্য নিয়ে একই দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে প্রীতি-ভালোবাসা দূরে থাক, মুখের পরিচয়ও নেই। সবাই নিজের নিজের ধান্দায় ঘুরছে। দু'দণ্ড গল্প করার ফুরসুৎ কারও নেই।

এখন মনে হল, সবই সত্যি। কিন্তু যতটা মনে করেছিলাম ততটা নয়। ওরই মধ্যে নানা দুঃখ-দুর্দশা ও অভাবের মধ্যেও একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। নইলে এত লোক আসে কেন, কাঁদে কেন, বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করে কেন?

ওরা কাঁদল। আমরাও কাঁদলাম। বাবা গিয়েছিলেন চায়ের দোকানে, বুকস্টলে এবং আরও কোথাও কোথাও। তাঁরও চোখ শুষ্ক নয়। তারপরে দু'খানা রিক্স। করে আমরা রওনা হলাম নতুন বাসার দিকে। মনটা ভারি। পিছনে প্রতিবেশিনীরা চীৎকার করছে, মাঝে মাঝে এস। মাঝে মাঝে এস।

সমস্ত দিন ঘর গোছাতে আর বাজার করতে গেল। এটা এসেছে তো ওটা আসেনি। বাবার দৌড়াদৌড়ির অন্ত রইল না। টুকিটাকি জিনিস তো বটেই, বড় জিনিসও।

ঘর অত্যন্ত স্যাঁৎসেতে। তক্তাপোষ না হলে শোয়া যাবে না। ওখানে বিছানাপত্র ছিল না, তার দরকারও হয়নি। এখানে দরকার। বাবার চেম্বারের জন্যে একখানা টেবিল আর গোটা কয়েক চেয়ার নিতান্তই চাই।

সবই কিনতে হল।

এমনি করে দিন কাটল, কিন্তু কি রকম একা একা। আশে পাশে লোকজন নেই। কেউ আমাদের দেখছে না, কেউ আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না।

মাঝে মাঝে কি রকম যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। যে আব্রুর অভাবে গোড়ার দিকে অস্বস্তি বোধ করতাম সেই আব্রুই কেমন অস্বস্তির কারণ হচ্ছে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে চারিদিকে চাইলাম। চারিদিকে লোকজন যাতায়াত করছে না। বহু লোকের কলরব শোনা যাচ্ছে না। প্ল্যাটফর্মের আলোগুলোও জ্বলছে না। অন্ধকার ঘর। নিস্তব্ধ নিরিবিলি পরিবেশ।

মাকে বললাম, আর একটু শুয়ে থাকি, নয় মা। এখানে কেউ তো আমাদের দেখছে না।

মা হাসলেন: সেই ভালো। এত সকালে উঠে কি হবে? কাজ তো কিছু নেই।

বাবা হেসে বললেন, কিন্তু আমাকে উঠতে হবে।

—কেন?

—প্ল্যাটফর্মে যেতে হবে। রোগীপত্তর যদি আসে। তোমরা শুয়ে থাকতে পার। ওখানেই খেয়ে নোব।

বাবা হাতমুখ ধুয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমরা আরও কিছুক্ষণ শুয়ে রইলাম।

—মা?

—কি?

—এখানে এসে পর্যন্ত তুমি একদিনও কোথাও বেরোও নি। আজ একটু কোথাও বেরুবে ?

—কোথায় ?

—যেখানে হোক। কিছু জিনিসপত্র কিনতে, কিংবা ওদের কলোনীতেও যাওয়া যায়।

—কাদের কলোনীতে ? বরুণদের ?

—হ্যাঁ। সেদিন শুনলাম ওর বাবা ভালো নেই।

মা উৎসাহের সঙ্গে উঠে বসলেন। বললেন, যাব।

এরকম উৎসাহ একদিনও দেখিনি।

জিগ্যেস করলেন, কে নিয়ে যাবে ?

বললাম, আমিই নিয়ে যাব। আমি চিনি।

—তবে আর কি। খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে পড়ব। সন্ধ্যের আগেই ফিরব। হবে না ?

—খুব হবে। ট্রেনে কতটুকু সময়ই বা লাগে !

মা ধড় মড় করে উঠে বসলেন : তাই চল। আর ঘুমোতে হবে না, ওঠ। সকাল সকাল রান্না-বাড়া সেরে নিতে হবে।

মায়ের যেন আর তর সইছিল না।

বললেন, আসবার সময় সেই যা রেলগাড়ি চড়েছিলাম। জীবনে আর কোনদিন চড়িনি।

—কতদিন তো তোমাকে বলেছি। তুমিই যেতে চাওনি।

—না। ইচ্ছে করত না।

—কতদিন হল এসেছ, কিন্তু কলকাতা সহরের কিছুই তুমি দেখলে না।

—না।

—সন্ধের পরে যদি একবার বেরোও মা, তাক লেগে যাবে। যেন ইন্দ্রপুরী।

মা চোখ বড় বড় করে শুনতে লাগলেন কলকাতা সহরের বর্ণনা

বললেন, এইবার সব ঘুরে ঘুরে দেখব। সিনেমা থিয়েটার যাদুঘর চিড়িয়াখানা সব। বরুণকে কইব সে আমাদের দেখাইব। কি কস? দেখাইব না?

—ক্যান্ দেখাইব না।

হঠাৎ মায়ের শাড়িখানার দিকে দৃষ্টি পড়ল। একখানি শতচ্ছিন্ন ময়লা শাড়ি, প্ল্যাটফর্মে যতদিন ছিলেন ওই একখানিই মাকে চব্বিশ ঘণ্টা পরে থাকতে দেখেছি। আজ দেখি নতুন ফর্সা শাড়ি।

জিগ্যেস করলাম, সে শাড়িটা বদলেছ মা?

লজ্জায় মা মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

বললাম, চল মা, আজ তোমার মাথার চুলে তেল দিয়ে দিই। চুলে জট পড়ে গেছে।

—কতদিন তেল পড়ে নাই।

ইতিমধ্যে বাবা বাজার নিয়ে ফিরলেন।

—তোরা উঠিসনি এখনও?

—উঠছি তো।

—গা ধুস নি? উনোন ধরাসনি?

মা বললেন, নিরিবিলি একটু গল্প করছিলাম। তুমি চা খাইছ?

—হ। খাইছি।

মা বাবাকে বরুণদের কলোনীতে বেড়াতে যাওয়ার কথা বললেন।

বাবা বললেন, আমি তো বাড়িতে আছি। বেশ তো, ঘুরে এস না।

মা বললেন, কলকাতা সহরের কিছুই দেখি নাই। সব দেখাইতে হইব।

—বেশ তো।

বাবা চেম্বারে গিয়ে বসলেন।

কিছু পরে সেখানে বাবাকে চা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

—কি হল ? বাবা জিগ্যেস করলেন।

হেসে বললাম, কিছু না।

ফিরে এসে মাকে বললাম, মা, একবার দেখবে চল।

—কি'রে ?

—বাবা চেম্বারের মধ্যে চেয়ারে বসে আছেন। চিনতে পারা যাচ্ছে না। একদিনেই কেমন বদলে গেছেন।

বাবা শুনতে পেলেন আমার কথা। বললেন, কি হয়েছে? কি হয়েছে ?

মা হাসতে হাসতে বললেন, খঞ্জনা বলছে, তুমি অন্য রকম হয়ে গেছ।

বাবা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ।

বললেন, আশ্চর্য কিছুই নয়। মানুষও বহুরূপী। যখন যেমন জায়গায় থাকে, তেমনি জায়গার রং নেয়। শুধু আমি নই, তোমরা সবাই অন্য রকম হয়ে গেছ। তাই হয়।

বরুণের বাবাকে সেদিন যেমন দেখেছিলাম, তেমনিই দেখলাম। বরং আরও দুর্বল মনে হল! আমাদের দেখে খুব আনন্দ করবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু তারও উপায় নেই। একটু জোরে হাসতে গেলে, কি দু'চারটে কথা বলতে গেলেই হাঁফ উঠছে।

এবং সে একটা হৃদয়বিদারক দৃশ্য!

মা বরুণের মাকে বললেন, বেয়াইএর যেরকম শরীরের অবস্থা তাতে বিয়েতে আর দেরী করা উচিত নয়। সেই বিয়ে হবে, অথচ উনি দেখতে পাবেন না, এ কি একটা কথা হল ?

তিনিও বললেন, বটেই তো। আমারও তাই ইচ্ছে, ওঁরও তাই ইচ্ছে।

—তাহলে ?

—যে বিয়ে করবে, তারই মত নেই।

—কেন ? কি বলে সে ?

—বলে সেই মামুলী কথা। এখানকার ছেলেরা যা বলে থাকে : খাওয়াব কি ? তোমাদেরই খাওয়াতে পারছিনা। আবার একটা প্রাণী আনব ? তার পরে ছেলেমেয়ে হবে। না মা ওসব এখন থাক। একটু সামলে নিই, তার পরে।

—কিন্তু উনি দেখে যাবেন না ?

বরুণের মা হেসে বললেন, সেকথা বললে বলে, 'উনি কি দেখেন নি ? বৌ তো দেখা।' যদি বলি 'শুধু দেখলেই হল ? ঘর করবেন না ?' তখন বলে, 'বেশ তো এইবার এলে দু'দিন আটকে রাখো। ওর ভালোমন্দ রান্না দুটো খাইয়ে দাও তাহলেই ঘর করা হবে।' ও ছেলে বড় কঠিন ছেলে বেয়ান। ওকে আমি সামলাতে পারি না।

সে আমিও জানি। বরুণ কম নয়, সেই জন্যেই তাকে সামলানো আরও কঠিন।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুই বেয়ানের কথা শুনছিলাম। বাইরে থেকে ইসারা করে ডাকলে।

—ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুনছ ?

—তোমার গুণপণা।

সে কি তোমার অজানা ? শোন, নতুন বাসায় তোমরা উঠে এসেছ ?

—হাঁ। কবে যাচ্ছো ?

—দিন বলা মুস্কিল। কিন্তু যে কোনো দিন যাব। আর শোন, তোমার সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা।

—কোন বন্ধু ?

—সেই যে বন্ধুটির সঙ্গে সেদিন ট্রেনে দেখা হয়েছিল। রঞ্জনা বোধ হয় তার নাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কি বললে সে ?

—তোমাকে খুঁজছে। বললে যাবে একদিন প্ল্যাটফর্মে। এসে ছিল ?

—না। আমরা চলে আসার পর যদি এসে থাকে, জানিনা। তাকেও আমার দরকার। আমার খোঁজ করে আর সে পাবে না। যদি আবার কোনোদিন তার সঙ্গে দেখা হয় আমার নতুন ঠিকানাটা দিও।

—দোব।

—তোমার সঙ্গে আমার আরও কিছু কথা আছে।

—বল।

—এখন নয়। অন্য একদিন বলব। এখনও মন ঠিক তৈরি করতে পারিনি।

কি কথা জানি না। কিন্তু মন তৈরি হতে বরাবরই ওর দেরি হয়। কাজেই কথাটা শুনতে গেলে আমাকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তাতে আর ভুল নেই। ফেরবার পথে ট্রেনে অঞ্জনার সঙ্গে দেখা। যা মোটেই ভাবিনি। ট্রেনে আসা যাওয়া আমার কম। একবার রঞ্জনার সঙ্গে দেখা। অঞ্জনার সঙ্গে কোনোদিন না! তার সঙ্গে কোনোদিন ট্রেনে দেখা হতে পারে এ কল্পনাও করিনি।

ওর চেহারায় বেশ খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। পরণের শাড়ি ব্লাউজ জমকালো। দু'গাছি সরু সোনার বালা। গলাতেও একগাছি সরু সোনার হার। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ এবং বেঁটে ছাতা সমস্ত মিলিয়ে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে।

জিগ্যেস করলে, এদিকে কোথায় ?

—বরুণের বাড়ী। তুই এদিক দিয়ে যাওয়া আসা করিস, অথচ দেখা করিস না।

—এদিকে মোটেই যাওয়া আসা করি না। আজ রঞ্জনার বাড়ি গিয়েছিলাম বলেই এদিক দিয়ে আসা।

—রঞ্জনার খবর কি ?

—ভালো নয়। খুব ঝামেলার মধ্যে রয়েছে। বলব। তোদের খবর কি ?

হেসে বললাম, প্রথমত প্ল্যাটফর্মে আর নেই।

অঞ্জনা লাফিয়ে উঠল—সে কি ? কোথায় আছিস তাহলে ?

ঠিকানাটা বললাম। অঞ্জনার চক্ষু স্থির !

বললে—সেখানে কে আছে ?

—কেউ নেই। আমরাই ভাড়া নিয়েছি দু'খানি ঘর। একটিতে বাবার চেম্বার, আর একটিতে আমরা থাকি। চল, যাবি ? অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

অঞ্জনা দ্বিধা করছিল।

জিগ্যেস করলাম, জরুরী কাজ আছে কিছু ?

—আছে, কিন্তু তার দেরি আছে। চল, ইতিমধ্যে তোদের নতুন বাসাটা দেখেই যাই।

ওকে নিয়ে এলাম।

সত্য কথা বলতে গেলে বাড়ি দেখবার কিছু নয়। নানা দিক দিয়ে বিচার করলে বরং কদর্যই বলা চলে। কিন্তু দিনকাল বিচার করলে স্বর্গ। বাড়ি পাওয়াই কঠিন, তার ভালো-মন্দ।

অঞ্জনা জিগ্যেস করলে, ভাড়া কত ?

বললাম, সেলামি শুদ্ধ ?

অঞ্জনার চক্ষু স্থির: সে তো অনেক টাকা।

—উপায় কি বল।

শুনে অঞ্জনার মুখের ভাব কি রকম হয়ে গেল। অঞ্জনা দাম্ভিক মেয়ে। সকল সময় নাক তুলে থাকে। উদ্বাস্তুদের সে মানুষ বলেই মনে করে না। ভালো করে সে কারও সঙ্গেই কথা বলত না। যার সঙ্গে কথা বলত, করুণা করেই বলত। সকল সময় প্রজাপতির মতো পাখনা উড়িয়ে বেড়াত। আর কি ছিল তার

চোখে মুখে, দেহের সৌষ্ঠবে যে, সবাই তার পিছনে ছুটত। যার সঙ্গে একটু হেসে কথা বলত, সে কৃতার্থ হয়ে যেত।

আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে। কিন্তু তারও মধ্যে একটু করুণা মেশান আছে।

শিয়ালদা ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মের পরের ষ্টেশন হচ্ছে উদ্বাস্তু উপনিবেশ। উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তারা এখান থেকে সেখানে যায়। অঞ্জনারা গেছে রঞ্জনারা গেছে। আরও কেউ কেউ গেছে কিন্তু অধিকাংশই যেতে পারেনি। প্ল্যাটফর্মে পড়ে পড়ে পচছে। আরও কতদিন পচবে কে জানে।

সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে একেবারে পরের ষ্টেশন ডিঙিয়ে ভাড়া কবা বাসায় উঠে আসা, প্রচুর সেলামি দিয়ে—ভাবতেই অঞ্জনার মুখের অবস্থা কি রকম হয়ে গেল।

বললে, তোরা তাহলে ছলনা কবে প্ল্যাটফর্মে পড়েছিলি ?

হেসে বললাম, ছলনা কবে ওই নরকে অতদিন কেউ পড়ে থাকতে পারে ?

—তা নয়তো কি, .তাদের টাকা ছিল।

—না। অল্প টাকা ছিল। বাড়ি ভাড়া করে থাকার মতো নয়। তার পরে বাড়ি ভাড়া করে থাকব তো খাব কি ? হঠাৎ বাবার প্র্যাকটিস জমতে লাগলো। সেই ভরসাতেই আসা। বলতে গেলে সর্বস্ব খুইয়ে আসা।

ওকে সমস্ত কথা বললাম।

অঞ্জনা বললে, তুই রঞ্জনাকে মাষ্টারীর কথা বলেছিলি ?

—বলেছিলাম।

হেসে বললে, আর তো দরকার হবে না।

আমিও হেসে বললাম, বোধ হয় না !

বললে, হলেও সুবিধা হত না। রঞ্জনা খুব মুস্কিলে রয়েছে।

—কি রকম ?

—স্কুলের টাকাকড়ি সব মঞ্জুর হয়েছে। এখন স্কুলটা কোথায় তৈরি হবে তাই নিয়ে তুই পাড়ার মধ্যে তুমুল কাণ্ড। তার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন। যাবি একদিন?

—যাব।

—তুই তো সব সময় বাড়ি থাকিস?

—প্রায় সব সময়।

—তাহলে আমি পরশু দুপুরে এসে তোকে নিয়ে যাব।

—ঠিক আছে।

মা ওকে চা খাবার দিলেন।

জিগ্যেস করলাম, তুই এখন সেজেগুজে যাচ্ছিস কোথায়?

—কাজে।

অঞ্জনা হাসলে।

—কোথায়? কি কাজ করিস?

—সে আর একদিন বলব।

ওর মুখে সেই হাসি। হাসিটা ভালো লাগল না। কিছু একটা করে। হয়তো বলবার মতো নয়। অঞ্জনার ঘোরা ফেরা, চাল-চলন, কথাবার্তা থেকে এ সন্দেহ আমার বরাবরই আছে। বরুণেরও সেই রকম সন্দেহ।

অঞ্জনা তার ভ্যানিটি ব্যাগ এবং বেঁটে ছাতা নিয়ে চলে গেল। বলে গেল পরশু আসছে।

॥ দশ ॥

সেদিনের কথা জীবনে ভুলব না। অঞ্জনা চলে যাওয়ার পরের দিনেরই ঘটনা।

এমন দিনও মানুষের আসে!

ভোর পাঁচটায় উঠে বাবা রোজ যান স্টেশনের চায়ের দোকানে। সেখানে একটু চা খেয়ে গল্প করে আসেন বুকষ্টলে। সেখানেও কিছুক্ষণ খবরের কাগজ পড়েন, গল্পও করেন ছ'টা পর্যন্ত।

নতুন রোগী এখনও ওইখানেই গিয়ে বাবার খোঁজ করে। যে দিন বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বাবা তাকে সঙ্গে করেই বাড়ি ফেরেন। যেদিন দেখা হয় না, সেদিন ওঁরা লোক দিয়ে বাসায় পাঠিয়ে দেন। ফেরবার সময় বাবা একেবারে বাজার করে ফেরেন।

সেদিনও তাই ফিরলেন। চা খেয়ে চেম্বারে গিয়ে বসলেন।

একটি রোগী এল। রোগী নয়, রোগীর লোক।

বাবা জিগ্যেস করলেন, রোগী আনেননি?

—না, আপনাকে যেতে হবে।

বাবা বললেন, আমি দশটা পর্যন্ত চেম্বারে থাকি। দশটার আগে তো যেতে পারব না। কতদূরে বাড়ি?

—কাছেই। মিনিট পাঁচেকের রাস্তা।

বাবা কি ভাবলেন। বললেন, তাহলে চলুন দেখেই আসি।

আমাদের বলে গেলেন, কেউ এলে বসাবি।

আধ ঘণ্টা পরে বাবা তাকে নিয়েই ফিরলেন। ওষুধ দিয়ে বিদায় করলেন। বিকেলে এসে খবরটা দিয়ে যাবেন, রোগী কেমন থাকে।

লোকটা চলে যেতে তিনি একটা হোমিওপ্যাথি বই খুলে পড়তে লাগলেন অন্য রোগীর প্রতীক্ষায়।

এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত এই তাঁর কাজ। সকালে, রোগী না থাকলে বিকেলেও। বন্ধু-বান্ধব নেই। থাকবার কথাও নয়। বিরক্ত বোধ করলে স্টেশনে যান।

সেদিন দেখে গেলাম বাবা বই পড়ছেন।

একটু পরে খাবার দেওয়া হবে।

মা গেলেন কি একটা দরকারে। দুটো কথা বলে চলে এলেন।

আধ ঘণ্টা, কি বড় জোর তিন কোয়ার্টার : ডান হাতে খাবারের বাটি, বাঁ হাতে জল। ঘরে ঢুকতেই মনে হল বাবার মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

ঘুমুচ্ছেন নাকি ? কি হয়তো খুব ক্লান্ত।

—বাবা, খাবার এনেছি।

সাড়া নেই।

ভালো করে চেয়ে দেখি, বাবাব চোখের তারা স্থির। মুখ হাঁ করে আছেন। সংজ্ঞাহীন।

হাতের বাটি-গ্লাস ঝনঝন করে হাত থেকে পড়ে গেল।

চীৎকার করে উঠলাম, ও মা, শিগগির এস।

জড়িয়ে ধরলাম বাবার দেহ। ছুটে এলেন মা। যত ডাকি বাবা, বাবা! সাড়া নেই! দেহ বরফের মতো ঠাণ্ডা আর কাঠের মতো শক্ত।

কি হল এই ক'মিনিটের মধ্যে ? কি কি হতে পারে ?

আমার কান্না আর চীৎকারে সর্ব প্রথম রাস্তার লোক, তারপরে বাড়িওয়ালা আর তাঁর স্ত্রী ছুটে এলেন। কে একজন পাশের থেকে একজন ডাক্তারও নিয়ে এলেন।

তিনি এসে নাড়ি দেখলেন। বুক পরীক্ষা করলেন। তারপর মাথা নিচু করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন

না। আর দেখবার কিছু নেই। সব শেষ।

মা মেঝেয় গড়াগড়ি দেন আর মাথা কোটেন। আমি ঠক্ঠক করে কাঁপি আর কাঁদি।

খানিকক্ষণ কেঁদে মা জ্ঞান হারালেন। তাঁর কান্না বন্ধ হল।

বাড়িওয়ালা আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে মাথায় হাত দিয়ে ডাকলেন, মা!

তাঁর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইলাম।

তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। ওই তোমার মায়ের অবস্থা। তোমাকে এখন শক্ত হতে হবে মা!

—বলুন, কি করতে হবে?

—তোমাকে বলার কিছু নেই মা। সবই তো জান

জিগ্যেস করলাম, বাবা কি সত্যিই মারা গেছেন?

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন।

—কি করে মারা গেলেন? এই তো বই পড়ছিলেন।

—হঠাৎ হার্টফেল করেছেন।

—তাহলে কার কাছে থাকব আমরা? কে আমাদের দেখবে?

কেউ জবাব দিলে না।

এবারে আমিও ভেঙে পড়লাম। 'বাবাগো' বলে লুটিয়ে পড়লাম মেঝেয়।

জ্ঞান হারিয়েছিলাম কি না জানি না। যখন উঠে বসলাম, দেখি প্ল্যাটফর্মের উদ্বাস্তু আর কেউ আসতে বাকি নেই; বুকষ্টল এর চায়ের দোকানের বাবুরাও।

খাটিয়া এসে গেছে, কিছু ফুলও। বাবাকে খাটিয়ায় শোয়ানর ব্যবস্থা হচ্ছে।

চীৎকার করে উঠলাম।

তারপরে কি হল আর মনে নেই।

বরুণের সঙ্গে দেখা হল শ্মশান থেকে ফিরে। সঙ্গে তার মাও আছেন। প্ল্যাটফর্মের বন্ধুরা খবর দিয়েছিল।

—কি ব্যাপার! কি হল?

—তা তো জানি না। ওরা বাবাকে শ্মশানে নিয়ে গেল, তাঁকে চিতায় শোয়ান হল, আমি মুখাগ্নি করলাম, বাবা আর নেই। বলে আমি বরুণের গলা জড়িয়ে ধরলামঃ বল আমরা কি করব? আমাদের কে দেখবে?

অসুস্থ স্বামীকে ফেলে এসেছেন। সুতরাং বরুণের মাকে ফিরে যেতে হল। বরুণ রইল সে রাত্রি।

একটি অন্ধকার ঘরে পাশাপাশি তিনজনঃ আমি, মা আর বরুণ।

তিনজনই বাক্যহীন।

দুর্যোগের রাতও প্রভাত হয়। আমাদের রাতও প্রভাত হল। ঘরের মধ্যে আলো এল। দেখি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে মা শুয়ে। ঘুমিয়ে নয়, জেগেই। আমাদের জেগে ওঠার সাড়া পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সে কান্না আজও থামেনি।

সকালে উঠে বরুণ বললে, আমাকে একবার কলোনীতে ফিরে যেতে হবে। দুপুরে আবার আসব।

সে চলে যাবার পরেই চায়ের দোকানের ভদ্রলোক এলেন বাজার নিয়ে।

—এ কি?

—বাজার। দুটো আলু-বেগুন।

প্রবীণ ভদ্রলোক। বাবারই সমবয়সী। মনে হল খুব চমৎকার লোক। বাবার শেষকৃত্যের সমস্ত ব্যবস্থা এঁরাই করেছেন। বাবাকে যে এঁরা কি পরিমাণ ভালোবাসতেন এখন বুঝতে পারছি।

ম্লান হেসে বললেন, তুটো খেতে হবেই মা। পেট মানবে না; বাঁচতে হবে, খাটতে হবে, খেতেও হবে। এই পৃথিবীর নিয়ম। আমার ছোট ছেলেটি যখন মারা গেল, মনে হয়েছিল আর বুঝি উঠতে পারব না। তারপরে দেখ, তুটো বছরও যায়নি, উঠছি, খাচ্ছি, কাজ করছি, বেঁচে থাকতে গেলে যা করা দরকার সবই করছি।

ভারি ভালো লাগল কথাগুলো।

বললাম, আমাদের খবর নেবেন মাঝে মাঝে।

—নোব বই কি মা। আমি যতটুকু পারি তার ত্রুটি হবে না। তবে এও বলি, মানুষের ওপর বেশি ভরসা কোর না মা।

—কার ওপর করব তবে ?

—ভগবানের ওপর। তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। তিনি সবাইকে দেখেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। মানুষের কতটুকু ক্ষমতা! তু'দিনে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

এসব কথা কখনও শুনিনি। পৃথিবীটাকে এমন করে কোনো দিন দেখিনি। দেখবার প্রয়োজনও হয়নি। ওঁর কথাগুলো খুব আশ্চর্য লাগছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম ওঁর কথাগুলো।

বললেন, তোমাকে শক্ত হতে হবে মা। মাকে দেখতে হবে। আমি বিকেলে আবার আসব।

—আচ্ছা।

বাজারের থলির সামনে বসে ওঁর কথাগুলোই ভাবতে লাগলাম। মানুষ ক্লান্ত হয়। বরুণও ক্লান্ত হবে। আমাকে শক্ত হতে হবে। ভাই নেই। পুরুষের মতো শক্ত হতে হবে। মাকে দেখতে হবে। আর ভরসা করতে হবে মানুষের উপর নয়, ভগবানের উপর।

আশ্চর্য কিছুই নয়।

অঞ্জনার ভাই নেই, রঞ্জনারও ভাই নেই। তার উপর অথর্ব বৃদ্ধ

পিতামাতা তারা তো সংসার চালাচ্ছে। শক্ত হয়েছে বলেই চালাচ্ছে।

মাথার উপর উপার্জনশীল বাবা ছিলেন, এসব কথা ভাববার প্রয়োজন হয়নি। তাঁর আড়ালে ছোট মেয়ে হয়েই কাটল এতদিন। এবার অন্য পাঠ নিতে হবে। শক্ত পাঠ।

মা জেগেই ছিলেন।

তাঁর ঘরে যেতেই জিগ্যেস করলেন, কে এসেছিল রে?

—চায়ের দোকানের সেই ভদ্রলোক।

—কি যেন দিয়ে গেলেন, না?

—হ্যাঁ, বাজার।

মা হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন: খেতে হবে, না রে?

—হ্যাঁ, মা। খেতে হবে তুমি ওঠ।

ভদ্রলোকের কথা হয়তো মা শুয়ে শুয়ে শুনেছেন।

বললাম, এখন থেকে আমাদের শক্ত হতে হবে মা। তোমার মুখ চেয়ে আমি শক্ত হব, আমার মুখ চেয়ে তুমি। ওঠ।

মা উঠলেন।

কাল মনের গোলমালে লক্ষ্য করিনি। মা উঠে বসতেই চেয়ে দেখি তাঁর সীমন্তে সিঁদুরের চিহ্ন নেই, হাত খালি, পরণে সাদা ধুতি। তাঁকে জীর্ণ মলিন বস্ত্রে দেখেছি কিন্তু এমন অসহায় রূপে আর কখনও না।

চীৎকার করে উঠলাম, মা গো, কি হয়েছ তুমি!

তার পরেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

মায়ের কাছে সন্তানের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই। আমার মূর্ছা একটি ধাক্কায় মাকে শক্ত করে দিল। প্রতিদিনের মতো সংসারের কাজকর্ম তিনি করলেন। দুপুরে বরুণ যখন এল, আমরা দুজনেই তখন শক্ত।

বরুণ জিজ্ঞাসা করলে, এবারে কি করা যায় ?

—তুমি কি বল ?

—কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ওখানে যাবে ?

—মাকে নিয়ে ? না।

—এ বাসা রাখতে পারবে ?

—কি করে রাখব ? মাস মাস এত টাকা ভাড়া দেওয়া কি সোজা কথা ?

—তাহলে ?

এমন সময় চায়ের দোকানের সেই ভদ্রলোক এলেন।

বললাম, আসুন কাকাবাবু।

এই প্রথম তাঁকে আত্মীয়ভাবে সম্বোধন করলাম।

জিগ্যেস করলেন, কি কথা হচ্ছিল ?

বরুণ বললে, এরপরে কি করা যাবে সেই আলোচনা হচ্ছিল।

—কি ঠিক হল। কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন।

বললাম, প্ল্যাটফর্মে আর ফিরে যেতে পারব না।

—না।

—এখানে এত টাকা ভাড়া দিয়েও থাকা অসম্ভব।

—সেও মিথ্যে নয়।

—তাহলে ? কোথায় যাব, কি করব ভেবে পাচ্ছি না।

কাকাবাবু কি যেন চিন্তা করলেন। বললেন, এখন থেকে ভেবে কোনো লাভ নেই। একটু সুস্থ হও। কাজকর্ম মিটে যাক। তারপর ভাবা যাবে। :তোমাদের বাড়িওয়ালা লোক কি রকম ?

—:খুব অভাবগ্রস্ত লোক। টাকা-পয়সা সম্বন্ধে লোক খুব কড়া। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ব্যবহার তো ভালোই করেন। বাড়িওয়ালা-গিন্নি আজ সকাল থেকে সমানে মাকে রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করেছেন। উনিও আমাদের খবর নিচ্ছেন।

কাকাবাবু বললেন, আমারও মনে হয় লোক খুব খারাপ নন। কাজ-কর্ম চুকে যাক। আমিও একদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলব।

তারপর বললেন, একটা কথা জিগ্যেস করি, ডাক্তারবাবু টাকা-পয়সা কি রকম রেখে গেছেন ?

—বাক্সে দেখলাম, শ'তুই টাকা আছে।

—তবে আর কি ?

কাকাবাবু যেন খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। বললেন, একেবারে জলে তো পড়নি মা। তারপরে কি করা যাবে, সে পরে দেখা যাবে।

বরুণ সমস্ত বিকেলটা রইল। তাকে খুব অস্থির বোধ হল। সাধারণতঃ সে ধীর স্থির। কিন্তু বোধ হয় বাবার মৃত্যু এবং আমাদের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠেছে।

এগারো

বরুণের ইচ্ছা ছিল আমাদের তার ওখানে নিয়ে যায়। কিন্তু কি সূত্রে সেখানে যাব, নিয়ে গিয়েই বা খাওয়াবে কি তার উত্তর সে দিতে পারে না।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলে কাকাবাবু শেষ পর্যন্ত এই স্থির করে দিলেন যে, বাড়ি মেরামতের জন্যে বাবা যে টাকা খরচ করেছেন এবং মাসে মাসে কিছু কিছু করে যা কেটে নেওয়ার কথা, সেইটে সামনের দু'মাসের ভাড়া বাবদ কাটা যাবে। সেই দু'মাস আর সেলামী থেকে আরও একমাস বিনা ভাড়ায় থাকতে পাব। এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা আমাদের করে নিতে হবে।

সে যে কি ব্যবস্থা আমাদের চোখের সামনে তার কোনো ছবি নেই। কিন্তু আপাতত তিন মাস যে থাকতে পাব, সেটাও তো কম কথা নয়।

অঞ্জনা দু'দিন এসেছিল। একদিন একা, একদিন রঞ্জনাকে নিয়ে।

একদিন জিগ্যেস করেছিল, আমরা এইখানেই থাকব, না অন্য কোথাও উঠে যাবার কথা ভাবছি। বলেছিলাম, এখনও সেকথা কিছু ভাবিনি। তাতে তার ধারনা হয়েছিল আমাদের হাতে টাকা আছে।

জিগ্যেস করেছিল, বিয়ের কি হ'ল ?

—সেকথাও কিছু হয়নি।

—হওয়া কি উচিত ছিল না ?

—কি হবে ? তুই আমার কথা ভাবছিস। বিয়ে হলে আমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কিন্তু মা ? মা কোথায় যাবেন ?

—জামাই বাড়িতে শাশুড়ী কি থাকে না ?

—বিপদে পড়লে থাকে। কিন্তু বেয়াই বাড়িতে কে থাকতে পারে ?

—তা বটে। বেয়াই-বেয়ান আছেন।

বললাম, তাছাড়া বিয়ের কথা উনিও তোলেন নি কোনো দিন।

—আসেন ?

—প্রথম প্রথম রোজই আসতেন। এখন মাঝে মাঝে আসেন।

—কেটে পড়ার মতলব ?

—জানি না।

বললাম, চায়ের দোকানের সেই ভদ্রলোককে মনে আছে ?

—আছে।

—বাবার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমি কাকাবাবু বলি। তিনি যথেষ্ট করছেন। ভরসাও দেন।

অঞ্জনা হাসলে।

—হাসছিস্ ?

—কিছু মনে করিস না, কাকাবাবুদের ওপর আমার বড় ভয়। বিশেষ তাঁরা যখন যেচে উপকার করতে আসেন।

প্রতিবাদে আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, বাধা দিয়ে ও বললে, তা সে যাই হোক, ইনি হয়তো সত্যি ভালো লোক, এঁর বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু আমি কি বলি জানিস ?

—কি ?

—কাকাবাবু, মামাবাবু, দাদাবাবু নয়, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর।

—যেমন তোরা দাঁড়িয়েছিস ?

—হ্যাঁ।

—সেকথাও ভাবি।

—ভাব। মন স্থির করতে পারলে আমাকে বলিস্। মনে রাখিস্, পুরুষ মাত্রেই সন্দেহের পাত্র। তারা ঠকাবার আগেই

ওদের ঠকাতে হবে। প্রথম প্রথম আমিও ঠকেছি কম নয়। আর ঠকি না, এখন ঠকাই।

ওর চোখ জ্বলছে। ঘন ঘন সশব্দে নিশ্বাস পড়ছে। যেন কাল নাগিনী।

বেঁটে ছাতাটা হাতে নিয়ে অঞ্জনা উঠে দাঁড়াল। একবার হাসবার চেষ্টা করলে। সে আরও ভয়ংকর। তারপর দ্রুতবেগে চলে গেল কোথায় যেন সে কাজ করে সেইখানে।

বরুণ কি রকম হয়ে গেছে যেন। মনের রুক্ষতার ছাপ পড়েছে তার দেহেও। খিটখিটে চেহারা। কালিমারা কোটরের মধ্যে থেকে চোখ দুটো সব সময়ই জ্বলছে।

আসে, বসতে পারে না। যতক্ষণ থাকে হায়েনার মতো ছটফট করে। ওর সঙ্গে কথা বলতে ভয় হয়।

তবু একদিন বসালাম।

বললাম, একটা মাস শেষ হয়ে গেছে। আর দুটো মাস। তারপরে কি করব বল ?

—আমি কি বলব ? আমি নিজের বাপ-মাকেই দুবেলা দুটো খাওয়াতে পারছি না। অন্যের কথা ভাববার সময় কই ?

এরপরে আর বলবার কি থাকতে পারে ?

চুপ করে রইলাম।

জিগ্যেস করলে, কাকাবাবু কিছু ব্যবস্থা করতে পারলেন না ?

—হাসলাম। কই আর পারলেন। তাও বলি, তিনি আমাদের কে যে, কাজকর্ম ফেলে আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করতে যাবেন ? তিনি যেটুকু করেন, তাই যথেষ্ট।

বরুণ চুপ করে রইল।

জিগ্যেস করলাম, অঞ্জনাকে তোমার কেমন মনে হয় ?

—ভালো নয়।

—রঞ্জনাকে ?

—কাল গিয়েছিলাম হাসপাতালে। দেখলে চেনা যা[redacted] এত কষ্ট হল!

—কোন হাসপাতালে আছে?

—এখানে নয়। ওদের কলোনীর কাছে একটা হাসপাতাল আছে, সেইখানে। যেমন হাসপাতালের ছিরি! চিকিৎসা যা হচ্ছে সেও তেমনি!

বললাম, সেখানে আর কি করে যাই?

—না। তোর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

অঞ্জনা উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল।

তারপর বললে, এই পুরুষগুলো, নিষ্ঠুর হলে এরা না করতে পারে এমন কাজ নেই। তোকে আমি বলিনি, ওরা ঠকাবার আগে ওদের ঠকাতে হবে। বাসুকী সাপের ধৈর্যটাই আমরা পেয়েছি, তার বিষটা নয়।

ওর চোখে সাপের দ্যুতি। ঝিকমিক করছে। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছি।

অঞ্জনা বলে চলেছে: বিষে বিষে পৃথিবীকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিতে হবে। সেই ধোঁয়ায় ওদের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবে। ওরা হাঁপিয়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়বে। বিষকন্যার কথা শুনেছি। আমি যদি সেই বিষকন্যা হতাম।

অঞ্জনা কেমন ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ওর এক বেণীকরা মাথাটা মনে হচ্ছিল সাপের ফণা। ছোবল মারবার আগে যেমন দোলে তেমনি করছে।

আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

ও বললে, আমি কোথায় কাজ করি জানতে চেয়েছিলি না?

কথা বলবার শক্তি ছিল না। শুধু ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

—ম্যাসেজ ক্লিনিকে।